ভারতের প্রতিবেশী

নারায়ণচন্দ্র চন্দ

অশোক পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড্
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীঅশোক কুমার বারিক
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড্
কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ১৯৬০
মূল্য : চার টাকা মাত্র

মুদ্রক :
শ্রীপরমানন্দ সিংহরায়
কালী প্রেস
সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৯

লেখকের কয়েকখানি বই

॥ শিক্ষা-বিষয়ক ॥

মানুষের রহস্য
শিক্ষা প্রসঙ্গ
আধুনিক শিক্ষণ সহায়িকা
বুনিয়াদী শিক্ষা

●

॥ দেশ বিদেশ ॥

দেশ-দেশান্তর

●

॥ মহৎ জীবন ॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য
অজানার সন্ধানে কলম্বাস
অজানা দেশে মঙ্গোপার্ক
জোয়ান অব্ আর্ক
রাণা প্রতাপ সিংহ

●

॥ জীব জন্তু ॥

বনের বাসিন্দা

●

॥ ইতিহাস ॥

আমাদের দেশ
বিশ্ব-ইতিহাস

●

॥ গল্প ॥

গল্পবিজ্ঞান
বিদেশী গল্পের সঙ্কলন

উৎসর্গ

উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত জননায়ক শ্রদ্ধেয়
ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, এম-এস-সি, এম-এল-সি
করকমলেষু—

॥ আমাদের কথা ॥

নূতন জায়গায় বাড়ি করতে গিয়ে প্রথমেই গৃহকর্তা খোঁজখবর নেন, তার প্রতিবেশীরা কেমন লোক। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ শিখেছে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে হলে সৎ এবং সহানুভূতিশীল প্রতিবেশী চাই, কারণ শুধু নিজের পরিবার এবং নিজের কাজকর্ম নিয়েই গৃহস্থের সব সময় চলে না, অপরের সহযোগিতাও আবশ্যক। একজন গৃহীর পক্ষে এ কথা যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য একটি দেশের পক্ষে।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল থেকে মানবপ্রীতি ও শান্তির প্রতি অনুরাগ দেখিয়ে এসেছে। স্বাধীনতালাভের পর আমাদের সুরু হয়েছে নূতন ক'রে দেশ ও সমাজকে কালের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলার উদ্যম। একাজ যেমন বিরাট তেমনি শ্রম সময়সাপেক্ষ। শুধু তাই নয়, দেশে এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শান্তি বিরাজিত থাকাও একান্ত প্রয়োজন। তাই স্বাধীন ভারতের পক্ষে তার প্রতিবেশীদের পরিচয় জানার দরকার হয়ে পড়েছে। এ বইতে আমরা ভারতের সীমানা-সংলগ্ন দেশগুলির বিবরণ, তাদের অধিবাসীর জীবনযাত্রা, শিল্পবাণিজ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা—এক কথায় তাদের জীবন ও বর্তমান সমস্যার বিষয় আলোচনা করেছি; আমাদের সীমান্তের ওপারের দেশের লোকেরা কিরূপ পরিবেশে কি অবস্থায় বসবাস করছে এখানে তারই প্রতি কৌতূহলী আলোক নিক্ষেপের চেষ্টা হয়েছে। শিল্প-শিক্ষক শ্রীপরেশনাথ দাস ছবিগুলি এঁকে দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির বিবরণ বাংলা ভাষায় সংহতভাবে প্রকাশের প্রচেষ্টা এই বোধ হয় প্রথম। ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা কিছু পরিমাণে জাগাতে পারলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

এই বই-এর ছাপা সম্পূর্ণ হবার পর আমাদের উত্তর সীমান্তে চীনা আক্রমণ সুরু হয়। সর্বশেষে এই সম্বন্ধে শুধু সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

বারাসাত রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়

নারায়ণচন্দ্র চন্দ

সূচীপত্র

আমাদের দেশ

মানুষ সামাজিক জীব। দলবল ছেড়ে, অন্যের সহায়তা না নিয়ে সে একাকী সুখ ও আরামের জীবন যাপন করতে পারে না। কারণ, সভ্য জীবন যাপন করতে হ'লে তার যে-সব জিনিসের প্রয়োজন, তা সব একা সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। এজন্য দরকার অপরের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা। যে কাজ একা করা যায় না, দশজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে করলে তা সহজ হয়। নিজেদের ভালোর জন্যই তাই মানুষ সমাজ বেঁধে বাস করে। সমাজের ছোট ছোট অংশ হ'ল পরিবার। বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলেমেয়ে নিয়ে পরিবার গঠিত। এক-একটি পরিবার পৃথক পৃথক বাড়িঘরে বাস করলেও, তারা সমাজেরই অংশ। এমনিভাবে আমরা পরিবারগতভাবে পৃথক এবং সমাজগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাস করি।

আমাদের বাড়ির আশেপাশে যারা বাস করে, তারা আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর সঙ্গে যদি সদ্ভাব থাকে তবে শান্তিতে বাস করা যায়, নতুবা সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়াঝাটি ও মনোমালিন্য ঘটে। প্রতিবেশীর মধ্যে কলহ কেবল যে বিরক্তির কারণ হয় তাই নয়, সমবেতভাবে ভালো কাজ করার পথেও বাধা আনে। আমাদের নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থের জন্যই প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে তোলা উচিত।

আমরা ভারতবাসী। ভারত আমাদের দেশ, আমাদের বৃহৎ বাড়ি। খণ্ড খণ্ডভাবে পরিবারে বিভক্ত হয়ে আমরা যেখানে বাস করি, তাকে বলি বাড়ি; সমগ্র জাতি যেখানে বসবাস করে, তাকে বলি দেশ অর্থাৎ জাতির বাড়ি। ভারত প্রায় ৪৪ কোটি লোকের দেশ, আমাদের গর্বের এবং আদরের মাতৃভূমি। এশিয়া মহাদেশের মাঝামাঝি দক্ষিণে সাগরের

দিকে দেশটি এগিয়ে এসেছে। উত্তর সীমানা জুড়ে উচ্চ হিমালয় পর্বতমালা পূব থেকে পশ্চিমে শিবের জটাজালের মতো ছড়িয়ে আছে। পর্বতচূড়াগুলি তুষারের মুকুট প'রে সূর্যের কিরণে ঝলমল করে। দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। তার নীল জলের ঢেউ মাথায় সাদা ফেনা নিয়ে

উপকূলে এসে লুটিয়ে পড়ে, ভারতমাতার পদতলে যেন বিছিয়ে দেয় পুষ্পের অঞ্জলি। পূবদিকে ব্রহ্মদেশ। হিমালয় পর্বতের কয়েকটি শাখা দক্ষিণ দিকে নেমে এই দেশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। পশ্চিম দিকে

পশ্চিম পাকিস্তান। এক সময়ে এ অঞ্চল ভারতেরই অংশ ছিল, এখন পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের দক্ষিণে আরব সাগর। আরব সাগর ভারতের পশ্চিম উপকূল ধুইয়ে দেয়, আর গ্রীষ্মকালে রাশি রাশি মেঘ পাঠায় দেশের মধ্যে। ভারত মহাসাগর থেকেও এমনি জলভরা মেঘ দলে দলে আকাশ ছেয়ে আসে, বৃষ্টিধারায় মাঠ, নদী-নালা পূর্ণ ক'রে দেয়, অবশেষে গিয়ে ঠেকে হিমালয়ের উচ্চ পাষাণ দেওয়ালে। হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে অসংখ্য নদী দেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়ছে। যাবার পথে তারা জল দিয়ে ফসলের মাঠ সরস ক'রে দেয়, পলিমাটি বিছিয়ে দিয়ে ভূমির উর্বরতা বাড়িয়ে দেয়। নদীর তীরে তীরে গড়ে উঠেছে শহর বন্দর; নদীপথে চলে ব্যবসা-বাণিজ্য। ভারতের ভূমির গঠন, তার জলবায়ু পশুপক্ষী অরণ্য সম্পদ, তার বিভিন্ন অঞ্চলের মনোহর শোভা দেখে মনে হয় প্রকৃতি যেন তাঁর আদরের মেয়েকে পরম যত্নে সৌন্দর্যে ও বৈচিত্র্যে সাজিয়েছেন! রূপকথার দেশের মতো সুন্দর এই ভারত আমাদের জন্মভূমি। বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে উদ্দেশ ক'রে লিখেছিলেন—বন্দে মাতরম্... 'মাতাকে প্রণাম করি।' রবীন্দ্রনাথ দেশের বন্দনাগানে গেয়েছেন—

ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।

* * * *

ভারতের আশেপাশে যে সকল দেশ রয়েছে, সেগুলি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। প্রতিবেশীদের পরিচয় জানা থাকলে তাদের বুঝতে সুবিধা হয়। এই সব দেশ কেমন? কেমন তাদের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, কিভাবে তারা জীবনযাপন করে, কি তাদের সমস্যা, কিভাবে তার সমাধানের চেষ্টা করছে? এখানে সংক্ষেপে প্রতিবেশীদের পরিচয় লাভের কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা করা হবে।

সিংহল

ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে নীল সাগরের মধ্যে পদ্মের কুঁড়ির আকারে একটি দ্বীপ। এর নাম সিংহল। দ্বীপটি লম্বায় ২৭২ মাইল, সবচেয়ে চওড়া অংশে ১৪০ মাইল; মোট আয়তন ২৫ হাজার ৩৩২ মাইল। সিংহল আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে কিছু ছোট, এর লোকসংখ্যা প্রায় ৮১ লক্ষ। ভিন্ন ভিন্ন যুগে সিংহল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। ভারতের পুরাণ ও সাহিত্যে এই দ্বীপ লঙ্কা ও সিংহল দ্বীপ নামে উল্লেখিত হ'ত। গ্রীক ও রোমান বণিকগণ এর নাম দিয়েছিল তাপ্রোবানে অর্থাৎ তাম্রবর্ণ। মাটির লাল রঙ দেখে হয়ত বিদেশীরা এই নামকরণ করেছিল। এর পর আরব বণিক সিংহলের সঙ্গে অনেকদিন ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়েছে। সিংহল দ্বীপ তাদের ভাষায় 'সেলেন্ দিব' নামে পরিচিত হয়। আরবদের পরে আসে পোর্তুগীজরা। সিংহলকে তারা জিল্যান্ নামে উল্লেখ করে। এই জিল্যান্ কথাটি ইংরাজিতে হয়েছে সিলোন্ অর্থাৎ বর্তমান সিংহল।

দেশটি কেমন

চারিদিকে সমুদ্র-দিয়ে-ঘেরা দেশটির মধ্যভাগ কচ্ছপের পিঠের মতো উঁচু, উপকূল ক্রমে ঢালু হয়ে সাগরে এসে মিশেছে। এর উত্তর প্রান্ত থেকে ভারতের দক্ষিণ উপকূলের দূরত্ব মাত্র ৩০ মাইল। দুই দেশের মধ্যেকার অগভীর সমুদ্রে কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ পাথরের মালার মতো সাজানো। এর নাম রামেশ্বর সেতুবন্ধ। রামায়ণে বর্ণিত আছে, লঙ্কার রাজা রাবণ রামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে অপহরণ ক'রে নিয়ে গেলে রামচন্দ্র সমুদ্রের ভিতর দিয়ে সেতু নির্মাণ ক'রে লঙ্কায় উপনীত হন এবং রাবণকে বধ ক'রে সীতাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসেন। দুই

দেশের মধ্যে সেতুর আকারে যে দ্বীপগুলি রয়েছে, এগুলি নাকি রামচন্দ্রের সেই সেতুর অবশিষ্ট চিহ্ন।

সিংহলের মধ্যভাগে কতকগুলি পাহাড় আছে। এগুলি আমাদের দার্জিলিঙ পাহাড়ের মতো উঁচু হবে। এদের চূড়াগুলি পরস্পরের কাছাকাছিঃ পেড্রোতালাগালা সমুদ্র থেকে ৮,২৯২ ফুট উঁচু, কিরিগালা-পোত্তা ৭,৮৫৭ ফুট এবং আদমের শিখর ৭,৩৬০ ফুট উচ্চ।

আদমের শিখর সিংহলে একটি অতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। মোচাকৃতি পাহাড়ের চূড়ায় কিছুটা জায়গা সমতল; সেখানে পাঁচ ফুট লম্বা মানুষের পায়ের ছাপের মতো চিহ্ন আছে। এই পদচিহ্ন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ সকলের কাছেই পবিত্র ব'লে গণ্য হয়। মুসলমানদের বিশ্বাস, আদমকে যখন ইডেনের উদ্যান থেকে ফেলে দেওয়া হয় তখন তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এখানে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন; হিন্দুদের ধারণা, এ পদচিহ্ন শিবের; বৌদ্ধরা মনে করে, নির্বাণ লাভ করার জন্য বুদ্ধদেব এই পাহাড়ের মাথায় পায়ে ভর দিয়ে পৃথিবী ছেড়ে গিয়েছিলেন, তাই এই গভীর দাগ রয়ে গেছে! বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এখন এই তীর্থ-স্থানটির তদারক করে। প্রতি বৎসর বহু তীর্থযাত্রী পদচিহ্ন দর্শন করতে দুর্গম পাহাড়ের গা বেয়ে আদম পাহাড়ের শৃঙ্গে আরোহণ করে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য পাহাড়ের খাড়া জায়গায় শিকলের মই ঝোলানো আছে।

দুইটি বর্ষাকাল

সিংহল উষ্ণমণ্ডলে বিষুবরেখার কাছাকাছি অবস্থিত। কাজেই স্থানটি খুবই গরম হবার কথা কিন্তু সমুদ্র থেকে শীতল বাতাস এসে উপকূলের উত্তাপ অনেক কমিয়ে দেয়। দেশের ভিতরে পাহাড় অংশে উচ্চতার জন্য জলবায়ু স্নিগ্ধ ও আরামদায়ক। সিংহলের একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে বর্ষাকাল হয় দুইবার। জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন-কার্তিক

পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে যে বাতাস বয়, তাতে প্রচুর মেঘ আসে দেশের মধ্যে, বৃষ্টি হয় প্রচুর। আবার অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে আমাদের যখন শীতকাল, তখন উত্তর-পূব দিক থেকে বাতাস বইতে থাকে। সিংহলের চারিদিকেই সমুদ্র থাকায় সে-বাতাসও দেশের মধ্যে মেঘ বৃষ্টি নিয়ে আসে। তবে প্রথম বর্ষা হয় পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলে, আর দ্বিতীয় বর্ষা হয় উত্তর ও পূর্ব উপকূলে।

পাহাড় অঞ্চল থেকে অনেক নদী ও ঝরনা উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রে এসে পড়ে। এর মধ্যে মহাবেলি গঙ্গা সবচেয়ে বড়, দৈর্ঘ্যে ২০৬ মাইল। কিন্তু নদীগুলি ৫০।৬০ মাইল চওড়া উপকূল অংশ ছাড়া উঁচুনীচু পাহাড়ময় অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ব'লে নৌকা চলাচলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। যে-সব জায়গায় খাড়া পাহাড়ের গা থেকে নদী বেগে নীচে নেমে আসছে, তার অনেক জায়গায় জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করার আয়োজন চলেছে। সিংহলে অনেকগুলি হ্রদ আছে কিন্তু মজার কথা এই যে, এর অনেকগুলি বহুকাল আগে জমিতে জলসেচের জন্য কাটা হয়েছিল। বৃষ্টির জল ধ'রে রাখার এই দিঘিগুলি এত বড় যে, দেখে মানুষ অবাক হয়ে যায়। অনেকগুলি পনরশো বিঘারও বেশি জায়গা জুড়ে বিরাজিত। মধ্য-সিংহলে কলাবেবা দিঘিটি আয়তনে ৭ বর্গমাইল অর্থাৎ সাড়ে তিন মাইল লম্বা, ২ মাইল চওড়া। এর চারিদিকের বাঁধ ৫০ ফুট উঁচু, ২০ ফুট চওড়া এবং ৬ মাইল দীর্ঘ। এই জলাধারের একটি নালা থেকে ৫৪ মাইল দূরে অনুরাধাপুর শহরে জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে; পথে ১০০টিরও বেশি পুকুরে জল সরবরাহ করা হয় এই খাল থেকেই।

সবুজ স্বর্গ

নীল সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপটিকে দূর থেকে সবুজ স্বর্গের মতো সুন্দর দেখায়। সিংহলের মাটি উর্বর, বৃষ্টিপাতও প্রচুর, বিশেষ ক'রে পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে। তাই এই দুই উপকূলের সমভূমিতে এবং

পাহাড়ের গায়ে গাছপালা যেমন ঘন তেমনি সতেজ। সমতল ক্ষেত্রে হয় ধান, নারিকেল, সুপারি, রবার; পাহাড়ময় অংশে দারুচিনি, সাটিন, ইবনি প্রভৃতি মূল্যবান কাঠের নিবিড় অরণ্য। এছাড়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্বাভাবিক ফুল ও ফলের অভাব নাই।

সিংহলকে বলা যায় বনরাজ্য; কারণ দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ জুড়ে রয়েছে বনজঙ্গল। বনে আছে নানারকম বন্যজীব। যদিও আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে, তবু এখনও নিবিড় বনভূমিতে দলে দলে বুনোহাতি চরতে দেখা যায়; সিংহ ও রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নেই কিন্তু বুনোমোষ আছে, আর আছে চিতাবাঘ, ভালুক, কয়েক জাতের হরিণ, বানর প্রভৃতি জীব। সিংহলীরা হাতিকে এমন কাজে লাগায় যা অন্য কোন প্রাণী কিংবা যন্ত্র করতে পারে না। গভীর বনে যেখানে মোটর-গাড়ি বা ভারী যান নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়, সেখান থেকে মোটা মোটা কাঠ টেনে বের ক'রে নিয়ে আসতে হাতি ছাড়া আর কেউ পারবে না। বুনোহাতির দল থেকে বাচ্চা ও তরুণদের ধ'রে পোষ মানিয়ে নেওয়া হয়। সারাদিন খাটুনির পর এরা যখন অগভীর নদীতে গড়াগড়ি দিয়ে স্নান করে এবং শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে একে অন্যের গা পরিষ্কার ক'রে নেয়, তখন দেখতে খুব মজা লাগে।

অধিবাসী

সিংহলের অধিবাসীরা এখন সিংহলী নামে পরিচিত। কিন্তু এরা সবাই অন্য দেশ থেকে এখানে এসে বাসিন্দা হয়ে গেছে। সম্ভবত এখন যে আদিবাসীরা বেদ্দা নামে পরিচিত, তারাই ছিল সিংহলের আদিম অধিবাসী। এদের অল্প-কিছু সংখ্যক লোক এখনও পূর্ব অঞ্চলের গিরি-গুহায় কোনমতে বন্য জীবন যাপন করছে। উত্তর ভারতের এক রাজপুত্র আর্য রামচন্দ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে লঙ্কা জয় করেছিলেন, রামায়ণ মহাকাব্যে এ কাহিনী আছে। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস 'মহাবংশে'

উল্লেখ আছে, ৪৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিজয় নামে এক ভারতীয় রাজকুমার অল্প-কিছু সৈন্য নিয়ে সিংহল অধিকার করেছিলেন। খুব সম্ভব বিজয় সিংহ ছিলেন বাংলাদেশের কোন রাজপুত্র এবং বাংলার কোন বন্দর থেকেই তিনি যাত্রা করেছিলেন। সিংহলের এক রাজকন্যাকে—সম্ভবত বেদ্দাদের কোন কন্যাকে—বিবাহ ক'রে বিজয় সিংহ প্রথম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

সিংহলী রাজারা প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করেন। অনুরাধাপুরে ছিল তখনকার রাজধানী। কৃষি, শিল্প, মন্দির-নির্মাণ প্রভৃতি সকল দিকে রাজাদের উৎসাহ ছিল। সিংহলী রাজাদের আমলে জমিতে জলসেচ ও শহরে জলসরবরাহের জন্য বড় বড় দিঘি খনন করা হয়েছিল যা এখনো পর্যন্ত লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে।

এই রাজাদের সময়ের একটি প্রধান ঘটনা হ'ল বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার। খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৬ অব্দে ভারতের সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকদল সঙ্গে নিয়ে সিংহলে গমন করেন এবং সিংহলের রাজা ও তাঁর প্রজাবর্গকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দেন। যে বোধিবৃক্ষতলে গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, সেই পবিত্র বৃক্ষের একটি শাখা নিয়ে এই সময় রাজধানী অনুরাধাপুরে রোপণ করা হয়। দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন এই বৃক্ষটি এখনও জীবিত আছে। এইটিই পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম ঐতিহাসিক বৃক্ষ। সিংহলীরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ।

তামিল অভিযান

সিংহলীদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের তামিলদের প্রায় যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতো। পর পর অভিযান চালিয়ে তামিলরা সিংহলের কিছু অংশ অধিকার ক'রে নেয়। এইভাবে ভারতের আর্য ও দ্রাবিড় উভয় গোষ্ঠীর লোক সিংহলের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়—প্রথম দল আসে বিজয়ের অভিযান কালে, দ্বিতীয় দল আসে তামিলদের অভিযানের ভিতর দিয়ে।

প্রথম দল অর্থাৎ সিংহলীরা বৌদ্ধ, দ্বিতীয় দল অর্থাৎ তামিলরা হিন্দু। বর্তমান সিংহলের অধিবাসীরা যে কেবল আর্য ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক নিয়েই গঠিত তা নয়, এদেশে আরো নানা জাতির লোকের বসতি ঘটেছে। অষ্টম শতাব্দীতে আরবদেশীয় মুসলমান বণিকগণ বাণিজ্য করতে এসে সিংহলে কতক বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে কিছুসংখ্যক তামিলও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করার পর পোর্তুগীজগণ সিংহলে এসে উপনীত হয়। দেশের মধ্যে একতা ও শান্তি ছিল না। অধিবাসীদের কলহের সুযোগ নিয়ে পোর্তুগীজরা সিংহল দখল ক'রে নেয়। কিছুকাল পরে ওলন্দাজরা পোর্তুগীজদের বিতাড়িত ক'রে দেশ শাসন করতে থাকে। এরা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য মালয় থেকে মুসলমান সৈন্যবাহিনী এনেছিল। ওলন্দাজ শাসনের অবসান ঘটলেও সিংহলের বাসিন্দাদের মধ্যে রয়ে গেছে পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও মালয় মুসলমানদের বংশধরগণ ; এরা সকলেই এখন সিংহলের নাগরিক।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুসারে সিংহলের লোকসংখ্যা ৮০ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬৩৭। এর মধ্যে সিংহলী হ'ল ৫৬ লক্ষ ২১ হাজার ৩৩২ জন, সিংহলী তামিল ১৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩২ জন, অবশিষ্ট প্রায় ৬ লক্ষ হ'ল অন্যান্য ধর্ম ও জাতির লোক।

সুন্দর দেহ, সুন্দর মন

সিংহলীদের দেহের গড়ন সুন্দর ; ছিপছিপে, সুগঠিত। নাকমুখের অবয়ব প্রীতিকর, চুল মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ। সিংহলী মেয়েদের বড় বড় উজ্জ্বল চোখ, দেহভঙ্গি ঋজু ও সুশ্রী, চলাফেরায় আছে স্বাভাবিক সৌন্দর্য। সিংহলীরা যেমন বিনয়ী তেমনি অতিথিপরায়ণ। অতি অপরিচিত জনকেও তারা তাদের উৎসবের অনুষ্ঠানে আপনজনের মতো অভ্যর্থনা ক'রে আপ্যায়ন করে। সিংহলীদের বেশির ভাগ বাস করে

পশ্চিমের নীচু উপকূলে ও কাণ্ডি অঞ্চলে। তামিলদের বসতি উত্তর ও পূর্ব উপকূলের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে।

জীবিকা : কৃষি

ভারতের মতো সিংহলও কৃষিপ্রধান দেশ ; যুগ যুগ ধ'রে লোকেরা চাষ-আবাদ ক'রে জীবনযাত্রা নির্বাহ ক'রে আসছে। প্রধান ফসল ধান। ধানের ক্ষেতে জলসেচের জন্য সিংহলী রাজারা বড় বড় দিঘি খনন করেছিলেন। তার বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যদিও বৃটিশ যুগে কিছু কিছু সংস্কারও হয়েছিল। লোকসংখ্যা বেশি হওয়ায় জমির চাহিদা বেড়েছে, এই সব জলাধার আবার চালু ক'রে ধানের চাষ বাড়ানোর চেষ্টা চলেছে। সরকারী খামার এবং যৌথ খামার ছাড়া অন্যত্র প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। কাদাজমিতে মোষের কাঁধে লাঙল জুড়ে ধানের চারা লাগানোর ক্ষেত তৈরি করা হয়, আমাদের দেশে যেমন সিংহলেও তেমনি। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ক্ষেত ; সেখানে একটানা বড় খামার ক'রে কলের লাঙল দিয়ে আবাদ করার সুবিধা নেই। দেশে যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয় তাতে দেশের চাহিদা মেটে না, বিদেশ থেকে কিছু পরিমাণ আমদানি করতে হয়।

ধানের পরে প্রধান ফসল হ'ল নারিকেল। সিংহলীদের কাছে নারিকেলের চেয়ে প্রিয় গাছ আর নাই, যেমন সুন্দর তেমনি উপকারী। সারা দেশে ১০ লক্ষ একর জুড়ে নারিকেলের বাগান, বছরে ফলে প্রায় ১৮০ কোটি নারিকেল। একজন বিদেশী জীবনে প্রথম নারিকেল খেয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলেছিল—একটি ফলে দুইখানা মিষ্টি রুটি আর এক গেলাস সরবতের মতো মিষ্টি জল। সিংহলীদের এই রুটি আর সরবতের অভাব নাই। নারিকেল গাছ শুধু খাদ্য ও পানীয় দেয় না, আরো অনেক কাজে লাগে। নারিকেল থেকে প্রস্তুত হয় খাবার তেল ও জ্বালানি তেল, শাঁস শুকিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হয়, ছোবড়া থেকে

তৈরি হয় দড়ি মাতুর পাপোশ, তেল নিঙড়ে নেবার পর শাঁসের শুক্‌নো অংশ গরু-মোষের খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়, গাছ দিয়ে খুঁটি ও পাতা দিয়ে হয় ঘরের ছাউনি। ইদানীং নারিকেল-মালার কয়লা গ্যাস-মুখোস তৈরিতে লাগে ব'লে বিদেশে এরও চাহিদা হয়েছে। সিংহলীদের যারই সামান্য একটু জমি আছে, সে-ই নারিকেলের বাগান তৈরি করবে, বাড়িতে ঘরের আশেপাশেও দুই-চারিটি নারিকেলের গাছ রোপণ করবে।

চা সংগ্রহ

সিংহলে পূর্বে কফির চাষ হ'ত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর কয়েক বৎসরের মধ্যে এক রহস্যময় রোগে এই ফসল নষ্ট ক'রে ফেলে। এতে ইংরাজ কফি-চাষ কোম্পানি এর চাষ বন্ধ ক'রে দিয়ে চা আবাদ সুরু করে। এখন চা সিংহলের একটি লাভজনক ফসল। পাহাড়ের গায়ে ঢালু জমিতে সমান-ক'রে-ছাঁটা সতেজ চা-গাছগুলি সবুজ গালিচার মতো দেখায়। চা-বাগিচায় কাজ করার জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে বহু তামিল শ্রমিক সিংহলে গিয়েছিল। তারা এখন সিংহলের অধিবাসী। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রথম রবার-চারা এনে চাষ

সুরু করা হয়েছিল। পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলের বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে রবার-বাগান তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত চা-বাগান এবং শতকরা ৭৫ ভাগ রবার-বাগান ইংরাজ কোম্পানির হাতে। এ থেকে লাভ হয় প্রচুর। বছরে ৩০ কোটি পাউণ্ড চা এবং ২২ কোটি পাউণ্ড রবার বিদেশে রপ্তানি করা হয়। চা উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের পরই সিংহলের স্থান।

জেলেরা জাল শুকাচ্ছে—সিংহল

অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য হ'ল দারুচিনি, কোকো, তামাক, লঙ্কা, তাল, সুপারি ও তৈলবীজ। দারুচিনি হ'ল সুশ্রী লম্বা গাছের সুগন্ধি শুকনো ছাল। দীর্ঘ—এমন কি কয়েক গজ ক'রে লম্বা—আকারে মসলাটি কিনতে পাওয়া যায়।

মাছ ধরা

আমাদের দেশের জেলেরা নদী খাল বিল থেকে যেমন মাছ ধ'রে বাজারে বিক্রি করে এবং এই ব্যবসাই তাদের উপজীবিকা, সিংহলেও তেমন দেখতে পাই। সাগর-তীরের কতক লোক দীর্ঘ সুশ্রী নৌকা নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরে; মাছ নিয়ে উপকূলে এলে মেয়েরা তা ঝুড়িতে ক'রে বিক্রি করতে নিয়ে যায় হাটে বাজারে। জীবিকা অর্জনের ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পরিশ্রম করে।

এক সময়ে সিংহলের উপকূলে অগভীর সমুদ্র থেকে মুক্তা সংগ্রহ করা হ'ত। কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা চাষের প্রথা চালু হওয়ার পর সাগর থেকে হাঙ্গর ও অন্যান্য ভীষণ সামুদ্রিক জীবের মুখে জীবন বিপন্ন ক'রে সাগরে নামার রীতি লোপ পেয়ে গেছে।

শিল্প

সিংহল শিল্পের ক্ষেত্রে খুব উন্নত নয়। কৃষিকাজের দ্বারা লোকেরা যা উৎপন্ন করে, তাই অবলম্বন ক'রে কিছু কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে। ধান-ভানার কল, নারিকেল তেল তৈরির কল, নারিকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি তৈরির কারখানা প্রভৃতিতে কিছু লোক কাজ করে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সিংহল স্বাধীনতা লাভ করেছে। এর আগে ইংরাজদের শাসনকালে দেশে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা হয়নি। স্বাধীনতার পর সিংহল সরকার প্লাই উড (চেরা তক্তা), কাগজ, কাচ, চামড়ার দ্রব্য, সিমেণ্ট, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র ও ডি. ডি. টি. তৈরির কারখানা স্থাপন করেছে। সিংহলের খনিজ দ্রব্যের মধ্যে গ্রাফাইট বা নরম সীসা উৎকৃষ্ট। এ দিয়ে পেনসিলের শিস তৈরি হয়। এদেশের রঙিন চুনীপান্না পাথর যেমন সুন্দর তেমনি এর চাহিদা। দক্ষিণ সিংহলের রত্নপুর নামক শহরের চারিপাশে মাটি খুঁড়ে বিচিত্র রঙের মূল্যবান পাথর বের করা হয়। সিংহলের রত্নের ব্যবসা অনেক

শত বৎসর ধ'রে চলে আসছে। উত্তর সিংহলে ইল্‌মেনাইট এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ভালো লৌহ আকর আছে। নূতন যুগে যে শিল্পায়ণের কাজ সুরু হয়েছে তারই ওপর নির্ভর করছে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি। ভারতের মতো সিংহলে ষষ্ঠবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের ভিতর দিয়ে দেশের লোকেদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা চলেছে। নিজেদের দেশ এবং জীবন নূতন ক'রে গড়ে তোলার ব্যাপারে সিংহলীরা আমাদের সহযাত্রী; আমরা উভয়েই প্রায় একই সময়ে বৃটিশের শাসন থেকে মুক্তিলাভ করেছি, উভয়েরই সমস্যা প্রায় একরূপ।

ধর্ম ও উৎসব

সিংহলীরা প্রায় সকলেই ধর্ম-আচরণে ও সভ্যতায় বৌদ্ধ। তাদের দেশে যেমন আদি বোধিদ্রুমের শাখা এখনো পর্যন্ত সরস এবং সজীব রয়েছে, বুদ্ধের ধর্মমতকেও তেমনি তারা নিজেদের জীবনে ও সমাজে অনুসরণ ক'রে সজীব ক'রে রেখেছে। তামিলরা অধিকাংশই হিন্দু, তাদের সভ্যতাও ভারতীয় হিন্দুদের সমগোত্রীয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন ধর্মের লোকের হিসাব ছিল: বৌদ্ধ ৫১,১৭,১৪৩; হিন্দু ১৬,১৪,০০৪; খ্রীষ্টান ৭,১৪,৮৭৪; মুসলমান ৫,৪১,৮১২।

সিংহলের অধিবাসীদের জীবনে ধর্ম অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। পূজাপার্বণ এবং তীর্থযাত্রা উপলক্ষ ক'রেই তাদের আমোদ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বছরের মধ্যে যে ২২ দিন সাধারণ ছুটি, তার প্রতিটি কোন-না-কোন পর্ব উপলক্ষে। মার্চ-এপ্রিল মাসে আদমের শিখরে তীর্থযাত্রার ছুটি। সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকই এই তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে 'পদচিহ্ন' দর্শন করা অতি পবিত্র, পুণ্য কাজ ব'লে মনে করে। দার্জিলিঙের 'টাইগার হিল' থেকে সূর্যোদয় যেমন অপূর্ব রঙের খেলায় সুন্দর দেখায়, তেমনি আদম-শিখর থেকে সূর্যোদয়ের সময় এর ছায়াপাত একটি দর্শনীয় দৃশ্য। উপত্যকায় ভাসমান কুয়াসার ওপর দিয়ে

সমগ্র পাহাড়ের ছায়াটি পশ্চিম দিকে পড়ে, পাহাড়ের চূড়ার ছায়া পড়ে ৬০ মাইল দূরে পশ্চিম সমুদ্র-উপকূলে। দেখে মনে হয়, পাহাড়টি সেখান থেকেই সমগ্র দেহ ও মাথা হেলিয়ে দিয়ে পশ্চিম সমুদ্রকে স্পর্শ করেছে! এই বিরাট গম্ভীর রহস্যময় দৃশ্য দর্শককে অভিভূত করে।

কাণ্ডির দন্ত-মন্দির বৌদ্ধদের একটি তীর্থস্থান। এই মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের একটি পবিত্র দন্ত রক্ষিত আছে। বার্ষিক 'পেরাহেরা' অর্থাৎ মশাল শোভাযাত্রা সিংহলীদের নাচ-গান আনন্দ-উল্লাসের ব্যাপার। একশতটি হাতি রঙিন মূল্যবান পোষাকে সাজিয়ে মশাল নিয়ে রাজপথে ভক্তদের শোভাযাত্রা চলে, শত শত নর্তক-নর্তকী এতে যোগ দেয়; হাজার হাজার দর্শকের ভিড় জমে পথে পথে।

গভর্নমেণ্ট

গত পাঁচশো বছর ধ'রে সিংহলে ইউরোপীয় তিনটি রাষ্ট্র রাজ্য-শাসন করেছে—প্রথমে পোর্তুগীজ, তারপর ওলন্দাজ, সর্বশেষে ইংরাজ-গণ। ওলন্দাজদের কাছ থেকে ইংরাজরা সিংহল জয় ক'রে নেয় ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং ক্রাউন কলোনি বা রাজকীয় উপনিবেশ হিসাবে শাসন করতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সিংহলে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে; ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। ভারতের মতো সিংহল এখন বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের একটি সদস্য রাষ্ট্র।

প্রথমদিকে সিংহল গভর্নমেণ্ট ইংলণ্ড-আমেরিকার অনুকূলে কমিউনিস্ট-বিরোধী নীতি অনুসরণ করছিল। পরে এর বৈদেশিক নীতিতে কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ভারতের মতো কোন শক্তিগোষ্ঠীতে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ থাকার নীতি গ্রহণ করে; বৃটিশ কোম্পানির চা-বাগিচা ও রবার-

বাগিচাগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার ও দেশ থেকে বৃটিশ সামরিক ঘাঁটিগুলি তুলে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পশ্চিমের দেশগুলি যখন শিল্প-বিজ্ঞানে দ্রুত উন্নতির পথে চলেছিল, সিংহল তখন কৃষিপ্রধান দেশরূপেই রয়ে গিয়েছিল। শাসকরা এর পরিবর্তন ঘটিয়ে যন্ত্রশিল্পের উন্নতি কামনা করেনি; কারণ তাদের প্রয়োজন ছিল কৃষিজাত কাঁচামালের। সিংহল স্বাধীনতা লাভ করলো বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি; এর আড়াই-শো বছর আগে সুরু হয়েছে যন্ত্র-বিজ্ঞানের যুগ। কাজেই একটি উন্নত আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হ'তে হ'লে সিংহলকে অনেক সমস্যার সমাধান করতে হবে।

সংবিধান

সংবিধান অনুসারে সিংহলে দুইটি প্রতিনিধি-পরিষদ্ নিয়ে পার্লামেণ্ট গঠিত। প্রথম পরিষদে ১০১ জন সদস্য, এর মধ্যে ৯৫ জন জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত, বাকি ৬ জনকে গভর্নর-জেনারেল মনোনীত করেন। অন্য পরিষদ্ বা সেনেটের সদস্য ৩০ জন—এর ১৫ জন ভোটে নির্বাচিত, অপর ১৫ জন গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হন। কয়েকজন মন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী নিয়ে গঠিত হয় মন্ত্রি-পরিষদ্ বা ক্যাবিনেট। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রী পার্লামেণ্টের নেতা এবং গভর্নমেণ্টের পরিচালক।

শিক্ষা

শিক্ষার প্রসার ভিন্ন গণতন্ত্র সফল হ'তে পারে না; বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্যও নাগরিকদের শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কিণ্ডারগার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ইংরাজি শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি ক'রে শিক্ষা-কাঠামো রচিত হয়েছে। প্রাইমারী স্কুল, তারপর জুনিয়র ও সিনিয়র হাই স্কুল, তারপর

বিশ্ববিদ্যালয়। এখন প্রতি গ্রামে কিংবা গ্রাম থেকে দুই-এক মাইলের মধ্যেই প্রাইমারী স্কুল আছে। লোকেদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহও যথেষ্ট। শতকরা ৫৭·৮ জন সিংহলবাসী শিক্ষিত; এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় সিংহলের শিক্ষার হার বেশ ভালো বলতে হবে। দেশের প্রধান ভাষা হ'ল সিংহলী ও তামিল। তবু শতকরা ৬ জন লোক ইংরাজি পড়তে পারে এবং বলতে পারে আরো অনেক বেশী লোক।

এদেশে একটি মেডিক্যাল স্কুল, একটি আইন-শিক্ষার স্কুল, একটি সরকারী শিক্ষক ট্রেনিং কলেজ এবং বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটি টেকনিক্যাল কলেজ আছে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলোম্বো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কাণ্ডি শহর থেকে ৪ মাইল দূরে পেরাডেনিয়ার বিখ্যাত বোটানিক গার্ডেনের নিকট অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ধরনের অট্টালিকা-গৃহ সবুজ গাছপালা-দিয়ে-ঘেরা পরিবেশে অতি মনোরম দেখায়।

ভাষা-সমস্যা

ইংরাজ আমলে সিংহলে সরকারী ভাষা ছিল ইংরাজি। স্বাধীনতার পর কোন্ ভাষা সরকারী ভাষা হবে, তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সিংহলীরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি, তাই সিংহলী ভাষাকে একমাত্র সরকারী ভাষা গণ্য ক'রে আইন পাস করা হয়েছে; কিন্তু তামিলরা এ দাবি মেনে নিতে রাজী নয়। আশা করা যায়, দেশের ঐক্য রক্ষার জন্য এ সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হবে।

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়া শব্দটি ইণ্ডিয়ান্ এশিয়া এই কথাটির সংক্ষেপ অর্থাৎ ভারতীয় এশিয়া। ভারত মহাসাগরের উত্তরে এশিয়া ও দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে রয়েছে ছোট বড় মাঝারি অসংখ্য দ্বীপ। প্রাচীন কালে ভারতের নাবিক ও ব্যবসায়ী সাগর পাড়ি দিয়ে এ অঞ্চলে এসেছিল; ভারতের ধর্ম রীতিনীতি শিল্পকলা ভাষা সবই এসেছিল, গড়ে উঠেছিল উপনিবেশ, দ্বীপগুলি হয়েছিল বৃহত্তর ভারতের অংশ। পরবর্তী কালে এ অঞ্চলের মালিকের পরিবর্তন হয়েছে, ইউরোপের বণিকরা বাণিজ্য করতে এসে দেশ দখল ক'রে বসেছিল; লোকেদের জীবনযাত্রায়ও এসেছে অনেক পরিবর্তন। কালের চাকা ঘুরে গেছে, অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলার ভার নিজেরা গ্রহণ করেছে।

মালয় উপদ্বীপ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অবস্থিত ছোট-বড় দ্বীপগুলি আসলে সাগর-জল-থেকে-ওঠা আগ্নেয়গিরিয়া চূড়াদেশ। কোন এক সময়ে অগ্নি-গিরির উদ্গিরণের কালে আলোড়নের ফলে এগুলি সমুদ্রের তলদেশ থেকে জলের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। কালক্রমে এখানে গাছপালা ও জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটেছে। বড় দ্বীপগুলি হ'ল সুমাত্রা, জাভা ও মাদুরা, বোর্নিও, সেলিবিস এবং ছোট ছোট অসংখ্য দ্বীপ—যেমন বলি, লম্বক, রিট-লিঙ্গা, টিমোর দ্বীপমালা, বংকা ও বিলিটন প্রভৃতি। বোর্নিও ও টিমোরের কিছু অংশসহ অপর সব দ্বীপ নিয়ে বর্তমান ইন্দোনেশিয়া গঠিত। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের আয়তন ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার বর্গমাইল অর্থাৎ ভারতের অর্ধেকের কিছু বেশি, লোকসংখ্যা (১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে) ৮ কোটি ১৯ লক্ষ।

দেশটি কেমন

অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র গঠিত। এর আয়তন দেখে দেশের বিস্তার ঠিক করা যাবে না। একটানা স্থলভাগ হ'লে যতটুকু স্থান জুড়ে দেশের অবস্থান হ'ত, অনেকগুলি দ্বীপের সমষ্টি ব'লে জায়গা নিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। পূর্ব-পশ্চিমে দেশটির বিস্তার হবে প্রায় ৩ হাজার মাইল। দেশের ওপর দিয়ে এরোপ্লেনে ক'রে উড়ে যেতে চোখে পড়ে নীল সমুদ্রের মধ্যে অরণ্য-ঢাকা দ্বীপগুলি, যেন অসংখ্য সবুজ ঢেউ সাগরের বুকে স্থির হয়ে রয়েছে। এ অঞ্চলের সমুদ্র বেশি গভীর নয়। যদি কোন কারণে সাগরের তলা ১০০ ফ্যাদম্ উঁচু হয়ে উঠতো, তবে দেখা যেত দ্বীপগুলি পর পর গায়ে লেগে গেছে এবং উত্তরে এশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়া স্থলপথে যুক্ত হয়ে পড়েছে। যেখানে সাগর খুব বেশী গভীর, সেখানে অবশ্য কতকগুলি ছোট-বড় হ্রদের মতো জলাশয় থাকত।

জাভা

জাভা দ্বীপটি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপ-সমষ্টির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। এর অবস্থান উষ্ণমণ্ডলে, বিষুবরেখা গেছে এর কিছুটা উত্তর দিয়ে; বারো মাস ঝমঝম ক'রে বৃষ্টিপাত হয়, জলবায়ু সব সময়ে গরম ও স্যাঁৎসেঁতে, ভূমি অতিশয় উর্বর। তাই এখানে বিচিত্র রকমের গাছপালা ও পশুপাখির সমবেশ দেখা যায়। রঙ-বেরঙের অর্কিড আছে পাঁচশো প্রকারেরও বেশি। এর ফুলের সৌন্দর্য যেমন দর্শককে মুগ্ধ করে, তেমনি এর সৌরভে বাতাস হয় আমোদিত। অর্কিডের সুবাসে সুরভিত শিশির-বিন্দু যখন গাছ থেকে টুপ্ টুপ্ ক'রে ঝ'রে পড়ে, তখন সুগন্ধে স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সন্ধ্যায় নানা-জাতীয় পাখির কাকলি, আর তার সঙ্গে ঝিল্লিরব যেন ঐক্যতান

তোলে। বনে গাছপালা এত ঘন যে, তার মধ্যে সূর্যকিরণ প্রবেশ করতে পারে না ; বনে বাঘ, গণ্ডার, বড় বড় সাপ প্রভৃতি বন্যজীবের বাস। সমগ্র জাভায় ঝোপ-জঙ্গলের বৃদ্ধি খুব বেশি এবং ফুল হয় বিচিত্র ও উজ্জ্বল রঙের ; পাখির পালকের রঙও নয়নসুখকর। এ দ্বীপে ময়ূরসমেত সুন্দর পালকযুক্ত পাখির সংখ্যা হবে চারশো প্রকারেরও বেশি। এমন অনেক অদ্ভুতধরনের কীট-পতঙ্গ, পাখি ও ফুল আছে এখনও যার নামকরণ হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের জন্য জাভার চিবোডাস নামক স্থানে এসে থাকেন।

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপসমূহ আগ্নেয়গিরির অংশ। অতীতে অগ্নি-গিরির ভিতর থেকে গলিত লাভা ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ যা বের হয়েছিল তা কালক্রমে পচে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে ভূমিকে করেছে অতিশয় উর্বর, উদ্ভিদ ও নানা ফসলের পক্ষে একান্ত উপযোগী। এ-সব দেশে গাছপালা যেমন প্রচুর, নানা ফলও তেমনি ফলে প্রচুর পরিমাণে। গরমের দেশ ; কাজেই কলা, আনারস, আম, জাম প্রধান ফল। কলা দেখতে পাওয়া যায় ৭০০ প্রকারেরও বেশি ; কতক আঙুলের মতো সরু ও ছোট, কতক আবার মানুষের বাহুর মতো লম্বা ও মোটা।

জাভার বাসিন্দা

জাভার অধিবাসীরা আকারে খাটো কিন্তু সুশ্রী ও সুগঠিত তাদের দেহ। তারা মালয়-জাতির একটি শাখার লোক। এরা বেশ বুদ্ধিমান ও বিনয়ী। প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে বাসিন্দারা শান্তিপূর্ণ সচ্ছল জীবন যাপন করে। প্রকৃতির দানে এদের বাসগৃহ তৈরি করার ও খাওয়া-পরার উপকরণের অভাব নাই। ভূমি উর্বর, প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে শস্য উৎপাদন সহজসাধ্য। অধিবাসীরা প্রধানত চাষ-আবাদ ক'রেই জীবিকা নির্বাহ করে। ধান, কফি, আখ, মিষ্টি আলু, বাদাম,

তামাক, সয়াবিন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা হয়। লোকেদের প্রধান খাদ্য হ'ল ভাত মাছ। দেশে নারিকেল গাছ প্রচুর। নারিকেল-শাঁস থেকে তেল তৈরি হয়; তা মাথায় মাখে, রান্নাতেও ব্যবহার করে। নারিকেলের ছোব্ড়া থেকে তৈরি হয় দড়ি, মাদুর, পাপোশ প্রভৃতি। নারিকেলের শুক্‌নো পাতা দিয়ে ঘরের ছাউনি দেওয়া চলে। কচি পাতা তরকারি হিসাবে এদের কাছে উপাদেয়। নারিকেলের শাঁস থেকে এক প্রকার সুরাজাতীয় পানীয় এবং চিনির মতো সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

জাভানিজরা প্রকৃতির স্নেহ পেয়েছে অজস্র, নিজেদের পরিবার-পরিজনের প্রতিও তারা স্নেহ বর্ষণ করে অজস্রভাবে। বাপ-মা ছেলেমেয়েকে খুব ভালবাসে; কখনও তাদের শাস্তি দেয় না। বাসিন্দারা অল্প বয়সে বিয়ে করে; বিয়ের সময় খুব ভোজন-উৎসব ও নাচগানের ধুম-ধাম পড়ে যায়।

জাভার মেয়ে—পরণে বাটিক ছাপ-দেওয়া সরোঙ্গ

জাভার স্ত্রী-পুরুষের পোষাকে বিশেষ পার্থক্য নাই। শহরে মেয়েরা এবং কতক পুরুষ যদিও ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করে, গ্রাম অঞ্চলে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ হ'ল সারোঙ্গ—একখণ্ড কাপড় বগলের নীচে দিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধা, পা পর্যন্ত ঝুল। মেয়েরা কখন কখনও সারোঙ্গের

ওপর ছোট কোট পরে কিংবা উত্তরীয়ের মতো কাপড় কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে পরে, অথবা আঁচল কোমরে জড়িয়ে রাখে। মেয়েরা শক্ত খোঁপা ক'রে চুল বাঁধে, পুরুষ পরে ছোট পাগড়ি। আংটি ও বালা মেয়ে-পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করে। ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক সময় পায়ে মল পরে।

জাভায় স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই রঙচঙের কাপড়-চোপড় খুব পছন্দ। মেয়েরা নিজের হাতে কাপড় বোনে এবং নানা নক্সায় ও রঙে সাজিয়ে নেয়। এখানকার বাটিকের কাজ বিখ্যাত। কাপড় বোনার পর তাতে নানারকম নক্সা এঁকে তা মোম দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়; তারপর রঙের মধ্যে ডুবিয়ে নিলে মোমে-ঢাকা অংশ ছাড়া অন্য অংশ রঞ্জিত হয়ে যায়। পরে গরম জলে ভিজিয়ে মোম তুলে ফেললে বাটিকের কাজ সম্পূর্ণ হ'ল। মেয়েরা বাটিকের কাজে কৌশল ও সৌন্দর্য-বোধের পরিচয় দিয়ে থাকে।

জাভানিজদের প্রধান খাদ্য ভাত। ধান উৎপাদনের অনুকূল জল বায়ু ও ভূমি এখানে রয়েছে, কিন্তু এর জন্য চাষীকে রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়। বৃষ্টির জলে মাঠ কাদা-পূর্ণ, তারই মধ্যে এক-হাঁটু কাদায় দাঁড়িয়ে ধানের চারাগাছ রোপণ করতে হয়; ধান কাটার সময় ধানের শিষ একটি একটি ক'রে হাত দিয়ে ধ'রে কেটে নেওয়া হয়; আমাদের দেশের মতো কাস্তে দিয়ে তাড়াতাড়ি আঁটি আঁটি ধান কাটার রেওয়াজ এদেশে নাই।

ইন্দোনেশিয়ার চাষী

জাভার লোকেরা ভারতীয়দের কাছ থেকে হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং এক হাজার বছরেরও বেশি ভারতীয়দের প্রভাবে এদের জীবন ছিল ভরপুর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরব মুসলমানদের অভিযানের ফলে এদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ঘটে। এখন বাসিন্দা-দের অধিকাংশই মুসলমান।

বাড়িঘর

অধিবাসীরা বেশির ভাগ গ্রামে বাস করে। গ্রামকে বলা হয় ক্যাপমঙ। ছোট ছোট গ্রাম, লোকসংখ্যা বেশি নয়, ৩০ থেকে পাঁচশো। এরা জমিতে চাষ-আবাদ ক'রে শান্ত নিরিবিলি জীবন যাপন করে। গ্রামগুলি নারিকেল-কুঞ্জ দিয়ে ঘেরা। ছোট ছোট ঘর গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়ে। বাঁশ জন্মে প্রচুর। বাঁশ কিংবা কাঠের খুঁটির ওপর খড় বা নারিকেল পাতার ছাউনি; বাঁশেব চটা-দিয়ে-বোনা বেড়া মাটি দিয়ে লেপে রঙ ক'রে সুন্দর দেওয়াল তৈরি করা হয়। এ-সব অঞ্চলে ভূমিকম্প হয় ঘন ঘন; ঘর-দরজা হাল্‌কা ধরনের হওয়ায় কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। ঘর পড়ে গেলেও অল্প সময়ের মধ্যেই আবার তৈরি ক'রে নেওয়া যায়। প্রতি বাড়ির সামনে একটি ক'রে ফুলের বাগান আছে। এ থেকে অধিবাসীদের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়িতে তিনটি পৃথক ঘর থাকে; এগুলি একটানা বারান্দা দিয়ে পর-পর সংযুক্ত। একখানি ঘরকে বলা হয় 'ওমান'—এখানে পরিবারের লোকজন বাস করে; একটির নাম 'প্যান্‌ডোপা'—এটি একটি বৈঠকখানার মতো, এখানে অতিথিকে অভ্যর্থনা করা হয়; অন্যটি 'প্রিংগিটান'—অতিথি-অভ্যাগতদের নিদ্রার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ঘরগুলির কোনটিতেই জানালা নাই। এর জন্য বিশেষ কোন অসুবিধাও হয় না, কারণ জাভার অধিবাসীরা বেশির ভাগ সময় ঘরের বাইরেই কাটায়।

গরীব লোকেদের ঘরদোর সাধারণ রকমের। বাঁশ-কাঠের খুঁটি, পাতার ছাউনি, এক রকম বেতের মতো শক্ত লতা দিয়ে বাঁধা। পশ্চিম জাভায় ঘরগুলির মেঝে কিছুটা উঁচু, কাঠের তক্তা বিছিয়ে তৈরি-করা; ঘরের নীচে গরু-ছাগল রাখার জায়গা।

বরবুদুর

বরবুদুর জাভা দ্বীপের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। নবম শতাব্দীতে এখানে হিন্দু-বৌদ্ধ সভ্যতার বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল এবং পঞ্চদশ শতাব্দী অবধি এর গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। বরবুদুরের মন্দির প্রাচীন শিল্প ও সভ্যতার চিহ্ন বহন করছে। পিরামিডের আকারে এই মন্দিরটি পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে উঠেছে। মন্দিরের পাঁচটি ধাপ, এগুলি বিচিত্র ধরনের খোদাই ও কারুকার্যে সুশোভিত। মাপ নিয়ে হিসাব ক'রে দেখা গেছে, খোদাই অংশগুলি পর পর সাজালে তার দৈর্ঘ্য হবে তিন মাইল। মিশরের প্রধান পিরামিড তৈরি করতে যেরূপ পরিকল্পনা ও পরিশ্রম খাটানো হয়েছিল, বরবুদুরের মন্দির নির্মাণ করতে তার চেয়েও বৃহত্তর কাজ, নিপুণতর শিল্পকলার প্রয়োগ করতে হয়েছিল। বরবুদুর এখনও মানুষের বিস্ময় জাগায়।

বলি

জাভার পূর্বদিকে এক সারিতে কতকগুলি দ্বীপ রয়েছে—তার মধ্যে বলিদ্বীপ প্রধান। বলিদ্বীপের অধিবাসী জাভার মতোই, তবে এদের দেহের গড়ন কিছুটা বেশি শক্তিশালী। বাসিন্দারা হিন্দু, জাভার অধিবাসীর মতো মুসলমান নয়। সারা দ্বীপে বহু মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা প্রতিদিন ধূপধূনা, ফুল-নৈবেদ্য দিয়ে মন্দিরে উপাসনা ক'রে থাকে। মেয়েরা মাথায় ফুলের ঝুড়ি নিয়ে দলে দলে চলে মন্দিরের পথে; সুসজ্জিত বেশ, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ।

কিশোরী মেয়েরা দেবীর মতো সাজসজ্জা ক'রে নৃত্যের ভিতর দিয়ে দেব-দেবতার কাহিনী ফুটিয়ে তোলে। বলির দেবীনৃত্য বিশেষ উপভোগ্য।

মোরগ-লড়াই

বলির লোকেদের কাছে মোরগ-লড়াই একটি বিশেষ আমোদজনক খেলা। পুরুষেরা সুন্দর সাজগোজ ক'রে, মাথায় ফুলের মালা বেঁধে তাদের পোষা মোরগ নিয়ে নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রে' হাজির হয়; কেউ মোরগ নিয়ে আসে সযত্নে বুকে ক'রে, কেউ বা আনে কারুকার্য-করা সোনার খাঁচায় ক'রে। তালে তালে ঢোল-মাদল বাজে, সুরু হয় মোরগের লড়াই। কৌতূহলী জনতা ভিড় ক'রে দাঁড়ায়, আনন্দে তাদের চোখ জ্বলজ্বল করে।

বলিদ্বীপের নৃত্য--পরণে সারাঙ্গ

সুমাত্রা

জাভার উত্তর-পশ্চিমে সুমাত্রা দ্বীপ জাভার প্রায় তিনগুণ বড় কিন্তু এখানে লোকসংখ্যা জাভার চেয়েও কম। এখানকার বিরাট বন অঞ্চল এখনও মানুষের অধিকার ও ব্যবহারের আওতায় আসেনি। এককালে সুমাত্রা দ্বীপে হিন্দু সভ্যতার বিস্তার হয়েছিল, এখনও তার জের চলেছে। বাসিন্দাদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত রয়েছে, দেবদেবীও ভারতীয়। অধিবাসীদের মধ্যে মালয়, হিন্দু, আরব এবং চীনাদের মিশ্রণ ঘটেছে; এ ছাড়া দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা আছে কিছু

সংখ্যায়। এদের মধ্যে বাটকরা খ্রীষ্টান ধর্ম পালন করে; বেশির ভাগ অধিবাসী বর্তমানে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত।

সুমাত্রা দ্বীপের মাঝখান দিয়ে বরিশান নামে দীর্ঘ পর্বতমালা মেরুদণ্ডের মতো বিস্তৃত। অনেক নদী পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে; এদের দৈর্ঘ্য কম, নৌ-চলাচলের উপযোগী নয়; পাহাড়ময় অংশ থেকে সোজা সাগরে গিয়ে পড়ে। অনেক বড় বড় হ্রদ ও জলাভূমি আছে, সেখানে আছে কুমীর আর বড় বড় কাঁকড়ার ঝাঁক। জঙ্গলে আছে বাঘ, অজগর সাপ আর হিংস্র আদিবাসী। এ-সব মিলে সুমাত্রা মানুষের কাছে দুর্গম রহস্যময় দ্বীপ।

বোর্নিও

বোর্নিও চীন-সাগরে জাভার উত্তরে অবস্থিত একটি বিশাল দ্বীপ। কচ্ছপের পিঠের মতো দেশের মধ্যভাগ উঁচু; সারা দেশটিই পাহাড়ময় এবং নিবিড় বনে ঢাকা। বিষুবরেখা দেশের প্রায় মাঝখান দিয়ে গেছে। সারা বছরেই গরম আর প্রচুর বৃষ্টিপাত। ঝোপজঙ্গলে গাছ-পালার বৃদ্ধি এত বেশি যে, ঘন বনের ভিতর প্রবেশ করা অসাধ্য। সূর্যের তেজ প্রচণ্ড, যেন আকাশ থেকে আগুন ঝ'রে পড়ে; মেঘের গর্জন আর ঝমঝম বৃষ্টি। নদীগুলি পাহাড়ের গা বেয়ে গর্জন করতে করতে নেমে আসে।

বোর্নিও রহস্যময় দেশ। মেরুদেশ, কঙ্গো ও আমাজনের নিবিড় বনভূমি দুর্গম মরুভূমি—সব জায়গাতেই মানুষ অভিযান ক'রে সে-সব স্থানের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে কিন্তু বোর্নিও-র অনেক অঞ্চলে এ পর্যন্ত কেউ যেতেই পারেনি। দেশের উত্তর উপকূলে সারাওয়াক্ বৃটেনের অধীন, উপকূলের বাকি অংশে মালয়বাসীদের উপনিবেশ। দেশের ভিতরে বাস করে বোর্নিও-র আদিবাসীরা; তারা অসভ্য ও

বন্যপশুর মতোই ভয়ংকর, অনেকেই মানুষ-খেকো। এমন দুর্গম বন-জঙ্গলে এরা বাস করে যে, এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বোর্নিও-র বন থেকে পাওয়া যায় গাটাপার্চা, রবার, নারিকেল, সাগুগাছ, বেত ও লোহাকাঠ। এখানে নানাজাতের অর্কিড ও বিচিত্র রকমের ফুল-ফল দেখা যায়; খনিজ দ্রব্যের মধ্যে প্রধান হ'ল কয়লা, তেল, হীরা ও সোনা।

বাসিন্দা

বোর্নিও-র আদিম বাসিন্দারা দেশের উপকূলভাগেই বাস করতো। প্রায় একশো বছর আগে মালয়বাসীরা অভিযান ক'রে উপকূল অংশ অধিকার ক'রে নেয়, আদি বাসিন্দারা চলে যায় দেশের ভিতরকার পাহাড় ও বনময় অংশে। ক্লেমানটান্, মুরুট, কায়ান, কেনিয়া এবং পুনান উপজাতির লোকেরা এখনও বন্য ও বর্বর জীবন যাপন করে। এদের নিজেদের মধ্যে প্রায় লড়াই লেগেই থাকে। বর্শা, তরবারি, তীর-ধনুক প্রভৃতি হ'ল এদের অস্ত্র। সকলেই নানা আকারের ঢাল ব্যবহার করে—কাঠ দিয়ে তৈরি ক'রে নানা রঙ দিয়ে তা সাজিয়ে নেয়। কেনিয়া উপজাতির যোদ্ধারা তাদের ঢালে মানুষের মাথা এঁকে দেয় এবং তার ওপর তাদের হত্যা-করা শত্রুদের চুল ধরে ধরে গোছা ক'রে বেঁধে রাখে। ডায়াক নামক উপজাতির লোকেরা নদীর তীরে, কতক বা সমুদ্রের উপকূলে বাস করে। ডায়াকদের দেহ সুগঠিত। মেয়ে-পুরুষ উভয়েই গহনা পরে। হাতির দাঁতের নক্সা-করা অলংকার, ঝিনুক ও শঙ্খ, রূপার বালা, আংটি, মাকড়ি, কোমরপেটি প্রভৃতি গহনা মেয়েদের সাজসজ্জার উপকরণ। উৎসবের পোষাক হ'ল রঙিন, সোনার সুতায় কারুকার্য-করা কাপড়; পুরুষেরা পরে পাগড়ি, তাতে পাখির রঙিন পালক গুঁজে দেয়। পুরুষেরা এই কাপড় কোমরে জড়িয়ে একটি প্রান্ত সামনের দিকে ঝুলিয়ে দেয়; মেয়েরা কাপড় কোমর থেকে হাঁটু

পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে, তার ওপর পরে বেত-দিয়ে-বোনা একটি ঘেরাটোপ; দেখতে কতকটা ডমরুর মতো—মাঝখানে সরু, দুই প্রান্ত কিছুটা চওড়া। সরু অংশটা থাকে কোমরের ওপর।

বাসিন্দাদের বাড়িঘর

বোর্নিও-র উপজাতি বাসিন্দারা নিজ নিজ দলের লোকসহ একত্র বাস করে। এদের গ্রাম বা পৃথক বাড়িঘর নাই। এক-একটি লম্বা কাঠের ঘরে ৫০ থেকে ৫০০ লোক বাস করে। একখানি ঘর ২৫ ফুট চওড়া, ৪০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা; সামনে দিয়ে একটানা বারান্দা। পৃথক পৃথক কুঠুরিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার থাকে। দলপতির ঘরের সামনে মাটির পাত্রে সব সময় আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। শত্রুর মাথার খুলি, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও শত্রুর কাছ থেকে লুঠ-ক'রে-নেওয়া সামগ্রী জাঁকজমক ক'রে সাজিয়ে রেখে এরা নিজেদের বীরত্বের পরিচয় ঘোষণা করে।

লম্বা বাড়িগুলি প্রায়ই জলাশয়ের ধারে তৈরি করা হয়। উঁচু খুঁটির ওপর এমনভাবে এগুলি নির্মিত, যাতে শত্রুপক্ষের লোকেরা সহসা আক্রমণ করতে না পারে কিংবা নীচে থেকে বর্শা দিয়ে ঘুমন্ত লোককে বিঁধে মেরে ফেলতে না পারে। ঘরের কাছেই থাকে নৌকা, আর ঘরের নীচেই রাখা হয় কুকুর, ছাগল, শুয়োর, মুরগী প্রভৃতি পোষা পশুপাখি। জলপথে চলাফেরা করতে হয়; নৌকা তৈরি করতে এবং নৌকা চালাতে এরা খুব পটু। উপজাতির লোকেদের মধ্যে কেবল পুনানরা গভীর জঙ্গলময় অঞ্চলে বাস করে; অন্য কোন দলের সঙ্গে তারা মেলামেশা করে না।

বিচিত্র জীবজন্তু

বোর্নিও-তে কতকগুলি অদ্ভুত রকমের জীবজন্তু আছে। সন্ধ্যাকালে গাছ থেকে ঝুপ ক'রে প্যারাসুট দিয়ে নামার মতো নামে উড়ন্ত

খেঁকশিয়াল। গাছে গাছে উড়ে বেড়ায়, দরকার হ'লে মাটিতে ছুটে চলে। এমনি আছে উড়ন্ত ব্যাঙ, বাদুড়ের মতো তার পাখা। জঙ্গলে বড় বড় ভীষণ আকারের জোঁক, রক্তের গন্ধ পেয়ে ছুটে আসে কিংবা গাছের পাতা থেকে টুপ্ ক'রে পড়ে শিকারের ওপর। আগুনে পিঁপড়ের কামড়ে আগুনে-পোড়ার মতো ফোস্কা পড়ে, আর লঙ্কা পিঁপড়ে কামড়ালে মনে হয় গায়ে লঙ্কা ঘষে দেওয়া হয়েছে।

দেশের শাসন-ব্যবস্থা

প্রাচীন কালে জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল এবং চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এ প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এ দ্বীপগুলি ছিল বৃহত্তর ভারতের অংশ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপ থেকে মুসলমান অভিযানের ফলে এ অঞ্চলের সভ্যতা ও শাসন-ব্যবস্থা পাল্‌টে গেল। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ মসলা উৎপাদনের জন্য পৃথিবীতে পরিচিত হয়েছিল। ইউরোপের বণিকরা বাণিজ্য করতে এসে এদেশে ঘাঁটি স্থাপন করতে থাকে। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে আসে পোর্তুগীজগণ এবং এই শতাব্দীর শেষদিকে আসে ওলন্দাজরা। ওলন্দাজ বণিকগণ দেশ দখল ক'রে নিয়ে প্রায় দুইশো বছর বাসিন্দাদের ওপর শাসন ও শোষণ চালায়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ সরকার বণিকদের হাত থেকে দেশের শাসনভার নিজ হাতে নেয়। জাভার অধিবাসীরা বিনা প্রতিবাদে ওলন্দাজ শাসন মেনে নেয়নি। কিন্তু কালক্রমে সরকারের প্রতিপত্তি বাড়ে, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় এবং যদিও এর লাভের মোটা অংশ চলে যেত বিদেশী সরকারের দেশে, তবু বহু দেশীয় অধিবাসী এ-সব প্রতিষ্ঠানে ও কৃষিক্ষেত্রে কাজ ক'রে জীবিকা অর্জন করার সুযোগ পায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা দ্বীপগুলি অধিকার ক'রে ওলন্দাজদের হটিয়ে দেয়; বাসিন্দাদের মনে স্বাধীন হওয়ার কামনা

প্রবল হয়ে ওঠে ; তারা দেখল, যে-বিদেশী সরকার তাদের দেশ শাসন করছিল ঝড়ের মুখে গাছের শুক্‌নো পাতার মতো তারা ঝ'রে পড়লো। নিজেদের দেশের শাসনভার তারা নিজেরা নিতে তৈরি হ'তে লাগল। জাপানীরা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেল; জাভা, সুমাত্রা ও মাদুরা মিলে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে। যুদ্ধের শেষে ওলন্দাজগণ আবার ফিরে এসে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে,
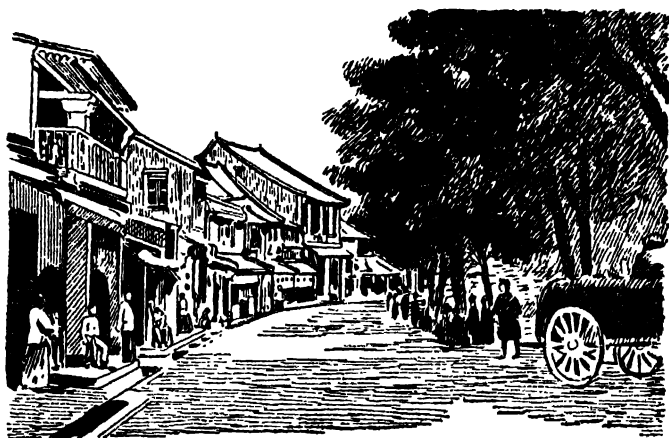
জা-কার্তা

কিন্তু একবার যারা পালিয়ে গেছে তাদের আর নূতন ক'রে কায়েম হয়ে বসতে দিতে কেউ রাজী ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, ওলন্দাজদের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ানদের যুদ্ধ চলে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইন্দোনেশিয়ানদের স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারতের পূরা সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। ওলন্দাজ সরকার অবশেষে বুঝতে পারে যে, ইন্দো-নেশিয়া দখল ক'রে সেখানে শাসন চালু করা সম্ভবপর নয়; ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। জা-কার্তা ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী।

ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। একে সমুদ্রের মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া বহু দ্বীপের ওপর শাসনকার্য চালু রাখতে হয়। টুকরা অংশগুলির মধ্যে সংযোগ রাখা রাষ্ট্রের কাছে এক বড় সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল অধিবাসীদের ভাষা। ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ২৫টি প্রধান ভাষা এবং ২৫০টি আঞ্চলিক ভাষা চালু আছে। সমগ্র রাষ্ট্রের ভাষা হ'ল 'বাহাসা ইন্দোনেশিয়া'—এটি মালয় ভাষার একটি রূপান্তর। সরকারী কাজকর্মে এবং প্রাথমিক বিত্যালয়ে শিক্ষাদানে এই ভাষা ব্যবহার করা হয়।

ইন্দোনেশিয়া ভারতের সাগর-পারের প্রতিবেশী; এর সঙ্গে আমাদের বন্ধুর মতো সম্পর্ক।

ব্রহ্মদেশ

ব্রহ্মদেশ ভারতের পূর্ব সীমান্তের প্রতিবেশী। হিমালয় পর্বত ভারতের উত্তর সীমানা জুড়ে পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত। এর ছোট-বড় চূড়া—ছোটগুলি দেখায় নীল, আর উঁচুগুলি সাদা বরফে ঝকমক করে—মনে হয় যেন নীল আকাশের নীচে সমুদ্রের নিথর ঢেউ। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত থেকে কতকগুলি শাখা-পর্বত বটের ডাল-থেকে-নামা ঝুরির মতো দক্ষিণ দিকে এগিয়ে এসে ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়ে চলে গেছে আরো দক্ষিণে। এগুলি হিমালয়ের মতো উচ্চ নয়। আমরা যদি স্থলপথে সীমান্ত পার হয়ে ব্রহ্মদেশে যাই, তবে একবার ক'রে গভীর উপত্যকায় নামতে হবে, আবার তিন-চার হাজার ফুট উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হবে ওপারের উপত্যকায়। ভারতের পাহাড়গুলি বেশির ভাগই দেশের মধ্যে আড়াআড়িভাবে পূর্ব-পশ্চিমে বিরাজিত, এদেশে উত্তর-দক্ষিণে। তাই ব্রহ্মদেশ সমভূমির দেশ নয়, সবুজ বনজঙ্গল ও অরণ্য-দিয়ে-ছাওয়া পাহাড়ময় রাজ্য। এর পশ্চিমে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তান, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে থাইল্যাণ্ড ও চীন, উত্তরেও চীনের অঞ্চল দিয়ে-ঘেরা।

দেশটি কেমন

কোন দেশ কেমন, তা বুঝতে জানা দরকার সে-দেশের ভূমি এবং জলবায়ু কেমন; তা থেকে বোঝা যাবে, কেমন ধরনের ফসল সে-দেশে হবে। ফসলের ওপরই নির্ভর করে মানুষের জীবিকা, বাড়িঘর, পোষাক-পরিচ্ছদ। ব্রহ্মদেশের রিলিফ মানচিত্রের দিকে তাকালে দেশটিকে মনে হবে মানুষের হাতের মতো—উত্তর দিকের উচ্চ ভূমি যেন হাতের তালু, ক্রমে দক্ষিণ দিকে নীচু হয়ে এসেছে, পাহাড়গুলি আঙুলের মতো লম্বিত; পাহাড়শ্রেণীর মাঝ দিয়ে নীচু উপত্যকা যেন

আঙুলের ফাঁক, এর ভিতর দিয়ে বহু নদী প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। অতি কৃপণ লোক সম্বন্ধে আমরা বলি, তার হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল গলে না। ব্রহ্মদেশ তেমন নয়।

দেশটি সুজলা, উর্বর ভূমি শস্যে পরিপূর্ণ, দেশের মানুষ উদার এবং অকৃপণ। প্রাচীন কালে ভারতীয়গণ ব্রহ্মদেশের নাম দিয়েছিল 'সুবর্ণভূমি'। এদেশের প্রধান নদী ইরাবতী প্রায় নয় শত মাইল পর্যন্ত নৌবাহনযোগ্য, দক্ষিণ দিকে ক্রমে চওড়া হয়ে পড়েছে, কোন কোন স্থানে একূল থেকে ওকূলের দূরত্ব হবে ১০ মাইল। এই নদী এত বেশি পরিমাণ পলিমাটি নিয়ে আসে যে, যেখানে সাগরে এসে পড়েছে সেখানে বঙ্গোপসাগরের নীল জল অনেকদূর পর্যন্ত হলদে হয়ে থাকে। নদীর জলের রঙ কাঁচা সোনার মতো হলুদ, আবার উপত্যকার জমিতে যখন ধান পাকে, তখন সেদিকে যতদূর চোখ যায় দেখা যায়—রাশি রাশি থরে থরে পাকা সোনা ছড়ানো! পৃথিবীতে ধানের এত বেশি ফলন আর কোন দেশে নাই। তাই 'সোনার' দেশ ব্রহ্মদেশেরই যোগ্য নাম।

তিন ঋতু

আমাদের দেশে ছয়টি ঋতুর কথা আমরা জানি ; কিন্তু আসলে ঋতু তিনটিতেই দাঁড়ায়—শীতকাল, গরমকাল আর বর্ষাকাল। ব্রহ্মদেশেও এই তিনটি ঋতু। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব দিক থেকে কনকনে শীতল হাওয়া বইতে থাকে। এ বাতাসে মেঘ থাকে না। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গরমকাল, এ সময়ও বৃষ্টি হয় না। মে মাসের শেষদিক থেকে বর্ষার সূচনা। আমাদের দেশের কাল-বৈশাখীর মতো এখানেও দেখা যায় বজ্রের গর্জন আর দারুণ ঝড়বাদল। বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে যে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়, তা সমুদ্র থেকে রাশি রাশি মেঘ নিয়ে আসে এবং ব্রহ্মদেশে প্রচুর

বৃষ্টিপাত করে। সমুদ্রের উপকূলের আরাকান প্রদেশে বছরে বৃষ্টি হয় প্রায় ২ শত ইঞ্চি। উপকূলের পাহাড় আরাকানয়োমা উঁচু প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাই ঝড়বৃষ্টির দাপট এর ওপর দিয়েই যায় বেশি। দেশের ভিতরের দিকে বৃষ্টির পরিমাণ উপকূলের চেয়ে অনেক কম।

আমি ঢালিব করুণাধারা

সাগরের জল লোনা ; কিন্তু এই জল যখন সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে মেঘের আকারে বাতাসে ভেসে ভেসে দেশের মধ্যে যায়, তখন আর তাতে লবণের কণা থাকে না। সাগর যখন দেশকে জল দেয়, লবণ নিজে রেখে মিষ্টি জলই দেয়। মৌসুমী বায়ুর ফলে ব্রহ্মদেশে যে বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে উত্তরের বরফ-গলা জল মিশে তা অসংখ্য নদী ও ঝরনা সৃষ্টি করেছে। দেশের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ইরাবতী আর সিটাং। পূর্ব অঞ্চলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সাল্‌উইন। বহু ছোট-বড় উপনদী জলধারা নিয়ে এদের সঙ্গে এসে মিশেছে। নদীগুলিতে নৌকা ও স্টীমার যোগে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর সুবিধা আছে। তা ছাড়া মিষ্টি জল ও পলিমাটি বহন ক'রে নদীগুলি দেশ ও দেশবাসীর জীবনে এনেছে স্বাস্থ্য, সুখ ও সম্পদ। নদী ছাড়া ব্রহ্মদেশ কল্পনা করা যায় না।

বনজঙ্গল দেখে আসি

পাহাড়ময় বৃষ্টির দেশ, কাজেই বনজঙ্গল প্রচুর। উপত্যকায় ও নীচু অংশে কোনদিনই বরফ পড়ে না, তবে শীতকালে তিন হাজার ফুটের বেশি উঁচুতে কখনো কখনো তুষার জমতে দেখা যায়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনুসারে জঙ্গলের গাছপালার পার্থক্য হয়ে থাকে। বনজঙ্গল ঘুরে দেখতে গেলে আমরা দেখব, তিন হাজার ফুটের চেয়ে বেশি উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে চিরসবুজ ওক ও পাইন গাছ, আর মাঝে মাঝে ঘাস ও ঝোপঝাড়। চোখে চমক লাগিয়ে দেবে রডোডেনড্রন অরণ্য। রাশি

রাশি লাল ফুলে পাহাড় আলো ক'রে রাখে, মনে হয় বনে আগুন লেগেছে। যে-সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বৎসরে ৮০ ইঞ্চির বেশি, সেখানে ঘন নিবিড় বন; বড় বড় গাছ নীচের ঝোপজঙ্গল লতাপাতার বেড়াজাল ছাড়িয়ে সূর্যের আলো পাবার জন্য মাথা উঁচু ক'রে তুলেছে। যেখানে বৃষ্টির পরিমাণ এর চেয়েও কম, সেখানে পাহাড়ের গায়ে সেগুনের বন। গরমের দিনে গাছের পাতা ঝ'রে যায়, আবার বৃষ্টির দিনে সবুজ পাতায় গাছ যায় ভরে। ইরাবতী নদীর মোহানার বিরাট অঞ্চল জুড়ে রয়েছে গভীর অরণ্য। এর মধ্যে এমন অনেক গাছ আছে যা একশো ফুটেরও বেশি লম্বা, যেমন দীর্ঘ তেমনি বলিষ্ঠ। কাঠ ব্রহ্মদেশের একটি মূল্যবান সম্পদ।

বনে ঘুরলে আমরা যে কেবল নানা জাতের গাছপালা দেখব তা নয়, মাঝে মাঝে দেখা হবে এই সব জঙ্গলের বাসিন্দাদের সঙ্গে। গভীর বনে দেখা যাবে গিবন, গাছের ডালে দোল দিয়ে দিয়ে চলে, গাছের ডালে বাসা তৈরি ক'রে সপরিবারে বাস করে। হিমালয়ী কালো ভালুক ও মালয়ী ভালুক আছে, বানর আছে নানা জাতের। গাছের ডালে বানরের উত্তেজিত চিৎকার শুনলে বোঝা যাবে নীচে তারা বাঘ দেখেছে। রয়্যাল বেঙ্গল ও চিতাবাঘ উভয়কেই পাওয়া যাবে ঘন বনে, যেখানে হরিণের দল চরে বেড়ায়। এই নিবিড় বনেই গণ্ডারের দেখা মিলবে। বর্মীদের কাছে গণ্ডার বড় লোভের বস্তু। দড়ির জাল পেতে, তার চলার পথে গর্ত খুঁড়ে রেখে তারা গোপনে গণ্ডার শিকার করে। মাংস উপাদেয় খাদ্য, রক্ত আর শিং ওষুধে ব্যবহার করে। ওদের অনেকের ধারণা, গণ্ডারের খড়্গ অল্প অল্প ক'রে খেয়ে চিরযৌবন লাভ করা যায়। পাহাড়ের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কত শত ঝরনা বয়ে চলেছে। এই সব জায়গায় জলের ধারে গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকে পাইথন। কখনো ঝরনায় লম্বা হয়ে শুয়ে স্নান

করে, কখনো গাছের ডালে লেজ প্যাঁচ দিয়ে বটের ঝুরির মতো ঝুলে থাকে, লক্ষ্য শিকারের ওপর। তার নাগালের মধ্যে অতর্কিতে কোন ছোট প্রাণী এসে পড়লে তাকে ধ'রে দেহের পাকে পাকে জড়িয়ে পিষে আস্ত গিলে খাবে ধীরে ধীরে। পাহাড়ের গভীর বনে দেখা মিলবে বুনোহাতির দলের সঙ্গে। দলে ছোট-বড় স্ত্রী-পুরুষ সবাই থাকে। আর থাকে একজন ক'রে সর্দার, যেমন বুদ্ধিমান তেমনি হুঁশিয়ার। তবু মানুষের কৌশলের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। প্রতি বছর বর্মীরা খেদায় তরুণ বয়সের বুনোহাতি ধ'রে পোষ মানায়, শখ ক'রে পোষার জন্য নয়—তাদের দিয়ে জঙ্গলে কুলির কাজ করানোর জন্য!

শ্রমিক হাতি

ব্রহ্মদেশের বনে যত বেশি এবং যত ভালো সেগুনকাঠ হয়, পৃথিবীর আর কোন দেশে তেমন হয় না। এ কাঠ এক রকম অক্ষয়, উই ধরে না, জলে রোদে নষ্ট হয় না। কাজেই দামী আসবাব করতে এর চাহিদা খুব বেশি। বছরে প্রায় আড়াই লক্ষ টন সেগুনকাঠ এদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। সেগুনকাঠের বন পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে। সেখান থেকে ভারি ভারি কাঠগুলি বাঁশ ও কাঁটা বনের ভিতর দিয়ে টেনে বের ক'রে আনা মানুষের সাধ্য নয়। এ কাজ করে পোষা হাতিগুলি। সেগুনকাঠের গোলা ও চেরাই কারখানায় শত শত শ্রমিক হাতি আছে। কাঠ-টানার কাজে এরা মানুষের মতো বুদ্ধির পরিচয় দেয়। জঙ্গল থেকে টেনে বের করে, নদীতে ভাসিয়ে নেবার সময় সাঁতার কেটে সঙ্গে সঙ্গে চলে আর মাহুতের নির্দেশে কাঠগুলিকে কাছাকাছি রাখে যাতে এলোমেলো হয়ে ভেসে না যায়; কাঠের গোলায় সাজিয়ে রাখার সময়ও এরাই কাজ করে। কাঠের কাছে হামা দিয়ে কাঠের মাঝামাঝি নীচ দিয়ে দাঁত চালিয়ে তাকে উঁচু ক'রে শুঁড় দিয়ে চেপে ধ'রে তোলে যাতে পড়ে গিয়ে নষ্ট না হয়! এ

'শ্রমিকদের' নগদ দিনমজুরি নাই; তবে এরা নিয়মিত ছু 'পায় এবং এদের খাওয়ানো ও তদারক করার জন্য লোক নিযুক্ত আছে
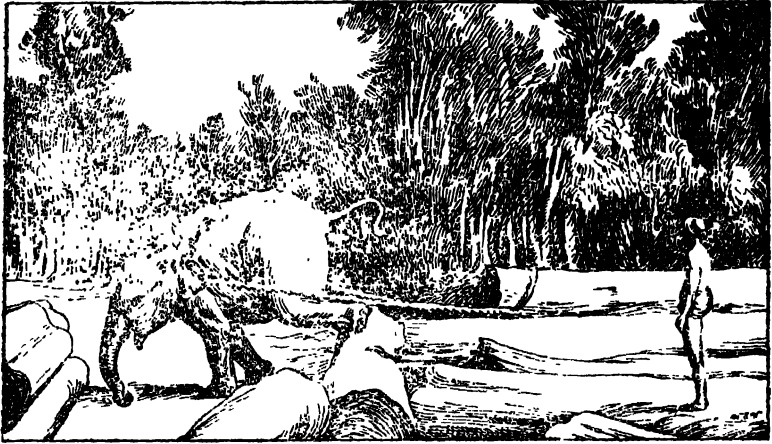
শ্রমিক হাতি কাঠ টানছে

গ্রাম ঘুরে দেখি

ব্রহ্মদেশ কৃষিপ্রধান আর গ্রামপ্রধান দেশ। দেশের লোকের শতকরা ৮০ জন কৃষিকাজ ক'রে জীবিকা অর্জন করে; এক লক্ষের বেশি লোক বাস করে এমন শহর দেশে মাত্র তিনটি—রেঙ্গুন, মান্দালয় ও মৌলমেন। ব্রহ্মদেশ আয়তনে ১ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১ কোটি ৮৫ লক্ষ অর্থাৎ দেশ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৭ গুণ বড় কিন্তু এর অধিবাসীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকের মতো। গ্রাম ঘুরে দেখলে লোকেদের বাড়িঘর ও জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যাবে।

দশ থেকে একশোখানা বাড়ি নিয়ে এক-একটি গ্রাম। পাহাড়ের গায়ে, উপত্যকায় রয়েছে ঝোপ ও বনজঙ্গল। প্রতিটি গ্রাম চোর-ডাকাত ও বন্যজীবের উৎপাত থেকে রক্ষার জন্য বাঁশকাঠের বেড়া দিয়ে

ঘেরা। গ্রামের সাধারণ লোকের বাড়িগুলি বাঁশ ও কাঠের খুঁটির ওপর তালপাতার ছাউনি, বাঁশের চাটাই বা পাতা দিয়েই বেড়া তৈরি। কতকের বাড়িঘর আগাগোড়া কাঠের তৈরি। বর্মীরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মে জাতিভেদ নাই; বর্মীদের সমাজেও তাই জাতি হিসাবে ছোট-বড়র ভেদ নাই। চাষ-আবাদের কাজ, কাঠ বাঁশ বেতের জিনিস তৈরি করা, সুতা কেটে কাপড় বোনা, গাছের ছাল ও লতাপাতা থেকে রঙ তৈরি করা, সোনারূপার গহনা তৈরি করা, কাঠের লাঙল, গরুর গাড়ির চাকা প্রভৃতি তৈরি করা, গালার কাজ করা এদের কুটীরশিল্পের বিষয়। উত্তর দিকের ডাঙা অঞ্চলে গরু দিয়ে লাঙল টানানো হয়; ইরাবতীর তীরবর্তী জমিতে যেখানে জল-কাদা হয় বেশি সেখানে জমিচাষে মোষের ব্যবহার হয়ে থাকে।

ব্রহ্মদেশের মহিলা

আমাদের দেশের মতোই চাষীরা রোদ-বৃষ্টিতে মাঠে কাজ করে, যখন মাঠে কাজ কম থাকে তখন গান-বাজনা আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে। অবসর-সময়ে বাড়িতে সবাই কিছু-না-কিছু কাজ করে; এর মধ্যে তাঁতে সূতি ও রেশম কাপড় তৈরি করাই প্রধান। দেশে কাপড় তৈরির কল-কারখানা নাই, কাজেই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। অধিকাংশ পরিবারেই নিজেদের কাপড় তৈরির ব্যবস্থা আছে। বর্মী মেয়েরা রীতিমত পরিশ্রমী। পুরুষদের সঙ্গে তারা মাঠে কাজ করে, দোকানপাট চালায়, আবার সুতা তৈরি ক'রে কাপড়ও বোনে।

বর্মী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই একই প্রকার পোষাক পরে। রেশম বা স্থূতির লুঙ্গি এবং গায়ে-আঁটা জ্যাকেট তাদের সাধারণ পরিচ্ছদ। পুরুষেরা বেশির ভাগ রঙিন জ্যাকেট পরে, মেয়েরা পছন্দ করে সাদা রেশমী জ্যাকেট। অনেক সময় পোষাক দেখে স্ত্রী-পুরুষ চেনা কঠিন হয়, তবে একটি সঠিক উপায় আছে: পুরুষেরা মাথায় রুমালের মতো

ব্রহ্মদেশের নৃত্য

একখণ্ড কাপড় বেঁধে রাখে, একে বলে গাউং-বাউং; মেয়েরা তাদের দীর্ঘ কালো চুল পরিপাটি ক'রে খোঁপা বাঁধে। উৎসবের সময় মেয়েরা পরে মাটি-পর্যন্ত-লুটিয়ে-পড়া নক্সা-করা রেশমী লুঙ্গি; দেহের সঙ্গে এমন আঁট-সাঁট ক'রে রাখে দেখে মনে হয় হাঁটা কষ্ট হবে কিন্তু এই পোষাকেই তারা লীলায়িত ভঙ্গিতে নাচগান করে। বর্মী ছেলেদের লেখাপড়া শেখার যেমন বন্দোবস্ত আছে, মেয়েদের তেমন নাই। তবু মেয়েরা

বুদ্ধি ও সাংসারিক নানা কাজকর্মে পুরুষের চেয়ে হীন নয়। ব্রহ্মদেশে পর্দাপ্রথা নেই, মেয়েরা ঘোমটায় মুখ ঢাকে না, মাথায়ও আঁচল দেয় না; হাটেবাজারে মাঠেঘাটে কাজ করতে তাদের কোন সংকোচ নেই। বর্মী মেয়েরা যতখানি স্বাধীনতা ভোগ করে, অ-ইউরোপীয় অন্য কোন জাতির মেয়েদের মধ্যে ততখানি নেই। মেয়েরা সুগৃহিণী, আবার কাজকর্মে পুরুষের সঙ্গিনী। ব্রহ্মদেশে দাড়িওয়ালা লোক নেই, গোঁফ আছে এমন পুরুষও সহসা চোখে পড়ে না।

ধর্ম ও জীবন

বর্মীরা বৌদ্ধ। ধর্ম তাদের জীবনের অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে, ধর্মের আচার-নিয়ম পালন করা তাদের নিত্যকাজের অঙ্গ। প্রতি গ্রামে একটি ক'রে বৌদ্ধমঠ আছে; একে বলা হয় 'পোঙ্গি কিয়াং'। বেড়া-দিয়ে-ঘেরা গ্রামের বাইরে এই মঠে বাস করেন একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। মুণ্ডিতমস্তক, পরণে গেরুয়া বস্ত্র। মঠের সন্ন্যাসী হলেন গ্রামের লোকেদের ধর্মগুরু; এঁকে বলা হয় 'পোঙ্গি'। পোঙ্গি কিয়াং মঠ এবং বালকদের বিদ্যালয় দুই-ই। গ্রামের শিশু কিশোররা এখানে নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করে। বর্মী সমাজের নিয়ম অনুসারে প্রতি কিশোরকে কিছুদিন মঠে বাস ক'রে বিদ্যা ও ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। বেশির ভাগ কিশোরই আবার বাড়িতে ফিরে গিয়ে সংসারী হয়, কেউ কেউ মঠে বাস ক'রে সন্ন্যাসী জীবন যাপন করে। এদেশে মঠের সন্ন্যাসীদের সকলেই সমীহ ও সমাদর করে। প্রতি গ্রামে দেখা যাবে সাদা রঙের প্যাগোডা—ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের। প্রায় প্রতি পাহাড়ের চূড়াতেই আছে শুভ্র প্যাগোডা, নীল আকাশের নীচে এগুলি বড় বড় শঙ্খের মতো দেখায়। এগুলি ঠিক মন্দির নয়, পবিত্র স্থানের প্রতীক। বর্মীদের ধর্মের প্রধান নীতি হ'ল—এই জীবনে ভালো কাজ ক'রে 'নেইক্‌বান' (নির্বাণ) লাভের যোগ্যতা অর্জন করা;

ভালো কাজ হ'ল—গরীবদুঃখীকে সাহায্য করা, সাধুসন্ন্যাসীকে অন্নদান করা, মঠ ও প্যাগোডা প্রতিষ্ঠা করা, পথিকের জন্য বিশ্রামশালা তৈরি ক'রে দেওয়া ইত্যাদি। বর্মীদের বিশ্বাস, মানুষের মঙ্গলকারী দেবতা যেমন আছে, তেমনি অপকারী অপদেবতাও আছে। এরা বিরূপ হয়ে
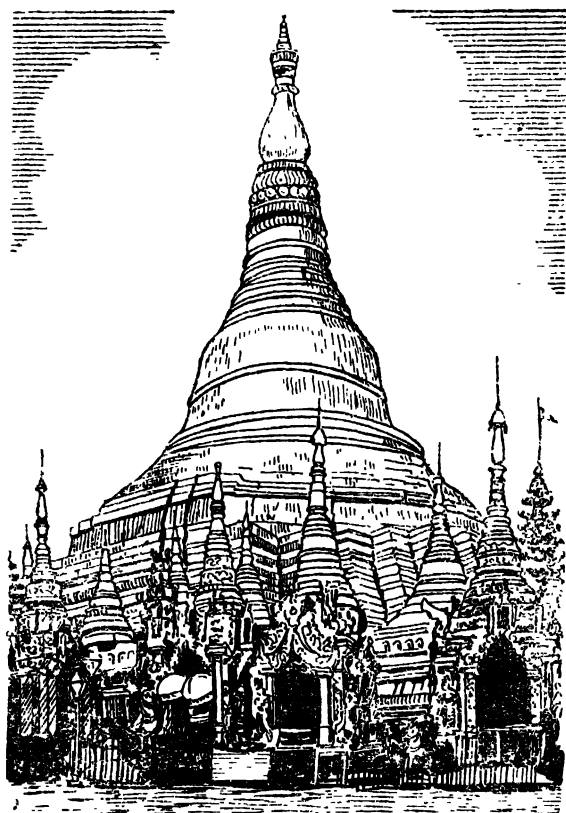
প্যাগোডা

যাতে কোন ক্ষতি না করে, সেজন্য সু-দেবতার সঙ্গে কু-দেবতার পূজাও তারা দিয়ে থাকে। প্রায় প্রতি গ্রামেই দেখতে পাওয়া যায় লম্বা খুঁটি পোঁতা, সেখানে অপদেবতার উদ্দেশ্যে ভোগনৈবেদ্য দেওয়া হয়।

বর্মীদের খাদ্য সাদাসিধা রকমের। দেশে ধান হয় প্রচুর। নিজে-দের প্রয়োজন মিটিয়ে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ তারা বাইরে রপ্তানি করে। কাজেই ভাত হ'ল প্রধান খাদ্য। এর সঙ্গে থাকে মাছের চচ্চড়ি, পেঁয়াজ ও লঙ্কা। লবণ-মিশানো শুকনো মাছ এদের কাছে খুব প্রিয়। সারা বছরের জন্য এরা মাছ শুট্‌কি ক'রে রেখে দেয়। চীনাদের মতো বর্মীরা কাঠি দিয়ে খায় না, কয়েকটি আঙুল দিয়ে ছোট দলা পাকিয়ে তাতে একটু মাছ বা তরকারি দিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে আলগোছে মুখে তুলে দেয়। প্রধান আহার দিনে দুইবার। মঠের শ্রমণরা খায় দিনে একবার। দুপুরের পর তারা আর কোন খাদ্য গ্রহণ করে না। দুধ মাখন বর্মীরা বড় একটা খায় না; পাহাড়ময় দেশে গরু পোষার রেওয়াজ নাই। সাধারণভাবে বলা যায়, বর্মীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, হাসিখুশি, কৌতুক ও আরামপ্রিয়। টাকাপয়সা সঞ্চয় করার দিকে এদের বিশেষ ঝোঁক নাই। খাওয়া-পরার অভাব না থাকায় লোকেরা দিল্‌দরিয়া। অর্থ-শালী লোকেরা স্ত্রী-কন্যাদের সাজসজ্জার জন্য মূল্যবান অলংকার কিনে দেয়, প্রতিবেশী আপনজনকে ভোজে আপ্যায়িত করে, কেউ কেউ ভগবান বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্যাগোডা তৈরি ক'রে দেয় এবং ভারতে এসে বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন ক'রে যায়। ব্রহ্মদেশে হাজার হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ আছে; সমাজের লোকেরা প্রসন্নমনে এদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে।

জাতি ও ভাষা

বর্মীরা ব্রহ্মদেশের আদি বাসিন্দা নয়। এরা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোক; এদের আদিপুরুষ তিব্বতের পূর্ব অঞ্চল থেকে দক্ষিণ দিকে এদেশে বসতি সুরু করেছিল। মঙ্গোলীয় ছাড়া অন্য গোষ্ঠীর লোকও আছে, তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম; তারা দুর্গম পাহাড়-পর্বত এলাকায় বাস করে। অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও ধর্ম-

প্রচারকরা এদেশে এসেছিল। ব্রহ্মদেশ এদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে বৌদ্ধ ধর্ম ও সভ্যতা। বর্মীদের ভাষার সঙ্গে চীনা ভাষার মিল আছে। শব্দগুলি প্রত্যেকটি এক-স্বর-যুক্ত এবং উচ্চারণের পার্থক্যের জন্য এর অর্থের তারতম্য হয়। বর্মী ভাষা লেখা হয় ভারতীয় পালি হরফে। ব্রহ্মদেশ ভারতের কাছ থেকে ধর্ম, সভ্যতা, লেখার অক্ষর গ্রহণ করেছে। ভারতীয় অনেক শব্দও তাদের ভাষায় স্থান পেয়েছে।

কল-কারখানায় একনজর

চাষ-আবাদ এদেশের লোকেদের প্রধান উপজীবিকা, দেশে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রসার হয়নি। কৃষি ও খনি থেকে যে জিনিস পাওয়া যায় তা অবলম্বন ক'রে কিছু কারখানা আছে। ইরাবতী নদীর তীরে বিরাট বিরাট কাঠের কারখানায় কাঠ চেরাই হয়, চাউল কলগুলিতে লক্ষ লক্ষ মণ ধান ভানার ব্যবস্থা আছে। এদেশের খনিজ দ্রব্যের মধ্যে প্রধান হ'ল পেট্রোলিয়ম। এক সময়ে কূয়ার মতো ক'রে মাটি খুঁড়ে তেল পাওয়া যেত; বর্মা তেল কোম্পানি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এই তেল রপ্তানি করতো। তেলের বড় খনি হ'ল এনাং-গিয়াং নামক স্থানে। আগে মাটির হাঁড়িতে ক'রে তেল ইরাবতী দিয়ে ভাসিয়ে রেঙ্গুনে নিয়ে আসা হ'ত। এখন ১০ ইঞ্চি মোটা নল দিয়ে এই তেল রেঙ্গুনের নিকট সিরিয়াম তেল-শোধনাগারে নিয়ে আসা হয়। রবার চাষও ব্রহ্মদেশের একটি লাভজনক কাজ।

বন্দরে কি আসে, যায়

ব্রহ্মদেশ অরণ্য ও ধানের দেশ। তাই এদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি হয় চাউল, সেগুনকাঠ, অন্যান্য শক্ত কাঠ ও পেট্রোলিয়ম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বছরে সাড়ে তেত্রিশ লক্ষ টন* চাউল বিদেশে

---

* ১ টন ২৭ মণের সমান।

বিক্রি হ'ত, এর প্রায় অর্ধেক যেত ভারতবর্ষে। ১৯৫৪-৫৫ ১৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টন চাউল বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। ব্রহ্মদেশকে বলা যায় এশিয়ার চাউল-ভাণ্ডার। চাউলের পরই প্রধান রপ্তানী দ্রব্য হ'ল পেট্রোল ও পেট্রোল-জাত দ্রব্য, কাঠ এবং তূলা। বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় কাপড়, যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র, লোহা ও কাচের জিনিস, সাইকেল, সেলাই-কল প্রভৃতি মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্য। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় টাকা এদেশে প্রচলিত ছিল; এখন বর্মী টাকা চালু হয়েছে, নাম কিয়াত। এক কিয়াত ভাঙিয়ে ১০০ পিয়াস বা পয়সা হয়।

শিক্ষা

ব্রহ্মদেশে প্রতি গ্রামের বৌদ্ধ মঠগুলি বালকদের প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে থাকে। এরূপ মঠ-বিদ্যালয়ের সংখ্যা হবে প্রায় ৪০ হাজার। এ ছাড়া সরকার-পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে প্রায় ৯ হাজার। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ। প্রাইমারীর পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং, আইন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মান্দালয় কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ আছে।

গভর্নমেণ্ট

ইংরাজরা ব্রহ্মদেশ অধিকার ক'রে ৬১ বছর এখানে রাজত্ব করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা এদেশ দখল ক'রে নিয়েছিল। যুদ্ধের পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হয়েছে; এদেশ বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্য নয়। ব্রহ্মদেশ ভারতের মতো প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র; প্রেসিডেণ্ট হলেন রাষ্ট্রের প্রধান, তবে প্রকৃত শাসন পরিচালনা করেন

প্রধান মন্ত্রী। ভারতের মতোই এদেশে দুইটি হাউস বা সভাবিশিষ্ট পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য চালায়। বর্মী ছাড়া আর যে সকল সংখ্যালঘু দেশীয় উপজাতির লোক আছে, তারা নিজ নিজ অঞ্চলে স্বায়ত্ত শাসন ভোগ করে—যেমন শানরাজ্য, কাচিনরাজ্য, কায়ারাজ্য। দুর্গম পাহাড় অঞ্চলের উপজাতিদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা আছে কিন্তু এগুলি উন্নত নয়। বর্মী ভাষা রাষ্ট্রের ভাষারূপে গৃহীত হয়েছে, তবে অফিসের কাজে বিশেষ ক'রে আইন-আদালতে ইংরাজি ভাষার প্রচলন রয়েছে। ইংরাজি ভাষার ব্যবহার ও উপযোগিতা লক্ষ্য ক'রেই একে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়নি। ভারতে ও সিংহলে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, ব্রহ্মদেশ তার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে।

নেপাল

ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের দিকে তাকালে হিমালয়ের ঠিক দক্ষিণ দিয়ে একফালি দেশ দেখা যায়। মায়ের কোলে শুয়ে দুধ-পানে-রত শিশুর মতো এই দেশ নেপাল। উত্তর দিকে হিমালয়ের উঁচু উঁচু চূড়া; সমগ্র পর্বত এক বিরাট প্রাচীরের মতো নেপালকে যেন উত্তরের তীব্র শীতল হাওয়া থেকে আড়াল ক'রে কোলের কাছে রেখেছে। দেশটি ৫২৫ মাইল লম্বা, ৯০ থেকে ১৪০ মাইল চওড়া। আয়তন ৫৪ হাজার ৫৯০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবমতো ৮৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৫৩৭ জন। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তুলনায় নেপাল আয়তনে এর দ্বিগুণ কিন্তু লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের চার ভাগের এক ভাগ।

নেপাল ভারতের অতি-নিকট প্রতিবেশী। এমনি আরো দুইটি রাজ্য আছে—সিকিম ও ভুটান। ধর্ম, রাজনীতি, ভাষা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের সঙ্গে অনেকদিন থেকে এদের প্রীতির সম্পর্ক রয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে দেখলে এদেরকে ভারতের সঙ্গে একই পরিবারের সদস্য ব'লে মনে হবে।

দেশটি কেমন

আমরা যদি ভারত থেকে সীমান্ত পার হয়ে নেপালের দক্ষিণ অংশে প্রবেশ করি, প্রথমে মনেই হবে না, কোন নূতন রাজ্যে এসেছি। উভয় দেশের সীমান্তের ভূমি এক রকম, ফসলও একই রকম। কিন্তু ক্রমে দেশের মধ্যে উত্তর দিকে এগিয়ে গেলে বোঝা যাবে বনজঙ্গলের রাজ্যে এসেছি। মাইল কুড়ি চওড়া এই নিবিড় বনভূমি নেপালের দক্ষিণ অংশ দিয়ে পূব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। এমন গভীর অরণ্য ভারতের কোন অঞ্চলে নাই। এই অরণ্য-অংশের নাম নেপালী তরাই। তরাই হ'ল পাহাড়ের পাদদেশের নীচু অংশ। তরাই পার হয়ে উত্তর

দিকে গেলে পাওয়া যাবে মাঝারিধরনের উঁচু শিবালিক পর্বতমালা। মাঝে মাঝে উপত্যকা দিয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। পাহাড়ের গায়ে গভীর বন, উপত্যকায় চাষ-আবাদ হয়। শিবালিকের উত্তর দিকে হিমালয়ের পাদভূমি চার হাজার থেকে দশ হাজার ফুট উঁচু। এর পরই তুষারে-ঢাকা হিমগিরি দুর্জয় প্রাচীরের মতো নেপাল ও উত্তরে তিব্বতের মধ্যে প্রসারিত। ভূমির গঠনের দিক থেকে নেপালকে হিমালয়ে ওঠার তিন-ধাপ-ওয়ালা সিঁড়ির সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রথম ধাপ তরাই অঞ্চল, দ্বিতীয় ধাপ শিবালিক পর্বতমালা, আর তৃতীয় ধাপ তার উত্তরের উচ্চ পর্বত-অঞ্চল। নেপালের উত্তর সীমান্তে পৃথিবীর নাম-করা উঁচু পর্বতশৃঙ্গগুলি বরফের মুকুট প'রে প্রতিযোগীর মতো লাইন ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নেপালের যে-কোন ছোট পাহাড়ের চূড়া থেকে মাউণ্ট এভারেস্ট, মাকালু, কাঞ্চনজংঘা, ধবলগিরি, গৌরীশংকর শৃঙ্গ অপূর্ব সুন্দর দেখায়। সূর্যোদয়ের সময় এদের ওপর সোনালি রঙ ঝলমল করে, আবার সূর্যাস্তের সময় মনে হয় কে যেন রাশি রাশি আবীর কুম্‌কুম্‌ ছড়িয়ে দিয়ে গেল! এমন মনোহর দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যাবে না।

নেপালে তিনটি ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত. এপ্রিল মে দুই মাস গরমকাল। জুন থেকে সুরু হয় বর্ষা। বর্ষার আগ দিয়ে বজ্রবিদ্যুৎসহ তীব্র ঝড় বইতে থাকে আমাদের দেশের কালবৈশাখীর মতো। পাহাড়ে বাধা পেয়ে এই ঝড় ক্ষ্যাপা দৈত্যের মতো তীব্রবেগে ছুটে আসে। ভূমিকম্প হয় মাঝেমাঝেই।

বনজঙ্গল ঘুরে দেখি

বিরাট অঞ্চল জুড়ে গভীর বন দেখতে হ'লে যেতে হবে নেপালের তরাই প্রদেশে। পায়ে-হেঁটে বনে প্রবেশ করা যাবে না, যেতে হবে হাতির পিঠে চড়ে। বঙ্গোপসাগর থেকে মৌসুমী বায়ু যে মেঘ নিয়ে

আসে, হিমালয়ে বাধা পেয়ে তা নেপালের দিকে চলে আসে এবং পাহাড়ের গায়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত করে। হিমালয়ের বরফ-গলা-জলের বহু নদী ও ঝরনা বয়ে চলেছে এ অঞ্চলের ভিতর দিয়ে। প্রচুর বৃষ্টি পায় ব'লে গাছপালা ঘন, সতেজ, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। শাল, শিশু, শিমুল প্রভৃতি গাছ সূর্যের আলো লাভের জন্য নিজেদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা ক'রে বেড়ে উঠেছে। তলায় ঝোপজঙ্গল নিবিড়। পায়ে হেঁটে গেলে জোঁক সারা গা ছেয়ে রক্ত শুষে নেবে, পাইথন আর নানা জাতের সাপ আছে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে। কে কখন আক্রমণ করে ঠিক নাই। এ ছাড়া সাক্ষাৎ যমস্বরূপ রয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক, বুনোহাতি, গণ্ডার, বাইসন, বুনোমোষ। তরাই বনভূমি এদের নিরাপদ বাসভূমি কিন্তু মানুষের পক্ষে মোটেই নিরাপদ বা স্বাস্থ্যকর নয়। তরাই-এর মধ্যভাগ মানুষের বাসের অযোগ্য— স্যাঁতসেঁতে, ম্যালেরিয়াপূর্ণ, নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা।

তরাই-এর উত্তরে শিবালিক পর্বতের গায়ে যে অরণ্য তাতে দেখা যায় এমন সব গাছপালা যা সাধারণত ইউরোপের শীতল অঞ্চলে জন্মে— যেমন ওক, ওয়ালনাট, ম্যাপল প্রভৃতি। এছাড়া আছে পাহাড়ী বাঁশ, রডোডেনড্রন ও বুনো চেরিফুলের গাছ। এটি ফুলের রাজ্য। বুনো গোলাপ আর রডোডেনড্রনের ফুলে পাহাড় সুন্দর উদ্যানের মতো দেখায়। পাহাড়ের আরো উঁচু অংশে গাছপালা আকারে ছোট হয়ে গেছে। এখানে জন্মে জুনিপার ঝাউ, ক্ষুদে রডোডেনড্রন ও আলপাইন জাতীয় অন্যান্য উদ্ভিদ। বনজঙ্গলের তারতম্যের সঙ্গে এ-সব অঞ্চলের বন্য জীবও পৃথক রকমের। পাহাড়ের উঁচু অংশে দেখা যায় চমরী গরু, বুনো ছাগল ও ভেড়া, কস্তুরীমৃগ, বাদামি ভালুক। শীতকালে হিমালয়ের কাছাকাছি ও উত্তর অঞ্চলে যখন জল শক্ত বরফে পরিণত হয়, তখন নেপালের নীচু অংশে মরশুমি বুনো পাখির ভিড় জমে। দলে দলে আসে

রাজহাঁস, বেলেহাঁস আর নানা জাতের উড়ন্ত জলচর অতিথিগণ। কিছুদিন এখানে কাটিয়ে এরা আবার চলে যায় অন্য দেশে। নেপাল যেন প্রকৃতির বোটানিক গার্ডেন আর বিচিত্র পশুপক্ষীর চিড়িয়াখানা।

অধিবাসী

নেপালের ভূমি যেমন বিচিত্র রকমের এখানে তেমনি বহু জাতির লোকের বাস। তবে এদের বেশির ভাগেরই উৎপত্তি মঙ্গোলীয় জাতি থেকে। এরা হ'ল ভুটিয়া, লেপ্‌চা, মগর, গুরুং, কিরান্‌টি প্রভৃতি। নেপালীদের মধ্যে গুর্খা এবং নেওয়ার সম্প্রদায়ই প্রধান। ভারতবর্ষের মুসলমান আমলে কতক রাজপুত নেপালে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এরা নেপালের অন্যান্য জাতির লোকেদের সঙ্গে বিবাহাদি ক'রে এখানেই স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকে। গুর্খারা এদেরই বংশধর। গুরুং, মগর এবং গুর্খারা হিন্দু, নেওয়াররা বৌদ্ধ। নেপালে যদিও হিন্দু ধর্মই প্রধান, তবু হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই ধর্মই পাশাপাশি রয়েছে; বৌদ্ধরা হিন্দু ধর্মের বহু ক্রিয়াকলাপ ও আচরণ নিজেদের ধর্মে ও জীবনে গ্রহণ করেছে।

নেপালীদের মধ্যে কয়েকটি ভাষার প্রচলন আছে। গুর্খারা যে ভাষা ব্যবহার করে, তা নেপালের সরকারী ভাষা। একে বলা হয় পর্বতীয়া বা পাহাড়ি। এ পাহাড়ি ভাষা এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে; লেখা হয় দেবনাগরি হরফে। অন্য ভাষাগুলি তিব্বতী ভাষার মতো কিন্তু এর মধ্যেও অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে; ভুটিয়ারা ব্যবহার করে তিব্বতী ভাষা ও বর্ণমালা।

আইনকানুন

আগে নেপালে আইনকানুন অত্যন্ত কঠোর ছিল। অপরাধ করেছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে অথবা জ্বলন্ত কাঠের টুক্‌রা বা তপ্ত লোহা হাতে দিয়ে দেখা হ'ত তার ফোস্কা পড়ে কিনা। এমনিভাবে আগুনের পরীক্ষায় দোষী ঠিক হ'লে

অপরাধীর হাত পা কেটে দেওয়া হ'ত। বর্তমানে এই অমানুষিক ব্যবস্থা বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছে। নেপালী আইনে স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ ও গাভীর প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখানো হয়। দেশদ্রোহী হ'লে বা নরহত্যা করলে অপরাধীর শাস্তি প্রাণদণ্ড, গাভী হত্যা করলেও তার শাস্তি মৃত্যু। গাভীর অঙ্গহানি করলে তার শাস্তি যাবজ্জীবন জেল। কিন্তু ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীলোক গুরুতর অপরাধ করলেও তারা মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পায়।

নেপালীদের কতকের বিবাহের নিয়ম অদ্ভুতধরনের। গুর্খাদের মধ্যে বিবাহের প্রথা ভারতীয় হিন্দুদের মতোই। এদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু নেওয়ারদের রীতিনীতি আলাদা। নেওয়ার বালিকা যখন শিশু, তখনই বেলফলের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে ফলটি নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সে বেলের আর খোঁজ করা হয় না; ধ'রে নেওয়া হয় সে-নেওয়ারী কোনদিন বিধবা হবে না। কিশোরী বয়সের হ'লে তার আবার বিবাহ হয়, এবার কোন ফলের সঙ্গে নয়, পুরুষ মানুষের সঙ্গে। এদের বিবাহের বাঁধনে খুব কড়াকড়ি নাই। বিবাহ বিচ্ছেদ করতে কোন আইন-আদালতে যেতে হয় না। স্ত্রী স্বামীর বালিশের নীচে একটি পান রেখে দিলেই বিয়ে বাতিল হয়ে গেল। চির-সধবা নেওয়ারী আবার অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। কোন কোন জাতির লোকের মধ্যে স্ত্রীলোকেরও একসঙ্গে একের বেশি পতি গ্রহণ করার রীতি আছে। স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম এবং একার পক্ষে স্ত্রীর ভরণপোষণ করা কঠিন হ'লে কয়েকজন পুরুষ মিলে একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ ক'রে থাকে।

ওরা কাজ করে

দেশে গোর্খালি এবং নেওয়ারদের সংখ্যাই বেশি। গোর্খালিরা কাজ করে সৈন্য-বিভাগে, জোয়ান সিপাই তারা। জাতিহিসাবে

সামরিক কাজের দিকে তাদের ঝোঁক। সাহসী, বিশ্বাসী ও কর্তব্য-পরায়ণ। রক্তপাত ও পরিশ্রমের কাজ দেখে তারা ভয় পায় না। নেওয়াররা চাষ-আবাদের কাজ করে। জমিতে ফসল ফলাতে এরা কঠোর পরিশ্রম করে। গোর্খালিরা প্রাণ নিতে আর দিতে প্রস্তুত, নেওয়াররা প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণপাত করতে প্রস্তুত। উপত্যকায় ও পাহাড়ের গায়ে যেখানে আবাদযোগ্য জায়গা পাওয়া যায়, সেখানেই এরা কিছু-না-কিছু ফলাবে। ধান, ভুট্টা, আলু, গম, চিনাবাদাম, বড় এলাচি প্রচুর ফলে। পাহাড়ের ঢালু গা ধাপে ধাপে কেটে সমতল ক'রে নিয়ে আবাদি জমি তৈরি ক'রে নেয়। মোষ ও গাভী অনেকে পোষে কিন্তু গোচারণের উপযুক্ত সমভূমি না থাকায় গোয়ালে বেঁধে খাওয়াতে হয়। অনেকে অবশ্য বনজঙ্গল ঝোপঝাড়ে চ'রে বেড়ানোর জন্য গরু-মোষ ছেড়ে দেয়; তার কিছু যায় বাঘের পেটে।

পাহাড়ের উঁচু অংশে ইউরোপের কতক ফসলের উপযোগী জলবায়ু। পাহাড়ের গায়ে আপেল, নাশপাতি, কুল উৎপন্ন হয় প্রচুর। নেপালের কমলালেবু এবং আনারস নাম-করা। নিম্ন উপত্যকায় আবাদের প্রধান ফসল হ'ল ধান, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, আখ, শসা, কুমড়া প্রভৃতি। পাহাড় ও তরাই অঞ্চলে কিছু কিছু তামাক ও চা উৎপন্ন করা হয়, তবে খাদ্যশস্যের প্রতিই জোর দেওয়া হয় বেশি। নেওয়াররা হাঁস মুরগী, বিশেষ ক'রে হাঁস, পালন ক'রে থাকে। সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই হাঁসের ডিমের চাহিদা খুব বেশি।

নেপালের নেওয়ারগণ খাঁটি বৈশ্য। কৃষি, গোপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য এদের কাজ। ফসল উৎপাদন করে এবং তা নিয়ে ব্যবসাও করে। খাদ্যশস্য, বস্ত্র, তেল, লবণ, তামাক প্রভৃতির ব্যবসা দেশের মধ্যে এরাই চালায়, তিব্বতের সঙ্গেও বাণিজ্য চলে এদের হাত দিয়েই।

খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ

নেপালীদের প্রধান খাদ্য ভাত, রুটি, আলু, ছাগল ও মোষের মাংস, ডিম, হরিণ ও পাখির মাংস প্রভৃতি। পাহাড়ের নীচু অংশে যারা বাস করে তারা মাছও খায়। মাংসের জন্য ছাগল ও মোষ বেশি সংখ্যায় পোষার সুবিধা নাই, কাজেই ছাগল ভেড়া মোষ বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। নেপালে হিন্দুদের পূজামন্দিরে মোষ বলি দেওয়ার রীতি আছে। পশুপতিনাথ নেপালের প্রধান আরাধ্য দেবতা। রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে এঁর বিরাট মন্দির আছে। শিবরাত্রির সময় এখানে খুব ধুমধাম ক'রে উৎসব হয়। নেপালীদের পোষাক স্ত্রী-পুরুষের এক রকম নয়। পুরুষেরা পরে ব্রিচেসের মতো পায়ের নীচের দিকে চাপা প্যাণ্ট, সার্ট কোট; মেয়েরা পরে ঘাগরা ও ব্লাউস। ভোজালি বা কুক্‌রি নেপালীদের একরকম জাতীয় অস্ত্র এবং মাঠেঘাটে বনেজঙ্গলে চলার সময় নিত্যসাথী। ঝোপজঙ্গল কেটে পথ করতে, বন্যজীবের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে এরূপ অস্ত্রের প্রয়োজন খুবই।

খনিতে কী মেলে?

পাহাড়ময় দেশ নেপালে নানা ধাতুর খনি আছে। তামা, গন্ধক, লোহা ও সীসা আছে অনেক পরিমাণে; উত্তর অংশে রূপা ও সোনা আছে ব'লে জানা গেছে। তামার খনি অগভীর ব'লে এখানে খনি থেকে তামা তোলা সহজ হয়েছে। কিন্তু যে পরিমাণ খনিজ দ্রব্য আছে, তা খনি থেকে সংগ্রহ করা এবং তা দিয়ে কোন বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলা কঠিন, কেননা দেশে কয়লার অভাব; পাহাড়ী দুর্গম অঞ্চলে কল-চালিত যানবাহন চলাচল করানোও সহজ নয়। পাহাড়ের গা দিয়ে বা উপত্যকায় উঁচুনীচু সরু পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে চলতে হয়; মোটর চলার উপযোগী পথ আছে মাত্র ৭৫ মাইল, ভারত সীমানা থেকে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই পথ চালু হয়। সারাদেশে রেলপথ

মাত্র ৭৬ মাইল। উত্তরের উঁচু অংশে রেললাইন বসানো সম্ভবপর নয়। কাজেই দ্রুত চলাচলের সমস্যা এদেশে একটি বড় সমস্যা।

বাইরে থেকে কি আসে, বাইরে কি যায়

চাষ-আবাদের কাজই নেপালীদের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায়। গোর্খালিরা বিদেশে এবং স্বদেশের সৈন্যদলে কাজ করে। নেওয়ারগণ চাষ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে, ছোটখাট শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালায়। দেশে যা উৎপন্ন হয় এবং খনি থেকে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তারই বিনিময়ে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হয়। নেপাল থেকে রপ্তানি করা হয় কাঠ, আলু, ধান, পশুচামড়া, আফিং; আমদানি হয় কাপড়, চিনি, তামাক, দেশলাই, লবণ, পশমবস্ত্র, লোহা ও তামার জিনিস, ওষুধপত্র প্রভৃতি। ব্যবসা-বাণিজ্য বেশির ভাগ চলে ভারতের সঙ্গে। ভারত ও নেপালের সীমানায় যে সব বড় হাটবাজার আছে সেখান দিয়েই জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানি হয়ে থাকে।

নেপালের উন্নতিসাধনের জন্য ভারতের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। এদেশের ছোটখাট জলসেচ পরিকল্পনা চালু করার জন্য ভারত ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা পাঁচ বৎসর ধ'রে দিতে রাজী হয়েছে। ভারত থেকে যে সকল দ্রব্য নেপালে রপ্তানি করা হয়, তার ওপর ভারত কোন কর ধার্য করে না; নেপাল সরকার এর ওপর আমদানি-কর বসিয়ে বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা লাভ করে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত নেপাল থেকে ১৩ কোটি টাকা মূল্যের জিনিস কিনেছিল, নেপাল ভারত থেকে নিয়েছিল ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার দ্রব্য। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে নেপালই ছিল লাভবান।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

পথঘাট যেখানে দুর্গম এবং যাতায়াত সহজ নয়, সেখানে সকল লোকের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া কঠিন। নেপালে বালক-

বালিকাদের শিক্ষার জন্য ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাইমারী স্কুল ছিল ৯২১টি, মাধ্যমিক ও বৃত্তিশিক্ষার স্কুল ৩৯৯টি। কাঠমাণ্ডুতে উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ আছে। রাজধানীতে ২টি বড় হাসপাতাল আছে এবং ছোট ছোট আরো হাসপাতাল সারাদেশের নানা জায়গায় স্থাপিত হয়েছে। জনসাধারণ এ-সব হাসপাতালে বিনা খরচে চিকিৎসার সুযোগ পায়।

গভর্নমেণ্ট

নেপাল একটি স্বাধীন রাজতান্ত্রিক রাজ্য। এর রাজা দেশের সর্বপ্রধান শাসক। কিছুদিন আগ পর্যন্ত নেপালের প্রধান মন্ত্রীই আসলে রাজার সব ক্ষমতা অধিকার ক'রে নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন, রাজা ছিলেন নামে-মাত্র। বর্তমানে প্রধান মন্ত্রী বা রাণাদের ক্ষমতার বিলোপ ঘটেছে কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র পুরাপুরি চালু হয়নি। গত ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজা মহেন্দ্র মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে নিজহাতে শাসনভার নিয়েছেন এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান ঘোষণা করেছেন। দেশের জনসাধারণ রাজা মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে যায়নি কিন্তু সকল রাজনৈতিক দল এই পরিবর্তন খুশি মনে মেনে নিতে পারেনি।

উত্তর সীমানা দিয়ে নেপালের এক নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে। হিমালয়ের নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থানহেতু নেপালের বিদেশী শত্রুর আক্রমণের আশংকা ছিল না, কিন্তু তিব্বত অধিকার করার পর চীনের আচরণ হিমালয়ের এপারের দেশগুলির মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। কিছুদিন আগে উত্তরের সীমানা নিয়ে চীনের সঙ্গে মতবিরোধ এবং উত্তেজনার কারণও ঘটেছিল। যুগ যুগ ধ'রে যে সীমান্ত ছিল শান্ত ও নিরাপদ এবং যা রক্ষার জন্য সৈন্য মোতায়েন করার চিন্তাও মনে আসেনি, এখন সেখানে আধুনিক অস্ত্র নিয়ে সজাগ প্রহরী দিবারাত্রি তৈরী হয়ে রয়েছে, দেশের সীমানায় যে শত্রু পা দেবে তার সঙ্গে হবে বোঝাপড়া।

ভুটান

হিমালয়ের গা ঘেঁষে যে তিনটি রাজ্য ভারতের নিকট-প্রতিবেশী, ভুটান তাদের সকলের পূর্বদিকে অবস্থিত। ভোটান নামটি ভারতেরই দেওয়া। অবশ্য এর আসল নাম ভোটান্ত। তিব্বতকে বলা হ'ত ভোট, ভোটের অন্ত অর্থাৎ তিব্বতের প্রান্তে অবস্থিত ব'লে ভুটানের এই নাম। কালক্রমে 'ভোটান্ত' হয়েছে ভোটান বা ভুটান। এর উত্তরে তিব্বত, পুবে এবং দক্ষিণে ভারত, পশ্চিমে সিকিম। উত্তরে তিব্বতের সঙ্গে ভুটানের সীমানা প্রায় ২ শত মাইল জুড়ে। দক্ষিণ দিকে নিবিড় অরণ্য, উত্তর দিকে প্রায় চার মাইল উঁচু হিমালয় তুষারের দেওয়ালের মতো। এর মাঝখানে নদীর উপত্যকায় অনেকটা নীচু দেশ। তার মধ্যে শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে পৃথিবীর কোলাহল থেকে দূরে অধিবাসীরা জীবন যাপন ক'রে চলেছে। অনেকেই এদের খবর রাখে না। তাতে এদের কোন লোকসান হয়নি। ভুটানের মোট ভূমির পরিমাণ কত এবং লোকের সংখ্যাই বা কত, তা সঠিক বলা কঠিন। তবে অনুমান হয় এর আয়তন ১৯ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৬ লক্ষ ২৩ হাজার।

দেশটি কেমন

ভুটানের ঠিক দক্ষিণ সীমানায় পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা। ডুয়ার্স নামে পরিচিত এই অঞ্চল অরণ্যে আবৃত, ছোট ছোট পাহাড় শাল, শিশু, গামার প্রভৃতি গাছের উপযুক্ত ভূমি। এখানকার জৈন্তি পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে তাকালে ভুটানের অনেকখানি এলাকা দেখতে পাওয়া যায়। যতদূর চোখ যায়, পাহাড় আর পাহাড়। দূরের গুলি নীলাভ দেখায়, কাছের গুলির ওপর গাছপালা সবুজ গালিচার মতো বিছানো মনে হয়। পাহাড়ের চূড়া ঘিরে হাল্কা মেঘ ভেসে বেড়ায়, কখনও নীচের দিকে নেমে অরণ্যের ভিতরে মিলিয়ে যায়,

আবার অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ের দিকে চলে। পাহাড়ের সমাবেশ দেখে মনে হবে হাতির দল এক জায়গায় নীরবে দাঁড়িয়ে আছে, বড়গুলির পাশে পাশে আছে বাচ্চারা। শুধু নিথর পাহাড়-হাতি নয়, সজীব চলমান হাতির দলেরও দেখা পাওয়া যাবে। ভুটানের বন-পাহাড় থেকে দলে দলে বুনোহাতি আসে জলপাইগুড়ির পানবাড়ি, রাইডাক, জলদাপাড়া বনে। সীমানা পার হয়ে আসতে জীব-জানোয়াররা কারো অনুমতি নেবার প্রয়োজন বোধ করে না। যে বনময় পথ দিয়ে এদের যাতায়াত সেখানে মানুষ প্রহরী মোতায়েন করলে তাকে রক্ষার জন্য রয়্যাল বেঙ্গল বাঘকে প্রহরী বানিয়ে মোতায়েন করতে হবে!

নেপাল, সিকিম, ভুটান তিনটিই পাহাড়ী রাজ্য। তবু ভূমির গঠনের দিক দিয়ে ভুটান কিছুটা পৃথক রকমের। দক্ষিণ দিক থেকে এদেশের মধ্যে প্রবেশ করলে নেপাল সিকিমের মতো এখানেও পাওয়া যাবে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত গভীর অরণ্য। এ হ'ল প্রথম ধাপ; নেপাল সিকিমে দ্বিতীয় ধাপ প্রথম ধাপের চেয়ে উঁচু, তৃতীয় ধাপ আরো উঁচু হয়ে হিমালয়ে মিশেছে। ভুটানে দ্বিতীয় ধাপ প্রথম ধাপের চেয়ে নীচু, তৃতীয় ধাপ আবার উঁচু হয়ে চলে গেছে হিমালয়ের বরফ-ঢাকা চূড়া পর্যন্ত। সমগ্র দেশটাকে মনে হবে মাঝে-নীচু দুই ধার-উঁচু পূজার জল-রাখা কোশার মতো। সত্যই, অনেকগুলি নদী হিমালয় থেকে জলধারা নিয়ে ভুটানের মধ্যভাগের নীচু অংশ দিয়ে বয়ে ভারতে এসে প্রবেশ করেছে।

দক্ষিণ দিক থেকে ভুটানে যেতে প্রথমে পাওয়া যাবে মাইল ত্রিশেক চওড়া বন ও পাহাড় অঞ্চল। বঙ্গোপসাগর-থেকে-আসা মেঘ এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত করে। বড় বড় ফোঁটায় দিনরাত্রি ধ'রে যখন বর্ষণ হ'তে থাকে, মনে হয় পবন-দৈত্য সাগর থেকে কলসী কলসী জল এনে ঢেলে

দিচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছুইশো থেকে তিনশো ইঞ্চি। এই অঞ্চল ভুটানের সবচেয়ে গভীর বনভূমি।

বন পার হয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে মধ্যভাগের পাহাড়ময় অঞ্চল। মাইল চল্লিশ চওড়া এই অঞ্চলে হিমালয়ের গা থেকে অনেকগুলি পর্বত-শাখা দক্ষিণ দিকে নেমে এসেছে, যেন বৃদ্ধ হিমালয়ের মাথার জটা এলিয়ে পড়েছে। এই পাহাড়শ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে উপত্যকা সাড়ে তিন হাজার থেকে দশ হাজার ফুট উঁচু, তার মধ্যে ভুটানের বেশির ভাগ লোকের বসতি, এর মধ্যে দিয়েই হিমালয় থেকে জলধারা নিয়ে বয়ে চলেছে ভুটানের বড় বড় নদীগুলি। সবচেয়ে বড় নদী মানস, তার ছুইটি উপনদী কুরু-চু এবং ডাংমি-চু। জলপাইগুড়ি জেলায় যে নদীগুলি প্রবাহিত, তার বেশির ভাগ এসেছে ভুটানের ভিতর দিয়ে। সিকিম ও ভুটানের মধ্যেকার চুম্‌বি উপত্যকার ভিতর বয়ে এসেছে আমো-চু; ভারতে এর নাম তোরসা। জলপাইগুড়ি জেলার রাইডাক নদীর নাম ভুটানে ওয়াং-চু এবং সংকোশের নাম মা-চু।

ভারতের পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, গঙ্গা যখন ধরাতে নামে তাকে মহাদেব নিজের মাথা পেতে জটাজালের মধ্যে ধারণ করেছিলেন; পরে জটা চিরে জলের ধারা বের ক'রে দিয়েছিলেন। হিমালয়ের দিকে চাইলে মনে হবে, রূপক গল্পটি মিথ্যা নয়। হিমালয় সাগর-থেকে-আসা রাশি রাশি মেঘ ধারণ করে। জল জমাট বরফে পরিণত হয়ে থাকে, আর ছোট ছোট চূড়াতে যে বর্ষণ হয় তা পাহাড়ের গা বেয়ে তীরবেগে নেমে আসে। ভুটানের ভিতর এগিয়ে-আসা জটার মতো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে অনেকগুলি নদী; এরা এঁকেবেঁকে পথ ক'রে নিয়ে অবশেষে গিয়ে পড়েছে ব্রহ্মপুত্র নদে।

ভুটানের মধ্যভাগ ছেড়ে আরো উত্তর দিকে গেলে দেখা যাবে,

পাহাড় ক্রমে উঁচু হ'তে হ'তে ২৪ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠেছে। শীতের তীব্রতা অত্যন্ত বেশি, গাছপালার আকার ছোট হ'তে হ'তে অবশেষে ঘাসের আকারে এসে পৌঁছেচে। ১২ হাজার থেকে ১৮ হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে শেওলার মতো এক রকম ঘাস জন্মে। ভুটিয়ারা চমরী গরু নিয়ে চরাতে যায় ঐ ঘাসের রাজ্যে। পাহাড়ের নীচু অংশে মাথা-সরু পাইন-জাতীয় গাছের বন, আর আছে রড়োডেনড্রন গাছের ঝাড়। ঘাসের এলাকা পার হয়ে ওপরে উঠলে চারিদিকে কেবল চোখ-ধাঁধানো শুভ্র তুষার। খালি চোখে হঠাৎ এর দিকে তাকালে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে, এমন দীপ্তি।

বনজঙ্গল ঘুরে দেখি

ভুটানের দক্ষিণ ও পূব দিকের বনপাহাড় অঞ্চল বন্যজীবের রাজ্য। জঙ্গল ঘন, এমন ঘন যে পায়ে হেঁটে মানুষের পক্ষে চলা সম্ভবপর নয়। মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝরনা ঝিরঝির ক'রে বয়ে চলেছে, পাথরের ছোট-বড় টুক্‌রা-বিছানো ভূমি। নদীর তীরে বালুময় ভূমিতে কাশবন। এমন অনেক বন আছে যার ভিতর মানুষ কোনদিনই প্রবেশ করেনি। বড় বড় গাছ পরস্পরের ডালপালা ছড়িয়ে মাথায় মাথায় মিশে একটানা নিবিড় ছায়াময় অন্ধকার রাজ্য সৃষ্টি করেছে। দিনের বেলাতেও সেখানে সূর্যের আলো মাটিতে পৌছে না। ঝোপঝাড়ের ওপর দিয়ে নানা ধরনের লতার বেড়াজাল ছড়ানো। এই অরণ্য মানুষের পক্ষে ভয়ংকর ও দুর্গম কিন্তু বুনো জীবজানোয়ারের স্বর্গভূমি। কেউ যদি এই জঙ্গলে অন্যের অলক্ষ্যে রাত্রি কাটায়, তবে বহু বন্যজীবের চলাফেরা সে দেখতে পাবে। রাত্রিতে নানা জাতের হরিণ, সম্বর অতি সন্তর্পণে লতাপাতা খেতে বেরোয়; অন্ধকারে এদের চোখ নীল জোনাকির মতো জ্বলজ্বল করে। এদের সন্ধানে আসে বাঘ; নিঃশব্দে চলে, সদাই সজাগ দৃষ্টি, চোখ আগুনের গোলার মতো। ঝোপের আড়ালে ব'সে

শিকারের গতিবিধি লক্ষ্য করে, অকস্মাৎ লাফ দিয়ে একটির ওপর পড়ে, চোখের পলকে তার ঘাড় ভেঙে ফেলে। তারপর বিজয়ীর বন-কাঁপানো হুংকার। জলের কাছাকাছি দেখা যাবে একশিং-ওয়ালা গণ্ডার, বনের নির্ভীক সৈন্যের মতো তার চালচলন। বাইসন, চিতা-বাঘের সাক্ষাৎ মিলবে; ভালুককে দেখা যাবে ফল ও মৌচাকের সন্ধানে গাছের ডালে ডালে ফিরতে। হাতির দল যখন খাবারের সন্ধানে ধান বা ভুট্টার ক্ষেতের দিকে চলবে, মনে হবে যেন কতকগুলি ছোটখাটো পাহাড় চলেছে। বনের ভিতর দিয়ে চলার সময় মট্‌মট্‌ ক'রে বড় বড় ডাল ভেঙে খেতে খেতে চলে। ভুটান-পাহাড়ের জঙ্গল বুনোহাতির প্রিয় বাসভূমি।

দেশের মধ্যভাগে উপত্যকা অংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম, বছরে ৪০ থেকে ৬০ ইঞ্চি। জলবায়ু আরামদায়ক; পাহাড়ের দক্ষিণমুখী ঢালু অংশ সূর্যের কোমল উষ্ণকিরণে ঝলমল করে, উর্বর ভূমিতে ফসল হয় সতেজ এবং প্রচুর, পাহাড়ের গায়ে পাইনবন গাঢ় সবুজ ছবির মতো দেখায়। উপত্যকার নিম্ন অংশে ওক, বিচ, অ্যাস্, ম্যাপল প্রভৃতি ইউরোপীয় জলবায়ুর গাছ জন্মে। ভূমির উচ্চতা ও বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে কোন্ অঞ্চলে কি প্রকার গাছ হবে। ভারতের সমভূমিতে এ-ধরনের গাছ হয় না। দেশের সবচেয়ে উত্তর অংশ বরফের রাজ্য। বনজঙ্গল নাই; প্রথমে চোখে পড়বে ক্ষুদে গাছের ঝোপ, বামন পাইনগাছ ও রডোডেনড্রনঝোপ; তার উঁচুতে ঘাস ও শেওলা-বিছানো পাহাড়ের অংশ। এর পর সবুজের কোন ছোপ কোথাও চোখে পড়ে না। পর্বতশিখর যেন সাদা কাপড়ে সারাদেহ আবৃত ক'রে ধ্যানে চির মৌন হয়ে রয়েছে। পাইন ও শেওলাঘাসের অঞ্চলে বাস করে কস্তুরীমৃগ। সুশ্রী লাজুক ধরনের ছোট জীব; বরফের ওপর দিয়ে চলার উপযোগী তার খুরের গড়ন। খুরগুলি লম্বা ও চ্যাপ্‌টা,

পিছনের খুরের সঙ্গে আছে দুটি ক'রে লম্বা অংশ বুটজুতার আঁকড়ের মতো। এর জন্য মসৃণ বরফের ওপর দিয়ে চলতে পা পিছলে পড়ে যায় না। ভুট নিবা সুগন্ধি মৃগনাভি সংগ্রহ ক'রে বিক্রি ক'রে থাকে।

অধিবাসীদের পরিচয়

ভূটানের বাসিন্দারা বেশির ভাগই ভুটিয়া। এরা আদিতে ছিল তিব্বতীদের গোষ্ঠীর লোক, তিব্বতের ভাষাই এখনো ব্যবহার করে। দীর্ঘ, মাংসপেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহ, গায়ের রঙ তামাটে, চোখমুখ খাঁটি মঙ্গোলীয় ধরনের। সিকিম ও তিব্বতের ভুটিয়াদের সঙ্গে এদের পার্থক্য এই যে, ভুটানিরা স্ত্রী-পুরুষ সকলেই চুল ছোট ক'রে ছাঁটে, লম্বা বেণী ক'রে পিঠে ঝুলিয়ে রাখে না। বৌদ্ধ হ'লেও এদের ধর্মে ভূতপ্রেত, দৈত্যদানবের পূজা অর্চনার বিধি আছে; বিকৃত লামাবাদ এখানে প্রধান। এই ধর্ম দুখ্-পা বৌদ্ধ ধর্ম নামে পরিচিত। এই আসল ভুটিয়ারা দেশের মধ্যভাগে বাস করে। পশ্চিম দিকে আমো-চু নদীর পশ্চিম তীরে নেপালীরা বসতি গড়ে তুলেছে। এরা পরিশ্রমী এবং চাষ-আবাদের কাজে পটু। যে-কোন প্রকার জমি পেলেই তারা সেখানে ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করবে। এইভাবে ভুটিয়াদের গরু-চরানোর উপযোগী অনেক ঘাসের জমি তারা চাষের জমিতে পরিণত করেছে। ভুটিয়ারা নেপালী চাষীদের আমো-চু পার হয়ে পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়ে আবাদ করার অনুমতি দেয় না। ভুটানের পূর্ব অঞ্চলে যারা বাস করে, তারা ভুটিয়া হ'লেও আসাম সীমান্তের উপজাতিদের সঙ্গে তাদের অনেক মিল দেখা যায়। আকারে খাটো, গায়ের রঙ কিছুটা ময়লা, দেহের গড়নও খাঁটি ভুটিয়াদের মতন নয়।

ভুটিয়াদের পল্লী দেখতে গেলে দেখতে পাব পাহাড়ের ঢালু গায়ে দুই-চারখানা ঘর পাশাপাশি রয়েছে; কোথাও ঘরের সংখ্যা কিছু বেশি. কোথাও দেখা যাবে ছোট পাহাড়ের মাথায় অথবা পাহাড়ে

ওঠার পথের ধারে একখানিমাত্র ঘর। এইগুলিই গ্রাম বা ভুটিয়া-বস্তি। ঘরের কাছে কয়েকটি বাজরা ও ভুট্টার গাছ, বাড়ির কাছেই একটু নীচুতে বা উঁচুতে পাহাড় কেটে কতকটা সমতল-ক'রে-নেওয়া জমিতে চাষ-আবাদ করা হয়েছে। চাষের জন্য লাঙ্গল বলদ চোখে পড়বে না। চাষীরা নিজের হাতে কোদাল দিয়ে মাটি কোপায়, পাথর দিয়ে ছোট ছোট বাঁধের মতো আল্ তৈরি ক'রে দেয় যাতে জমিতে জল দিলে তা সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে নীচে চলে না যায়। ঢালু পাহাড়ের গায়ে, উঁচুনীচু উপত্যকায় এইরূপ ধাপ-কাটা জমি দূর থেকে নক্সার মতো দেখায়। ঝরনা থেকে নলের সাহায্যে জল এনে জমিতে দেবার সুবিধা আছে, পাহাড়ের গায়ে নালা কেটে ঝরনার জল জমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত করারও ব্যবস্থা হয়। ফসল হয় প্রচুর।

ভুটিয়া-বস্তিতে অতিথি

পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বস্তিগুলি দূর থেকে ছবির মতো দেখায়। সবুজ গাছপালার ভিতর দিয়ে সাদা ও লাল রঙ চোখে পড়ে। কোন এক বাড়িতে গিয়ে অতিথি হ'লে কি দেখতে পাব? ঘরগুলি বেশির ভাগ কাঠের তৈরি, ছাউনিও কাঠের। গেরুয়া মাটি বা লাল পাথুরে রঙ দিয়ে চিত্রিত। গরীবদের বাড়িঘর পাথরের চাঁই পর পর সাজিয়ে কাঠ বা খড় দিয়ে ছাওয়া। কাঠের খাটিয়ায় চমরী গরুর লোম-দিয়ে-তৈরি কম্বল বিছিয়ে দেবে আপনার বসবার জন্য। দেওয়ালে ঝুলানো আছে মাদুর; বারান্দায় যে বাঁশের ও লতার ঝুড়ি দেখতে পাবেন তা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মাদুর ও ঝুড়ি সুন্দর-ক'রে বোনানো। বাড়িতে দীর্ঘ লোমওয়ালা কুকুর দেখে চমকে উঠবেন এবং বাড়ির মালিক বা অন্য কেউ যদি তাকে শান্ত হ'তে না বলে, তবে বাড়ির সীমানায় গেলে বিপদ হ'তে পারে। কুকুরগুলি যেমন তেজী, তেমনি রাগী কিন্তু আদর পেলে তেমনি শান্ত ও অনুরাগী। কারো কারো

বাড়িতে ভুটিয়া-ঘোড়া দেখতে পাওয়া যাবে। দীর্ঘ লেজ ও কেশর; খাটো কিন্তু বলিষ্ঠ গড়ন। যেমন ভুটিয়ারা, তেমনি তাদের ঘোড়া। পাহাড়ী অঞ্চলে কাজের পক্ষে এগুলি খুব উপযোগী।

খাবার জন্য পিতলের থালায় ক'রে এনে দেবে ভাত ও আটার মোটা-মোটা রুটি আগুনে সেঁকে তৈরি করা, আলু ও সবজি সেদ্ধ, মাংস সেদ্ধ করা বা আগুনে ঝলসিয়ে-নেওয়া শিক্‌কাবাবের মতো, চমরী গরুর দুধ ও পিঠার মতো আকারে জমাট মাখন। এ মাখন চমরী গরুর দুধ থেকে তৈরি, জ্বালিয়ে ঘি তৈরি করা যায়। স্বাদ এবং গন্ধ গাওয়া ঘির মতো মনে হবে না কিন্তু জিনিস বিশুদ্ধ এবং বলকারী। খাওয়া শেষ হ'লে তামার বাটিতে বা গেলাসে ক'রে দেবে মাদক পানীয়। নূতন লোককে কড়া জিনিস দেবে না; মরুয়া নামক একপ্রকার বাজরা পচিয়ে যে পানীয় তৈরি হয় তা মৃদু উত্তেজক এবং সামান্য নেশার ভাব আসে তাতে। এটি ভুটিয়াদের সর্বসাধারণের প্রিয় পানীয়। গম সিদ্ধ ক'রে তা পচিয়ে চোলাই ক'রে অত্যন্ত ঝাঁঝালো এক রকম মদ তৈরি করে, একে বলে চ্যাং। উৎসবের সময় বা মজলিসে ভুটিয়ারা একত্র হয়ে চ্যাং পান করে।

ভুটিয়াদের ঘরের একটি জিনিস নজর করবার মতো। কাঠের ছাউনি তক্তাগুলি বেশ অনেকখানি ক'রে বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে, বৃষ্টির জলের ছাট যাতে ঘরে না আসে এই উদ্দেশ্য। ঘরগুলি দেখতে কতকটা সুইজারল্যাণ্ডের কাঠের কুটীরের মতো। ঘরে কোথাও লোহা ব্যবহার করা হয় না। এমন কি দরজার কব্‌জাগুলিও কাঠের তৈরি। কিন্তু কাঠের কব্‌জা দেখে এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, ভুটিয়ারা লোহার কাজ জানে না। লোহার ছোরা এবং তলোয়ার তৈরি করতে ভুটিয়ারা রীতিমত পাকা ওস্তাদ।

ওরা কাজ করে

চাষ-আবাদের চেয়ে পশুচারণের দিকেই ভুটিয়াদের ঝোঁক বেশি। চমরী গরুর পাল নিয়ে পর্বতের উঁচু অংশে ঘাসের এবং তুষারের রাজ্যে বিচরণ করতে পারলে তারা খুশি কিন্তু তবু জমি থেকে তারা কম ফসল উৎপন্ন করে না। উপত্যকায় ধান ফলায় প্রচুর; আর আছে গম, বাজরা এবং সরষে। নেপালী কৃষক এবং ভুটানিরা মিলে যে ধান উৎপাদন করে, তাতে দেশের লোকের প্রয়োজন মিটিয়ে তিব্বতে এবং ভারতে কিছু পরিমাণ রপ্তানিও করে। এদেশের জমি যেমন উর্বর তাতে শুধু চাষ-আবাদ ক'রেই এখন দেশে যত লোক তার তিনগুণ লোকের খাদ্য সরবরাহ করা চলে।

উত্তর অঞ্চলের ভুটিয়াদের প্রিয় প্রাণী হ'ল চমরী গরু আর কুকুর —একটি তার খাদ্যের যোগান দেয়, অপরটি এই সম্পদকে বন্যপ্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করে। চাষ-আবাদও এক প্রকার শিল্প, সভ্যমানুষের আদিমতম শিল্প। মাটিতে বিছন ছিটিয়ে তাকে বহুগুণে ফিরিয়ে আনার মধ্যে চাষী-শিল্পীর সাধনা ও উদ্যম সফলতা লাভ করে। বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দেবার দিন পাকা ফসলের যে ছবি তার মনের চোখে ভেসে ওঠে, তা যেদিন বাস্তব রূপ ধারণ করে সেইদিন শিল্পী অনুভব করে সৃষ্টির আনন্দ। ভুটানের সমাজে কুটীরশিল্প উৎকর্ষের জন্য বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। বাড়িতে তাঁতে যে কাপড় বোনে তা যেমন শক্ত তেমনি মজবুত; বাঁশ ও লতার ঝুড়ি, গালিচা এবং মাদুর রঙে, নক্সায় এবং সৌন্দর্যে চমৎকার। ভুটানি কর্মকারদের তৈরি তামা পিতল রূপার গহনা ও পাত্র তাদের নিপুণ শিল্পকলার পরিচয় দেয়। লোহার কামাররা ইস্পাতের তলোয়ার, ছোরা ও গাদাবন্দুক তৈরি করতে পটু।

ভুটানে আধুনিক ধরনের শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেনি। দেশে যে খনিজ দ্রব্য মেলে তা দিয়ে কুটীরশিল্পের কাজ হয়। বোরশাং লোহার

খনি থেকে লৌহ আকর সংগ্রহ ক'রে আনা হয়। এ থেকে নিজেদের দেশীয় প্রথায় তৈরি করা হয় পিটানো লোহা ও ইস্পাত। ভুটিয়া কর্মীরা নিজেদের পাহাড়ময় দেশের পথঘাট তৈরি করেছে, নদীর ওপর খিলান-দেওয়া সেতু তৈরি করেছে, ছোট ছোট পাহাড়ী নদী ও গভীর গিরিখাটল পার হওয়ার জন্য লোহার ঝুলানো পুল নির্মাণ করেছে। অনেক জায়গায় দেখা যাবে কাঠ ও বাঁশের সরু সাঁকো; পিঠে বোঝা নিয়ে স্ত্রীলোকেরা সন্তানকে পিঠের সঙ্গে কাপড় দিয়ে বেঁধে অবলীলাক্রমে সরু পুল পার হয়ে যায়, তার পাঁচশো ফুট নীচে পাহাড়ী নদী গর্জন ক'রে ছুটে চলেছে; হঠাৎ একবার পা ফস্‌কালে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু পাহাড়ের দেশের মানুষের নিজের পায়ের ওপর বিশ্বাস আছে আর মনে আছে সাহস। যে পথে বাঘ ভালুক বুনোহাতি চলে, ভুটিয়ারাও সেই পথে নির্ভয়ে যাতায়াত করে। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং এবং আসামের দরং জেলায় পাহাড় অঞ্চলে যে মেলা বসে, তাতে ভুটিয়ারা তাদের কুটীরশিল্পের নানা জিনিস, শস্য ও ফল, চমরী গরুর দুধের মাখন, হাতির দাঁত, মৃগনাভি কস্তুরী প্রভৃতি বিক্রির জন্য নিয়ে আসে। জিনিসের বিনিময়ে এখান থেকে জিনিস কিনে নিয়ে তারা নিজেদের দেশে ফিরে যায়।

সমাজ ও শাসন

ভুটানের সমাজে বৌদ্ধ ধর্ম অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। ধর্মের প্রধান হ'ল লামা বা পুরোহিত সম্প্রদায়। এদের ওপর সাধারণ লোকের গভীর শ্রদ্ধা ও ভয়। এখানকার ধর্ম বিকৃত লামাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। ধর্ম আচরণে মন্ত্রতন্ত্র, ভূতপ্রেত প্রভৃতিতে বিশ্বাস লোকের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। সাধারণের ধারণা লামারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, ইচ্ছা করলেই তারা মানুষের দারুণ বিপদ ঘটিয়ে দিতে পারে। লামাদের মঠগুলি নানা জিনিস দিয়ে সাজানো—কারুকর্ম-করা তামা

ও রূপার বাসনকোসন, সুন্দর নক্সাকরা নিশান মঠগুলির শোভা বাড়িয়ে দেয়। মঠের প্রধান পূজাবেদীটি দুইটি বড় বড় হাতির দাঁতের ওপর স্থাপিত।

দেশের শাসনব্যবস্থায় সামন্ত বা জমিদারদের রীতিমত প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। দেশের প্রধান শাসক হ'লেন মহারাজা, তাঁর অধীনে আছেন ৮ জন পেন্‌লপ অর্থাৎ সামন্ত বা জমিদার। এই সামন্তগণ তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় বড় বড় দুর্গে বাস করেন। এই দুর্গগুলিকে বলা হয় জং। পাহাড়ের ওপর পাথরে তৈরি এই দুর্গগুলি যেমন বিরাট তেমনি মজবুত। কোন কোন দুর্গে দুই হাজারেরও বেশি লোক বাস করতে পারে, এমন বিশাল। দুর্গের প্রাচীর তিব্বতের দালানকোঠার কায়দায় ভিতরের দিকে ঈষৎ হেলান; এতে আছে শক্ত ছাদ আর চৌকোণা পর্যবেক্ষণ-স্তম্ভ। পেন্‌লপদের নিজস্ব সশস্ত্র পরিচারক-বাহিনী আছে। এরা মাথায় শিরস্ত্রাণ প'রে তরবারি ও চামড়া-দিয়ে-তৈরি ঢাল হাতে নিয়ে পেন্‌লপদের দেহরক্ষীরূপে সঙ্গে সঙ্গে থাকে। পেন্‌লপগণ কতকটা প্রাদেশিক শাসনকর্তার ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করেন।

ধর্মরাজ ও দেবরাজ

পূর্বে ভুটানে দেশ-শাসন ও ধর্ম দুইজন পৃথক প্রধানের হাতে ছিল। ধর্মের ব্যাপারে প্রধান নায়ক ছিলেন ধর্মরাজ এবং প্রধান শাসকের উপাধি ছিল দেবরাজ। ধর্মরাজকে মনে করা হ'ত বুদ্ধের অবতার। জনসাধারণের এই বিশ্বাস ছিল যে, একজন ধর্মরাজের মৃত্যু হ'লে তিনি আবার শাসকদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই এই সব পরিবারে এই নূতন শিশুর সন্ধান করা হ'ত; যে পূর্ব ধর্মরাজের জপমালা, বই ও অন্যান্য ব্যবহৃত দ্রব্য চিনতে পারত, তাকেই ধর্ম-রাজের অবতার ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া হ'ত। বৌদ্ধমঠে এই

শিশুর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হ'ত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে তাকে দেশের ধর্মরাজপদে অভিষিক্ত করা হ'ত। ১৮৮৫ সনে এই রীতি বাতিল ক'রে ধর্মরাজের আধ্যাত্মিক ব্যাপারের কর্তৃত্ব দেবরাজের হাতে ন্যস্ত করা হয়। টংসার পেন্‌লপ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৯০৭ সনে জনসাধারণ, লামাগণ এবং পরিষদ তাকে বংশানুক্রমিক মহারাজা রূপে নির্বাচিত করেন। এই রাজবংশই বর্তমানে ভুটান শাসন করছেন।

দেশের ইতিহাস

প্রাচীনকালে ভুটানে যারা বাস করত, তাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। ভুটানের পুঁথিপত্র থেকে এইটুকুমাত্র জানা যায় যে, নবম শতাব্দীর শেষদিকে তিব্বতী সৈন্য ভুটান আক্রমণ ক'রে ভারতীয় রাজা ও তাঁর প্রজাদের দেশ থেকে বিতাড়িত ক'রে এখানে বসবাস করতে থাকে। যখন পালরাজারা বাংলাদেশে রাজত্ব করছিলেন এ তখনকার ঘটনা। এরপর এই পাহাড় আর বন-দিয়ে-ঘেরা দেশটির অধিবাসীদের সম্বন্ধে বহুদিন কিছু জানা যায়নি। কিন্তু ভুটানীরা ধীরে ধীরে তাদের রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে দার্জ্জিলিং জেলার কিছু অংশ এবং জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স্‌ অঞ্চল অধিকার করে নেয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের প্রথম দিকে ইংরেজদের সঙ্গে ভুটানের সংঘর্ষ বাধে।

ভুটানের সৈন্যবাহিনী কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ ক'রে রাজাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যায়। তিনি ইংরেজদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন; ভুটানীদের পরাজিত ক'রে তাদের রাজ্যের সীমানার মধ্যে হটিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ইংরেজরা বাণিজ্য চুক্তি স্থির করার জন্য একজন দূত ভুটানে

পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু ভুটানীগণ তাদের দেশে কোন বিদেশীকে প্রবেশ করতে দিতে রাজি হয় না। ১৮২৬ সনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আসাম অধিকার করে। তারপর থেকে ভুটান ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে দীর্ঘকাল ধ'রে বিবাদ চলতে থাকে। ভুটান আসামের দরং জেলার কিছু অংশ দখল ক'রে নেয় এবং এর প্রতিদানে সামান্য বার্ষিক কর দিতে সম্মত হয়। কিন্তু ভুটান কর তো দিতই না, বরং ভুটানীরা প্রায়ই বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলে হানা দিয়ে এখানকার অধিবাসীদের ক্রীতদাসরূপে ধ'রে নিয়ে যেত। এই আচরণের প্রতিবাদ জানানোর জন্য একজন দূত প্রেরণ করা হ'ল, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। অবশেষে ১৮৪১ সনে বৃটিশ সৈন্য ভুটানের কাছ থেকে আসাম, ডুয়ার্স্ কেড়ে নেয় এবং ভুটান যদি শান্তিরক্ষা ক'রে চলে তবে বার্ষিক এক হাজার টাকা কর দিতে রাজি হয়। কিন্তু সীমান্তের গোলযোগ এতেও মিটল না; ভুটানীরা প্রায়ই বৃটিশ এলাকায় প্রবেশ ক'রে গ্রাম লুটপাট করত এবং লোকজনকে বন্দী ক'রে নিয়ে যেত।

১৮৬৩ সনে স্যর এ্যাস্‌লে ইডেনকে বৃটিশ রাজদূত হিসাবে ভুটানে পাঠানো হয়। ভুটানীরা তাঁকে হাতের মধ্যে পেয়ে তাঁর ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার ক'রে এবং বৃটিশরা ভুটানের কাছ থেকে কেড়ে-নেওয়া অঞ্চল ফিরিয়ে দিতে রাজি হ'ল—এই মর্মে এক সন্ধিপত্রে তাঁকে স্বাক্ষর দিতে জোর ক'রে বাধ্য করে। ইডেন কোন রকমে ভুটান থেকে পালিয়ে আসেন এবং ভারতের গভর্ণর জেনারেল জোর-করে-চাপানো এই সন্ধির সর্ত মানতে অস্বীকার করেন। আসামের অংশের বিনিময়ে যে কর দেবার সর্ত ছিল তা বাতিল ক'রে দেওয়া হয় এবং ইংরেজ বন্দীদের মুক্তির জন্য দাবি জানানো হয়। ভুটান এ দাবি গ্রাহ্য না করায় ১৮৬৫ সনে ইংরেজ সৈন্য

ভুটান আক্রমণ করে। প্রথম দিকে ইংরেজ সৈন্য ভুটানীদের হাতে পরাজিত হয়; ইংরেজরা দেওয়ানগিরি দুর্গ থেকে বিতাড়িত হয় এবং তাদের দুইটি পাহাড়ী কামান ভুটানীরা দখল ক'রে নেয়। এরপর বড় একদল ইংরেজ সৈন্য ভুটানে অভিযান চালায়, ভুটানীরা পরাস্ত হয়ে আসাম ও বাংলার ডুয়ার্স্ অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সর্ত হয়, ভুটান বৃটিশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখলে তাকে বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হবে।

ভারতে বৃটিশ রাজত্বের শেষদিকে ভুটানের সঙ্গে আরো কতকগুলি সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। যেহেতু ভুটানের রাজা আদিতে ছিলেন তিব্বতের লোক, সেইজন্য চীনের সম্রাট ভুটানকে সামন্তরাজ্য ব'লে মনে করত। বৃটিশ সরকার সোজাসুজি এই ভিত্তিহীন দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯১০ সনে ভুটানের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের একটি চুক্তি হয় তাতে এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয় যে, বৃটিশ সরকার ভুটানের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না এবং ভুটানের বৈদেশিক নীতি ও সম্পর্ক বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত হবে। এই সময় ভুটানকে দেয় ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি ক'রে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা করা হয়। এই বৎসরই চীন ভুটানকে সামন্ত-রাজ্য ব'লে দাবি করলে পিকিং-এ অবস্থিত বৃটিশদূত চীন সরকারকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, ভুটান স্বাধীন রাজ্য এবং তার বিদেশ-নীতি পরিচালনার ভার বৃটিশ সরকারের হাতে; চীন কোনও রকমে ভুটানে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করলে বৃটিশ সরকার তা বরদাস্ত করবেন না। এরপর চীনারা আর কোন উচ্চবাচ্য করে নি।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক

ভারত সরকারের সঙ্গে ভুটান বরাবর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে এসেছে। ১৯৪২ সনে ভুটানের বার্ষিক ভাতা বাড়িয়ে ২ লক্ষ

টাকা নির্ধারিত হয়। এরপর ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে গেলে ভারতের সঙ্গে ভুটানের সম্পর্ক দিন দিন ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। ১৯৪৯ সনে ভারত ভুটানের বার্ষিক ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি ক'রে ৫ লক্ষ টাকা করে এবং ১৯৫১ সনে দেওয়ানিগিরি নামক অঞ্চলের প্রায় ৩২ বর্গমাইল স্থান ভুটানকে দিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সনে যখন ভারতের রাজ্যগুলির সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়, তখনও দেওয়ানগিরি ফিরিয়ে নেওয়া কিংবা এর বিলি-বণ্টনের কোন কথা ওঠেনি। ভারত সর্বদাই তার প্রতিবেশীর প্রতি সহৃদয় বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে এসেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে ভারত যখন কৃষি ও শিল্পের উন্নতির ভিতর দিয়ে দেশের সমৃদ্ধি গ'ড়ে তুলছে, তখন সেইসঙ্গে ভুটানের উন্নতির জন্যও তার সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত হয়েছে। ভুটান জানে ভারত তার শান্তিপ্রিয় কল্যাণকামী প্রতিবেশী।

সিকিম

পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলির যে-কোন স্থান থেকে মেঘমুক্ত দিনে উত্তরাকাশে যে শুভ্র পর্বতশৃঙ্গটি চোখে পড়ে তা কাঞ্চনজঙ্ঘা। প্রভাতে সূর্যের সোনালী আলো এর উপর সোনার রঙের হালকা তুলি যেন বুলিয়ে দেয়, আবার সূর্যাস্তের আগে দিনমণি যেন এর ওপর আবির ছিটিয়ে চলে যায়। এই নয়ন-মোহন গিরিশৃঙ্গটি সিকিমে অবস্থিত; উচ্চতা ২৮,১৪৬ ফুট। সিকিম রাজ্যটি পশ্চিম বাংলার ঠিক উত্তরে হিমালয়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিম বাংলার প্রায় সমগ্র অঞ্চল সমতল। জলপাইগুড়ি জেলার সর্বোত্তর অংশ এবং দার্জিলিং জেলার সর্ব

দক্ষিণ অংশ থেকেই ভূমির উচ্চতা বাড়তে শুরু করেছে। এইভাবে পাহাড়ের পর পাহাড় থরে থরে সজ্জিত হয়ে ক্রমে হিমালয়ের উচ্চ অংশের দিকে এগিয়ে গেছে।

সিকিম দেশটি পুরাপুরি পাহাড়ময়। হিমালয়ের গা' থেকে দক্ষিণ দিকে জটার মত যে শৈলমালা নেমে ক্রমশঃ নীচু হয়ে এসেছে, তেমনি অঞ্চল নিয়ে সিকিম দেশ গঠিত। এই পাহাড়ময় অঞ্চল একটানা নিরেট প্রস্তরখণ্ডের মত নয়, মাঝে মাঝে রয়েছে উপত্যকা ও মালভূমি। পশ্চিমদিকে সিঙ্গালিলা পাহাড় সিকিম এবং নেপালের মধ্যে অবস্থিত। এর মধ্য দিয়ে যে গিরিপথটি মানুষের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হয়, তার নাম চিয়াভঞ্জন-লা; উচ্চতা ১০,৩২০ ফুট। পূর্বদিকে তিব্বতের সীমানায় চোলা গিরিশ্রেণী সীমানা নির্দেশক পর্বত। এর ভিতর দিয়ে তিব্বতে যাবার বিখ্যাত তুটি গিরিপথ নাথু-লা (১৫,৫১২ ফুট) ও জেলেপ-লা (১৩,২৫৪ ফুট)। স্মরণাতীত কাল থেকে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম ও ভাবধারার আদান-প্রদান সবই চলেছে এই শান্ত ও তুর্গম পথ ধ'রে। সিকিমের পূর্ব-সীমানা দক্ষিণাংশ ভুটানের সঙ্গে সংলগ্ন। এই তুই রাজ্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সমতল চুম্বি উপত্যকা নানা কারণে বিখ্যাত হয়ে আছে। সিকিমের দক্ষিণে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে দার্জ্জিলিং জেলা। ভারতের সঙ্গে সিকিমের সম্পর্ক ভৌগোলিক দিক থেকে যেমন অচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেও তেমনি। সিকিম ভারতের আশ্রিত মিত্ররাজ্য।

দেশটি কেমন

আমরা, সমতলের লোকেরা, আমাদের চারিপাশের অঞ্চল যেমন দেখতে পাই, পাহাড়ের উপরকার লোকেদের দৃষ্টিতে ঠিক তেমনটি পড়ে না। সমভূমিতে আমাদের চোখ দিগন্তপ্রসারী; সবুজ মাঠ,

নীলাভ গ্রাম দূরের নীল আকাশের পটে ছবির মত দেখা দেয়, কিন্তু পাহাড়ময় অঞ্চলের লোকেদের দৃষ্টি দিগন্তে প্রসারিত হওয়ার আগে উঁচু-নীচু পাহাড়, অরণ্য, উপত্যকায় বাধা পায়। আমরা আকাশকে দেখি দিকচক্রবালের সমভূমিতে, তারা আকাশকে দেখে অনেক সময় মাথার উপরে। সিকিম এমনি উঁচু-নীচু বন-পাহাড়ের দেশ। দেশটি দক্ষিণ থেকে ক্রমে উত্তরে উঁচু হয়ে গেছে। দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে, কখনও বা পাহাড়ের গা বেয়ে পথ এঁকে-বেঁকে চলে গেছে দেশের মধ্যে। পথের দুধারে চোখে পড়বে ফার্ণ ও নানা পাহাড়ী গাছের সমাবেশ, গভীর অরণ্য, পাইনজাতীয় গাছের সুশ্রী সারি আর রডডেনড্রন গাছের মাথায় লালফুলের আগুনের মত দীপ্তি। উপত্যকা ও পাহাড়ের ঢালু অংশে কোমল সবুজ ঘাসের গালিচা পথিককে তার মধ্যে পা ডুবিয়ে বসতে যেন নীরব আহ্বান জানায়।

উত্তর সীমানা দিয়ে ১৭ হাজার ফুট উঁচুতে চিরতুষারের রাজ্য, পর্বতশীর্ষে শুভ্র তুষার স্থির মালার মত সজ্জিত রয়েছে। এই তুষাররেখার নীচে ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার ফুট উচ্চ অঞ্চলে কতকগুলি মালভূমি আছে, তার মধ্যে আছে ছোট ছোট হ্রদ। এমনি হ্রদ রয়েছে চাঙ্গুর মালভূমিতে। গ্রীষ্মে বাতাসে যখন উষ্ণতার ছোঁয়া লাগে, বসন্তের গুঞ্জরণ জাগে অরণ্যের বুকে, উপত্যকায় ও শৈলসানুদেশে ঘাসগুলি সতেজ হয়ে ওঠে। সিকিমের চাষী ও পশুপালকেরা তাদের পালিত চমরীগরু (ইয়াক) ও ছাগল-ভেড়া চরাতে নিয়ে যায় এইসব তৃণের স্বর্গরাজ্যে।

৯ হাজার থেকে ১২ হাজার ফুট উচ্চতায় পাহাড়ের ঢালে রয়েছে নিবিড় বন। ইউরোপের উত্তর অঞ্চলের পাহাড়ময় দেশে যে-ধরনের বন দেখা যায়, এখানকার বনও কতকটা সেই রকম।

চির তুষার রাজ্যের পর্বতশীর্ষে চমরীগরু

মূল্যবান কাঠ থেকে কাগজ, রেয়ন প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করার উপযোগী উপাদান এখানে বিদ্যমান।

বন-বাগান ঘুরে দেখি

সিকিমের বন বেশির ভাগই প্রকৃতিজাত। জলবায়ু ও ভূমির গুণে স্বাভাবিকভাবে যে বনজঙ্গল শত শত বৎসর আগে সৃষ্টি হয়েছিল, যুগ যুগ ধ'রে তাই আজও স্বমহিমায় বিরাজ করছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনে কোথাও এর সংকোচ সাধন করেছে, কোথাও বিস্তারের সুযোগ ক'রে দিয়েছে। বর্তমান যুগে সর্বব্যাপী বিজ্ঞান যখন মানুষের জীবনকে সম্পদে সমৃদ্ধ ক'রে তোলার আশ্বাস নিয়ে এসেছে, তখন মানুষ তার উপকরণ খুঁজতে নজর দিয়েছে প্রকৃতির রাজ্যের উপর। আজ তাই একদিকে অরণ্যজীবন কমে আসছে, আবার তেমনি অরণ্য অঞ্চল বাড়ানোরও চেষ্টা চলছে।

সিকিমের জলবায়ু ফলের চাষের পক্ষে অনুকূল, বিশেষ ক'রে আপেল ও কমলালেবু। দেশের সরকারের উদ্যমে এই ফলের চাষ রীতিমত ফলপ্রদ হয়ে উঠেছে। যত্নে তৈরি-করা বাগানে সুশ্রী সতেজ গাঢ় সবুজ পাতার গাছ, তাতে হলদে এবং চুনীর মত লাল টুকটুকে আপেল ও কমলালেবু দর্শককে আনন্দে উৎফুল্ল করে। সিকিমের আরেকটি প্রধান ফসল হ'ল এলাচি। দেশের বাইরে এর চাহিদা প্রচুর।

সিকিমের অরণ্যে নানা বন্যজীবের সন্ধান মিলবে। এর মধ্যে আছে ভালুক, বুনো হাতি, হরিণ, তুষার-চিতা, ছোটজাতের বিড়াল, বুনো ছাগল এবং কস্তুরী-মৃগ। শীতল অঞ্চল ব'লে এখানে পাখির সমাবেশ খুব বেশি নয়। ফলের বাগানে গাছে গাছে ফলের সন্ধানে রত দেখা যাবে বানর ও ভালুকের দল। সিকিমে যত

বেশি বৈচিত্র্যময় প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়, এমন আর কোন পার্বত্য রাজ্যেই নেই।

চাষ-আবাদের কাজ

দেশের উঁচু অংশে ফসল ফলানো সম্ভব নয়, সেখানে রয়েছে স্বাভাবিক অরণ্য। সাড়ে চারহাজার থেকে সাড়ে ছ'হাজার ফুট পর্যন্ত উচ্চ অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালুতে চাষের কাজ করা সম্ভব হয়েছে—ফসল হ'ল ভুট্টা, জোয়ার এবং কয়েক প্রকার ডাল। পাহাড়ের গায়ে গরু-মহিষ দিয়ে লাঙল টানানো সম্ভবপর নয়, তাই চাষীর কৃষিযন্ত্র হ'ল তার সবল বাহু আর কোদাল। জলসেচের ব্যবস্থা অনেকক্ষেত্রে খুবই সহজ। পাহাড়ের গা' থেকে যে ঝরণা নেমে আসে, বাঁশের ডোঙার সাহায্যে তা চাষের জমিতে নিয়ে জলসেচের কাজ চালান হয়। এর চেয়ে নীচু অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে জমি সমতল ক'রে নিয়ে চাষীরা ধানের চাষ করে; ঝরণা থেকে জলসেচ করার ফলে ধানের ফলন বেশ ভালই হয়।

জলবায়ু, নদনদী

সিকিম রাজ্যটি ছোট হ'লেও এর মধ্যে জলবায়ুর বৈচিত্র্য অনেকখানি, তার কারণ ভূমি দক্ষিণদিক থেকে ক্রমে উত্তরদিকে উঁচু হয়ে গেছে। বঙ্গোপসাগর থেকে যে রাশি রাশি মেঘ হাওয়ায় ভেসে হিমালয়ের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছে তার প্রবল ধারাবর্ষণ হয় এখানে। উত্তরের উচ্চ অংশে শীতের মাত্রা বেশি, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম। দেশের দক্ষিণ অংশে রাজধানী গ্যাংটকে বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ ১৩৭ ইঞ্চি। দক্ষিণদিক থেকে উত্তরের উচ্চ অংশের দিকে এগিয়ে গেলে প্রথমে আর্দ্র, পরে নাতিশীতোষ্ণ, তারপরে শীতল এবং অতিশীতল জলবায়ুর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। দেশের দক্ষিণ অংশে তরাই-এর স্যাঁতসেঁতে

ম্যালেরিয়াপূর্ণ অঞ্চলে জোঁকের উপদ্রব আপনাকে অতিষ্ঠ করবে; ক্রমে উত্তরদিকে এগিয়ে যেতে আরামদায়ক জলবায়ু, সুন্দর ফলের বাগান এবং সর্বশেষে পাবেন চিরতুষারের রাজ্য যেখানে কলস্বনা নদীগুলি নীরবে ঘুমিয়ে রয়েছে। সিকিমের প্রধান নদী হ'ল তিস্তা। দেশের উত্তর ভাগে লা-চেন্ এবং লা-চুং এই দুটি নদী মিলিত হয়ে তিস্তা নামে প্রবাহিত হয়েছে। প্রথমে চওড়া উপত্যকার ভিতর দিয়ে এসে গভীর গিরিখাত দিয়ে দক্ষিণদিকে নেমে এসেছে এবং দার্জ্জিলিং জেলার ভিতর দিয়ে বয়ে জলপাইগুড়ির নিকটে সমভূমিতে এসে পড়েছে।

হিমালয় ভারতের নদীর ভাণ্ডার। ভারত মহাসাগর থেকে কোটি কোটি মণ জল বাষ্পের আকারে হাওয়া-রথে ভেসে চলে আসে। তাই আবার জলকণায় পরিণত হয়ে ঝরণাধারায় পাষাণের গা বেয়ে নেমে আসে নীচের দিকে। অসংখ্য ঝরণা ঝিরিঝিরি, ঝুরুঝুরু শব্দে পর্বত অঞ্চলের নীরবতার মধ্যে সুমিষ্ট কলতান সৃষ্টি ক'রে সারা বছর ধ'রে স্বচ্ছ জলের অঞ্জলি নিয়ে প্রবাহিত। শত শত ঝরণার জল একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করে নদীর। পার্বত্য রাজ্য সিকিমেও এরূপ ঝরণা সুপেয় জলের প্রবাহ নিয়ে বয়ে চলেছে। ঝরণা ও নদীর জল শুধু যে চাষের কাজে লাগানোই যায় তা নয়, এ থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করারও সুবিধা রয়েছে।

অধিবাসীদের পরিচয়

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এই পার্বত্য রাজ্যটি আয়তনে ২ হাজার ৭৪৫ বর্গমাইল। পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলার মত, লোকসংখ্যা ১৯৫১ সনের হিসাব অনুযায়ী মাত্র ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭২৫, অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ৫ জন লোকের বসতি। অধিবাসীদের মধ্যে তিন জাতির লোকই প্রধান—নেপালী, ভুটিয়া

এবং লেপ্‌চা। নেপালীর সংখ্যাই বেশি, তারপর ভুটিয়া এবং লেপ্‌চা। লেপ্‌চারা নিজেদের বলে 'রংপা' অর্থাৎ উপত্যকার বাসিন্দা। লেপ্‌চারাই সম্ভবত সিকিমের আদি বাসিন্দা। এরা শান্ত সরল প্রকৃতির লোক; পশুপালন করে এবং পাহাড়ের ঢালু জমিতে ফসল ফলিয়ে এরা জীবিকা অর্জন করে। নেপালীরা এদের চেয়ে অধিকতর কর্মঠ এবং পরিশ্রমী; চাষ-আবাদের কাজে এরা লেপ্‌চাদের হটিয়ে দিয়ে শস্য উৎপাদন ব্যাপারে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। ভুটিয়ারা প্রধানত পশুপালক। গৃহপালিত পশুর দল নিয়ে তারা পাহাড়ের উচ্চ অংশে এবং তৃণাচ্ছাদিত মালভূমি অঞ্চলে বাস করে। পশম এবং পশম-দিয়ে-তৈরি বস্ত্র, পশু এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য এদের জীবিকার অবলম্বন।

ধর্ম ও সমাজ

সিকিমের মহারাজা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। প্রজাদের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এই ধর্মের লোক। ভুটিয়া ও লেপ্‌চাদের প্রায় সকলেই বৌদ্ধ; নেপালীরা হিন্দু। বৌদ্ধরা মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী; তিব্বতের লামাতন্ত্রের প্রভাব এদের ওপর অনেকখানি। সারা দেশে কতকগুলি বৌদ্ধমঠ আছে। পাহাড়ের চূড়ার ওপর ও পাহাড়ের গায়ে শান্ত সুন্দর পরিবেশে এই মঠগুলি ভক্ত মানুষের মনের শুভ্র পবিত্র কামনার মত স্থির হয়ে রয়েছে। নীচে এবং চারিপাশে গাছপালার রঙ মরকতের মত স্নিগ্ধ সবুজ, মাথার ওপর নীলকান্ত মণির মত উজ্জ্বল আকাশ, দূরে হিমালয়ের তুষার-ঢাকা শৃঙ্গগুলি হীরার মালার মত ঝলমল করে। এই মনোরম পরিবেশে সাদা ও লাল রঙের মঠগুলি দূর থেকে এক-একটি নয়ন সুখকর পদ্মের মত দেখায়। বাসনাক্ষুব্ধ চঞ্চল মন প্রকৃতির এই উদার মন্দির-অঙ্গনে আপনা থেকেই শান্ত হয়ে আসে।

সমাজ বলতে জনবহুল অঞ্চলের লোকেরা যেমন বোঝে, তেমন এখানে নেই। মানুষের সংখ্যা কম, উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথের দরুন পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ কম। দুই তিনটি পরিবার নিয়েই হয়ত একটি গ্রাম ; পাহাড়ের গায়ে যেখানে ঝরণার জল পাওয়ার সুবিধা, মাটি কুপিয়ে ভুট্টা, আলু, বাজরা লাগানোর সুবিধা, যেখানে পাহাড়ের গায়ে ঝড়ঝাপটার দাপট থেকে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যায় এমন জায়গাতেই মানুষের বসতি গড়ে ওঠে। হাট-বাজারের কাছে বাড়ি-ঘরের সংখ্যা কিছু বেশি দেখা যায়। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম হয়ত দেখা যাবে ঐ উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে কিংবা নীচুতে পাহাড়ের ঢালে পথের ধারে বা উপত্যকার সমভূমিতে, কিন্তু যেতে বহু সময় লেগে যাবে, কারণ পথ সোজা নয় ; চড়াই উৎরাই ক'রে তবে সেখানে পৌঁছাতে হবে। পাহাড় অঞ্চলের লোকেদের গতিতে ক্ষিপ্রতা নেই, দ্রুত হাঁটলেই হাঁপাতে থাকে। দেখা যাবে লোকেরা ভারী বোঝা পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে নীরবে মন্থর পদক্ষেপে পথ অতিক্রম করে চলেছে। পাহাড়ের স্থৈর্য ও গাম্ভীর্য এদের স্বভাবের ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে।

শিল্প-বাণিজ্য

বর্তমানকালের উপযোগী শিল্প ও বাণিজ্য গড়ে তুলতে যেমন উপকরণ ও সুযোগ দরকার, পাহাড়ময় দেশে তার কোনটিই খুব বেশি নেই। শিল্পের জন্য চাই খনিজ সম্পদ—কয়লা, লোহা, পেট্রোলিয়ম ; চাই বনজ সম্পদ—কাগজ, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি তৈরির উপযোগী বৃক্ষের অরণ্য ; চাই কৃষিসম্পদ—বিবিধ খাদ্যশস্য ও শিল্পে ব্যবহারযোগ্য ফসল। সিকিমের অরণ্য ভূমিতে যে কাঠ পাওয়া যায় তা বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহার

করা চলে, কিন্তু যন্ত্রদানবকে সজীব রাখতে যে শক্তির প্রয়োজন তার জন্য চাই কয়লা, পেট্রোল অথবা জল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তি। এ সমস্যার সমাধান হ'লে শিল্পায়নের প্রথম ধাপ অতিক্রম করা সম্ভব।

সিকিমে ফল থেকে প্রস্তুত সিরাপ ও সুরা উৎকর্ষে ইউরোপের উৎকৃষ্ট জিনিসের সমতুল্য; বাইরে এর চাহিদাও যথেষ্ট। কাঠ, পশম, ফল ও ফলজাত দ্রব্য, মাখন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, মধু, মৃগনাভি সিকিমি মেয়েদের তাঁতে-বোনা বস্ত্র, পশুচর্ম প্রভৃতি ব্যবসায়ের সামগ্রী।

দেশের ইতিহাস

লেপ্‌চারাই সিকিমের আদি বাসিন্দা, কিন্তু বর্তমান রাজপরিবার তিব্বতী। ১৬৪১ সনে পূর্ব-তিব্বতের এক গিয়ালপো অর্থাৎ রাজন্য-পরিবারের এক নায়ক লেপ্‌চা সর্দারের হাত থেকে সিকিমের শাসনভার অধিকার ক'রে নেয় এবং রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন করে। এরপর থেকে কিছুকাল সিকিমের শাসন ও রাজনীতিতে এলোমেলো অবস্থা চলতে থাকে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য নেপালের সঙ্গে সিকিমের নূতন শাসকদের বিবাদ চলতে থাকে। নেপালের রাজ্য এক সময় সিকিমের দক্ষিণ অংশের তরাই অঞ্চল অধিকার ক'রে নিয়েছিল। ১৮১৬ সনে ইংরাজদের সঙ্গে নেপালের যুদ্ধের পর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী এই অঞ্চল সিকিমকে ফেরৎ দেওয়া হয়। ১৮৩৯ সনে স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে তোলার জন্য দার্জিলিং বৃটিশ সরকারের হাতে সমর্পণ করা হয়।

ভারত সরকার সিকিমের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সর্বদাই উৎসুক ছিল। বিদেশী কোন শক্তি যাতে সিকিমের শাসন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ক'রে এর কোন ক্ষতি করতে না পারে এবং

ভারত-সীমান্তে কোন অশান্তির কারণ না ঘটে সেইদিকে ছিল এর লক্ষ্য। ১৮৯০ সনে চীন গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের এক চুক্তি সম্পাদিত হয়; এ চুক্তিদ্বারা সিকিমের সীমানা নির্ধারণ ও সিকিমকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আশ্রিত রাজ্য ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। সিকিমের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ও তার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কেও একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৮৯৩ সনে। সিকিমের রাজনৈতিক উপদেষ্টারূপে একজন বৃটিশ পলিটিক্যাল অফিসার নিযুক্ত করা হয়। মুখ্য বে-সামরিক কর্মচারী ও লামাদের নিয়ে গঠিত দরবার অর্থাৎ পরিষদের সহায়তায় পলিটিক্যাল অফিসারের পরামর্শ নিয়ে মহারাজা দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। বৃটিশদের সঙ্গে মহারাজার সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। শাসন ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা না ক'রে তিনি একবার নেপালের ভিতর দিয়ে তিব্বতে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। নেপাল সরকার তাঁকে বন্দী ক'রে ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করে। এরপর তিনি কার্সিয়াঙের নিকটে রাজবন্দীরূপে তাঁর জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। ১৯১৪ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাসি নাম্‌গিয়েল মহারাজা পদে অভিষিক্ত হন।

স্বাধীন ভারত ও সিকিম

১৯৪৭ সনে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। সে সময় সিকিমের ওপর বৃটিশের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে এবং একটি স্থিতাবস্থা চুক্তি দ্বারা নূতন ভারত সরকার সিকিমের বৈদেশিক ব্যাপার, যোগাযোগ ও দেশরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সনে দেশের মধ্যে অশান্তি দমনের জন্য মহারাজা তাসি নাম্‌গিয়েল ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সময় মহারাজার অনুরোধক্রমে একজন

ভারতীয় কর্মচারীকে সিকিমের দেওয়ান অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীরূপে মনোনীত করা হয়। ১৯৫০ সনের ৫ই ডিসেম্বর ভারতের সঙ্গে সিকিমের যে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে ভারতের ওপর সিকিম রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। ১৯৫৩ সনে একটি শাসন-পরিষদ গঠিত হয়—এতে আছেন ৫ জন নির্বাচিত এবং ৪ জন মনোনীত সদস্য। দুইজন নির্বাচিত সদস্য প্রশাসনিক ব্যাপারে মহারাজাকে সাহায্য ক'রে থাকেন।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়; পাহাড়ের কোলে ঘুমায় নিশ্চল অরণ্য আর সচল হাল্‌কা কুয়াশা-ঢাকা রাজ্যটি। লোকসংখ্যা কম, সমস্যাও কম। বর্তমান জগতের আলোঝলমল কলকারখানা কণ্টকিত শহরের পরিবেশ থেকে দূরে শান্ত পরিবেশে অফুরন্ত কামনা-বাসনার আলোড়ন থেকে মুক্ত মন নিয়ে অধিবাসীরা এত-কাল জীবন যাপন ক'রে এসেছে, কিন্তু রাজনীতির উত্তপ্ত হাওয়ায় হিমালয়ের বরফ যখন গলতে শুরু করেছে, তখন সে উত্তাপ থেকে সিকিম রেহাই পাবে কি ক'রে? কৌশলে তিব্বত অধিকারে আনার পর কমিউনিস্ট চীন দক্ষিণদিকে রাজ্যবিস্তারের বাসনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প্রতিবন্ধক হিমালয়। হিমালয়ের এ পারের রাজ্যগুলির ওপর তার লোভ; নানা ফন্দিফিকিরে এখানে সে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় রত রয়েছে। নূতন ধুয়াঃ হিমালয় ফেডারেশন গঠন; উদ্দেশ্য, সিকিম-ভুটান এবং সুযোগ হ'লে নেপালকে নিয়ে হিমালয়ের পার্বত্যরাজ্যগুলিকে একত্রিত করার নামে এসব দেশে গণ-আন্দোলন ও অশান্তি সৃষ্টি করা। সুবিধাবাদী কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে আড়াল থেকে পরিচালনা ক'রে চীন এই শান্ত অঞ্চলকে অশান্ত ক'রে তোলার প্রয়াসী। হিটলার যে-কৌশলে নাৎসী

জার্মানির সীমানা-সংলগ্ন অঞ্চল গ্রাস ক'রে রাজ্যবিস্তার করেছিলেন, মাও-সে-তুং-এর সম্প্রসারণ নীতি তার অনুরূপ। যেহেতু হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যগুলির কতক লোক মঙ্গোলীয় এবং তিব্বতীয়দের বংশজাত, সেই অজুহাতে তাদের সংঘবদ্ধ করতে পারলে চীন তাদের রাজনৈতিক দাবার ঘুঁটিতে পরিণত করতে পারে।

কিন্তু চীন সিকিম-ভুটানের অধিবাসীদের যতখানি বোকা বা ছেলেমানুষ মনে করে তারা ততখানি নয়। চীনের অভিসন্ধি বোঝার মত বুদ্ধি এদের আছে। তিব্বত দখল ক'রে চীন সেখানে তিব্বতীয়দের কী স্বর্গরাজ্য স্থাপন ক'রে দিয়েছে, ধর্মহীন কমিউনিস্ট নায়কগণ তিব্বতের জনসাধারণকে কিরূপে দাসজাতিতে পরিণত করতে চলেছে তা দেখে হিমালয়ের এপারের পার্বত্য রাজ্যের বাসিন্দাদের মন মোহমুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছে। কি ব্যক্তির, কি জাতির, কারো চাতুরিই দীর্ঘকাল কার্যকরী থাকে না।

সিকিমের রাজপরিবার ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নেতৃবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বর্তমান মহারাজকুমার উচ্চশিক্ষিত ও প্রগতিপন্থী। পাশ্চাত্যদেশের ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড়। ভারতের সহায়তায় তাঁর দেশের নিরাপত্তা রক্ষা ও সমৃদ্ধি সাধনে তিনি দৃঢ়সংকল্প। আধুনিক যুগের উপযোগী হাসপাতাল স্থাপন, দ্রুত চলাচলের জন্য ভাল রাস্তা ও মোটর বাস ব্যবহার, উন্নত বীজ বিতরণ ও পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে চাষী ও পশুপালকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রচেষ্টা, বিদ্যাশিক্ষার প্রসার, বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন ও কুটিরশিল্প এবং যন্ত্রশিল্পে তা ব্যবহারের উদ্যমের ভিতর দিয়ে সিকিমে নবযুগের সূচনার পরিচয় মেলে।

তিব্বত

তিব্বত আমাদের হিমালয়ের ওপারের প্রতিবেশী। দমদম বিমান বন্দর থেকে এরোপ্লেনে ক'রে সোজা ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে যেতে যতক্ষণ সময় লাগবে, হিমালয়ের ওপর দিয়ে উড়ে তিব্বতের রাজধানী লাসায় যেতে প্রায় ঐরকম সময়ই লাগবে। দূরত্ব প্রায় সমান হ'লেও জায়গা দুইটির মধ্যে কত প্রভেদ! একটি সমুদ্রের কাছে, বৃষ্টিপাত সেখানে প্রচুর, গাছপালার সবুজ রঙ চোখ জুড়িয়ে দেয়, আরামদায়ক বাতাস দেহে তৃপ্তির পরশ বুলায়; অন্যটি সমুদ্র থেকে প্রায় সাতশো মাইল দূরে, সারা বছরে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে, চারিদিকে গাছপালাহীন পাথর চোখকে পীড়া দেয়, কন্‌কনে শীতল বাতাসের কামড় থেকে বাঁচার জন্য পশমী কাপড় ও পশুচামড়ায় শরীর ঢেকে রাখতে হয়।

তিব্বতীয়রা তাদের দেশকে বলে 'বড্', ভারতীয়রা বলত 'ভোট', মোঙ্গলদের ভাষায় এর নাম ছিল 'টোবেট' এবং চীনারা বলত 'তু-ফান্'। তিব্বতের আনুমানিক আয়তন ৪ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১২ লক্ষ ৭৪ হাজার।

দেশটি কেমন

বঙ্গোপসাগর থেকে যে মেঘের দল বাতাসে ভর ক'রে উত্তর দিকে চলে যায়, তার সঙ্গে ভেসে যেতে পারলে কী মজা হ'ত! দেখতাম বাংলাদেশের প্রায় সবটাই সমতল, নীচে সবুজ মাঠ সবুজ গালিচার মত বিছানো, তার মাঝে মাঝে রূপালি নদীর আঁকা-বাঁকা গতি যেন সাদা সুতার নক্সা। বাংলাদেশের উত্তর প্রান্তে দেখা যাবে নীলাভ পাহাড়ের দেওয়াল, মেঘকে ঠেকানোর প্রথম বাঁধ যেন। পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যাবার সময় জলপ্রার্থী অরণ্যের

ওপর কিছু বর্ষণ ক'রে মেঘ এগিয়ে চলবে উত্তরদিকে। বাংলার সীমানা পেরিয়ে এবার সিকিম, ভুটান। এখানে পাহাড়ের দেওয়াল আরো উঁচু; পাহাড়ের গা ভিজিয়ে দিয়ে, পাহাড়ের মাথায় কিছু জল ঢেলে দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়বে—নীল আকাশের দিকে চার মাইল সাড়ে চার মাইল উঁচু হিমালয়ের প্রাচীর। ডিঙ্গিয়ে যাবার উপায় নেই, অত উঁচুতে উঠলে মেঘের বাষ্পকণা বরফে পরিণত হবে, বাতাসে আর ভাসতে পারবে না। তবে তিব্বতে যাবার উপায় আছে। হিমালয় একটানা নিরেট পাথরের গাঁথুনির মত নয়; মাঝে মাঝে যে গিরিপথ আছে, ছোট গিরিচূড়ার পাশ দিয়ে ও এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ের মধ্যে যে ফাঁক আছে, তার ভিতর দিয়ে মেঘের সামান্য কিছু অংশ এঁকে-বেঁকে ঘুরপাক খেয়ে হিমালয় পর্বতমালা পার হয়ে এর উত্তর ঢালে গিয়ে পৌঁছে। সাগর থেকে যে পরিমাণ জলকণা নিয়ে এরা যাত্রা করেছিল, তা ইতিমধ্যে প্রায় সবই ফুরিয়ে গেছে।

হিমালয়ের গা বেয়ে ওপারে প্রায় ১৫ হাজার ফুট নেমে পাওয়া যায় গভীর উপত্যকা; তা পার হয়েই আবার পর্বতশ্রেণী পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রসারিত। এই পর্বতের নাম বাহির-হিমালয়; হিমালয়ের চেয়ে এ অনেক কম উঁচু। যে সামান্য মেঘ হিমালয় পার হয়ে গিয়েছিল, বাহির-হিমালয়ই তা আটক ক'রে রেখে দিল; এই অঞ্চলে কিছু পরিমাণ বৃষ্টি দিয়েই সে-মেঘ শেষ হয়ে যায়। হিমালয় পার হয়ে আমরা পৌঁছলাম তিব্বতের ভূমিতে।

বাহির-হিমালয় ছাড়িয়ে উত্তরদিকে যেতে শুধু চোখ পড়ে কেবল গাছপালাবিহীন ন্যাড়া পাহাড় আর উঁচু-নীচু পাথরের ঢেউ খেলানো জমি। এই হ'ল তিব্বত; পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু দেশ, সাগর থেকে এর গড় উচ্চতা ১৫ হাজার ফুট। এদেশের

কোন জায়গাই ১০ হাজার ফুটের কম উঁচু নয়। সারা দেশটিই একটি বিরাট মালভূমি; দক্ষিণের সীমানা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়, আর তিনটি পাহাড়শ্রেণী পশ্চিম থেকে পূবদিকে চলে গেছে—লাডাক পাহাড়, কৈলাস পাহাড় এবং কারাকোরাম শৈলমালা। বাহির-হিমালয়ের দক্ষিণদিকে যে গভীর উপত্যকা, তার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ও শতদ্রু নদী।

মেঘের সঙ্গে কল্পনায় যাওয়া চলে কিন্তু বাস্তবে নয়। বাস্তবের পথ অতিশয় দুর্গম ও কষ্টকর। সিকিম ও ভুটানের মধ্যেকার চুম্‌বি উপত্যকা পার হয়ে অসংখ্য চড়াই উৎরাই অতিক্রম ক'রে বরফ-ঢাকা সরু গিরিপথের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কোন কোন জায়গায় পথে একদিকে পাহাড়ের খাড়া দেওয়াল, কোন আশ্রয় নেই, অন্যদিকে গভীর খাদ। সামান্য অসতর্ক হ'লে কিংবা বরফের ওপর পা পিছলে গেলে তার মৃত দেহও তুলে আনার সাধ্য হবে না কারো। তবু চমরী গরুর পিঠে মাল বোঝাই ক'রে, নিজের পিঠের সঙ্গেও থলি ঝুলিয়ে নিয়ে ব্যবসায়ী এবং তীর্থযাত্রীরা যুগ যুগ ধরে এমনি বিপদ-ভরা পথ দিয়েই যাতায়াত করছে।

বৃষ্টি নেই কিন্তু দেশ জলের ভাণ্ডার

তিব্বত শীতল শুষ্ক দেশ। উত্তরের বাতাস দেশে মেঘ নিয়ে আসে না, কারণ তা আসে মধ্য এশিয়ার স্থলভাগের ওপর দিয়ে। সে কন্‌কনে শুকনা বাতাসে হাত-পা, মুখ ফাটে। দক্ষিণদিক থেকে প্রবাহিত বাতাসে যে মেঘ আসে, হিমালয়ের ওপরই তার প্রায় সবখানি ফুরিয়ে যায়, যে সামান্য অংশ ওপারে গিয়ে পৌঁছে, বাহির হিমালয়ের বাধা পার হয়ে তা আর যেতে পারেনা। কাজেই দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই যা-কিছু সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। সারাদেশে বছরে মোট বৃষ্টির পরিমাণ মাত্র ৮ ইঞ্চির মত। বর্ষাকালে

জলপাইগুড়িতে একদিনেই ১৫ থেকে ১৭ ইঞ্চি বৃষ্টি প্রায় প্রতি বছরই দুই-একদিন হ'য়ে থাকে।

তিব্বত বৃষ্টির দেশ নয় কিন্তু তুষার ও হ্রদের দেশ। উচ্চ মালভূমি ও পর্বতের তুষারক্ষেত্র থেকে অনেক নদীর উৎপত্তি হয়েছে। ঘুমন্ত তুষারকণা জেগে উঠে চুপি চুপি ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি ছেড়ে; সাথী জুটেছে পথে, একত্র হয়ে চলার বেগে পাথর কেটে কেটে পথ করে নিয়ে ছুটে চলেছে সাগরের দিকে। ভারতের কয়েকটি বড় নদীর উৎস হ'ল তিব্বতের দক্ষিণ অংশ। পশ্চিম অংশ থেকে তুর্কীস্তানের মরুভূমিতে গিয়ে পড়েছে পাঁচটি নদী। আবার উত্তর অংশে রয়েছে অনেকগুলি হ্রদ, আকাশের নীল দর্পণের মতো। এই হ্রদ অঞ্চলের বাইরেও কয়েকটি বড় হ্রদ আছে—যেমন কোকোনর, মানস সরোবর ও ইয়ামড্রগ-শো। মানস সরোবর হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে; এর জল সবুজ নির্মল কাচের মতো টলমল করে; সূর্যকিরণে এর নীচের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়।

বনজঙ্গল ঘুরে আসি

নেপাল ভুটানের অরণ্য যে দেখে এসেছে, তিব্বতের বনজঙ্গল তার চোখেই লাগবে না; কারণ এখানে অরণ্য কোথাও নাই। পশ্চিমে কুয়েনলুন পাহাড়ের দিকে এবং চীনের সীমান্তে সামান্য কিছু বনভূমি আছে, আর বড় গাছপালা যা-কিছু দেখা যাবে সবই হিমালয় ও বাহির-হিমালয় এই দুই পাহাড়শ্রেণীর মাঝে। শাল, সেগুন গাছ নয়; পপলার, ওয়ালনাট, ওক এবং মাথা-সরু ঝাউ। ইউরোপের শীতল অঞ্চলে যে ধরণের গাছপালা দেখা যায়, সেই রকম। বাহির-হিমালয়ের পাহাড়-অঞ্চলে ডালিম-বেদনার বাগান দর্শককে মুগ্ধ করবে। চুনির মতো লাল টুকটুকে ফুল আর বড় বড় লাল ও গোলাপি রঙের ফলে গাছ নুয়ে পড়ে। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে যব ও

গমের জমি দেখা যায়। হিমালয় যেন তার ছোট অনুগামী বন্ধু বাহির-হিমালয়কে স্নেহের দান থেকে একেবারে বঞ্চিত করেনি। বাহির-হিমালয় অঞ্চল ছেড়ে দেশের মধ্যে এগিয়ে গেলে যেদিকেই চোখ পড়ে কেবল নিরেট পাথরের পাহাড়, তার গায়ে আর মালভূমিতে কেবল ঘাস—কোথাও ছোট আকারের, কোথাও বা দীর্ঘ। এই তৃণ অঞ্চল চমরী গরুর চরণভূমি। তিব্বতীরা দীর্ঘ লোমওয়ালা চমরীর দল নিয়ে চরিয়ে বেড়ায়। চমরী গরু এদের বড় সম্পদ; চমরীর মাংস উপাদেয় খাদ্য, দুধ আর মাখন পুষ্টিকর খাদ্য, লোম থেকে হয় কম্বল ও কাপড়, চামড়া লাগে জুতা ও জামা তৈরি করতে, গোবর থেকে হয় জ্বালানি। এ ছাড়া চমরী গরু এদেশের মালবাহী ও অন্য কাজের পশু। দুর্গম পথে মানুষের নিরাপদ বাহনও এই ইয়াক (চমরী)।

তিব্বতের বুনোজীব দেখতে হ'লে দক্ষিণের বনে এবং লম্বা ঘাসের অঞ্চলে ঘুরতে হবে। বনে আছে বানর, ভালুক, চিতাবাঘ; তৃণ-অঞ্চলে দেখা যাবে বুনো গাধা, বুনো ছাগল, বুনো ভেড়া; ঘাসের রঙের সঙ্গে এদের গায়ের ধূসর রঙ এমনভাবে মিশে থাকে যে, সহসা নজরেই পড়ে না। এদের মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করে যে-সব বন্যজীব তাদের গায়ের রঙে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিল রয়েছে। চিতাবাঘ ও নেকড়ে আছে এই দলে। ভুটানের বনপাহাড়ে বুনোহাতি দেখা যায় দলে দলে কিন্তু হিমালয়ের ঠিক ওপারেই তিব্বতে হাতি নাই। মানুষের পক্ষে যেমন হাতি পোষা সহজ নয়, প্রকৃতির পক্ষেও তেমনি। এদের স্বাভাবিক বাসভূমির জন্য চাই নিবিড় গভীর অরণ্যের 'পিল্‌খানা', প্রচুর বৃষ্টিপাত, প্রচুর জল ও প্রচুর ছায়া যেখানে বড় বড় গাছের আড়ালে বনজঙ্গলের সঙ্গে মিশে এরা চলাফেরা করতে পারে। তিব্বতের জলবায়ুতে এমন বন সম্ভবপর নয়।

লোকেদের পরিচয়

তিব্বতীদের বেশির ভাগই খাটো, খুব কম সংখ্যক লোক আছে যারা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চির চেয়ে বেশি লম্বা। মেয়েরা আরো খাটো। এদের চুল কালো এবং কতকটা কোঁকড়ানো, চোখের তারা বাদামি রঙের, গায়ের রঙ হাল্‌কা বাদামি।

শীতের দেশ তিব্বত। কাজেই লোকেদের পোষাক-পরিচ্ছদ শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপযোগী। লম্বা আলখাল্লার মতো পশমী কাপড়ের কোট, হাতা লম্বা, কলার বড় যাতে গলা ঢেকে রাখতে পারা যায়। চক্‌মকে রঙে এদের খুব পছন্দ। গরমের সময় সাধারণ লোকে সুতির জামাকাপড় পরে, ধনীরা পরে রেশমবস্ত্র। শীতকালের পোষাক দেখলে এদের মেরুযাত্রী বলে মনে হবে। ভেড়ার চামড়ার জামা, লোমের দিক গায়ের থাকে সঙ্গে; সুতি বা পশমী কাপড়ের সঙ্গে কোমল চামড়া ও তুলা লাগিয়ে পুরু ক'রে নেওয়া হয়। এই লম্বা পা-পর্যন্ত-পরা আলখাল্লা কোমরের সঙ্গে ফিতা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। কোমর থেকে গলা পর্যন্ত যে থলির মতো হ'ল, এর ভিতর চায়ের পেয়ালা ও আরো টুকিটাকি জিনিস রেখে উপরের এই অংশ বেশ ফুলিয়ে রাখে।

পোষাক কতখানি লম্বা, তা দেখে পুরোহিতদের চেনা যায়। সাধারণ লোকের গায়ের কোট হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হয়, কিন্তু স্ত্রীলোক ও পুরোহিতদের কোট নামে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত। জুতা হয় নানা রঙে রঙিন, কাপড়, ফেল্ট্ অথবা চামড়া দিয়ে তৈরি। পৃথক ক'রে মোজা পরার ব্যবস্থা না ক'রে জুতা লম্বা করা হয় হাঁটু অবধি; হাঁটুর পিছন দিকে একটু চেরা—সেখান দিয়ে পা ঢুকিয়ে দিয়ে তিন-চার ফুট লম্বা রঙিন পশমী ফিতা দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধে রাখা হয়।

স্ত্রীলোকদের গহনা-প্রীতি

গহনা দিয়ে দেহ সাজাতে ভালবাসে না এমন মেয়ে বোধ হয় পৃথিবীতে নাই; তবে তিব্বতী মহিলাদের সাজানর মতো অঙ্গ একমাত্র মাথা! হাত পা গলা সবই তো কাপড় দিয়ে ঢাকা, কাজেই যত কিছু প্রসাধন তা মাথা ও গলায়। অভিজাত পরিবারের মেয়েরা ফ্রেমের সঙ্গে মুক্তা, নীলপাথর, প্রবাল ঝুলিয়ে মাথায় পরে! পশুপালকদের স্ত্রীরা চুল সরু ক'রে বিনুনি ক'রে খোঁপা বাঁধে এবং খোঁপার সঙ্গে পিঠের ওপর ঝুলিয়ে দেয় লাল হলদে প্রভৃতি রঙিন পাথরের গুচ্ছ। লামাদের ১০৮ খানা ধর্মগ্রন্থ আছে; তারই প্রতীক হিসাবে অনেক স্ত্রীলোক চুলে ১০৮টি বিনুনি নিয়ে পিঠের ওপর ছড়িয়ে দেয়। আবার কেউ কেউ মাথায় পরে একটি কাপড়ের ঢাকনি—তার চারদিকে তামা ও পিতলের পয়সা এবং কড়ি সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়, প্রতি পদক্ষেপে এগুলি ঝুনুঝুনু ক'রে বাজে। কানে মাকড়ির মতো গহনা পরা স্ত্রীলোকের মধ্যে তো রেওয়াজ আছেই, অনেক পুরুষও পরে; কর্মচারীদের মধ্যে পরে সকলেই। স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই গলায় মাদুলি ধারণ করে। মাদুলির মধ্যে আছে ছোট একটি মূর্তি, আর যে মাদুলি নেয় তার জন্য কোন লামার-লেখা মন্ত্র। ওদের ধারণা, এই মাদুলি কবচ ভূতপ্রেত প্রভৃতি অপদেবতার হাত থেকে তাদের রক্ষা করে।

সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান

তিব্বতী মহিলারা রীতিমত পরিশ্রমের কাজ করে, পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মাঠের কাজ করে, সংসারের যাবতীয় কাজই তাদের হাতে। সমাজে তাদের অনেকখানি স্বাধীনতা আছে কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে তাদের মতামত বড় একটা নেওয়া হয় না।

ছেলের সঙ্গে কোন মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব এলে বাবা তার অভিমত

জেনে নেন কিন্তু মেয়ের অভিমত নেবার রীতি নাই। এক-বিবাহ এবং বহু-বিবাহ সবই প্রচলিত আছে; বহু-বিবাহ কেবল পুরুষের পক্ষে নয়, স্ত্রীলোকের পক্ষেও। সাধারণত পশুপালক এবং চাষীদের মধ্যেই এক স্ত্রীলোকের একের বেশি স্বামী-গ্রহণ দেখা যায়। অনেক সময় কয়েক ভাই মিলে একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করে। তবে নিয়ম এই যে, যার সঙ্গে প্রথমে বিয়ে হবে তার পর তার ছোট ভাইদের সঙ্গেও বিয়ে হবে কিন্তু বড় ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে না। এদের কাছে দেবর হ'ল দ্বিতীয় বর।

অভিজাত-শ্রেণীর লোকেরা অনুরূপ অভিজাত পরিবারে বিবাহ করে। সাত পুরুষ ছাড়াছাড়ি না হ'লে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিয়ের রীতি নাই। এদেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রায় হয় না; বিবাহ নাকচ করতে হ'লে সরকারের অনুমোদন দরকার হয়।

বাড়িঘর

তিব্বত শুকনো দেশ, পাথরের অভাব নেই কোথাও। বাড়ঘর তাই পাথর দিয়ে তৈরি। অভিজাত-শ্রেণীর লোকেরা শহরেই বাস করে। তাদের বাড়ি বেশ বড় এবং চৌকোণা-মিলানো। মাঝে উঠান, তার চারদিক দিয়ে ঘর। তিনদিকের ঘর গোয়াল, ভাঁড়ার এবং অন্যান্য জিনিস রাখার কাজে লাগে। বাইরে থেকে আসার সদর দরজা সোজা উঠান পার হয়েই বসতঘর, দোতলা তিনতলাও হ'য়ে থাকে। পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে মাটির গাঁথুনি দিয়ে তৈরি দেওয়াল। ছোট দালানের দেওয়ালের উপরের অংশ পাথরের পরিবর্তে রোদে-পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি, মাটির মেজের মতো ছাদ মাটি দিয়ে সমান ক'রে বানানো। ঘরে বড় বড় জানালা রাখা হয় কিন্তু কাচ মেলে না, তার বদলে কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে স্বচ্ছ কাগজ লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে ঘরে আলো আসতে পারে।

চাষীরা বাস করে পল্লীতে। আমাদের দেশের মত গাছপালা দিয়ে ঘেরা গ্রাম এদেশে নাই। পাহাড়ের কোলে কতকগুলি বাড়ি নিয়ে এক একটি গ্রাম। ঘরগুলি পাথর আর মাটি দিয়ে তৈরি; কখন কখনও শুধু মাটির মোটা দেওয়ালের ওপরই মাটির ছাদ দিয়ে ঘর তৈরি করা হয়। যে অঞ্চলে সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি হয়, সেখানে ঘরের ছাদ একটু ঢালু ক'রে দেওয়া হয় জল গড়িয়ে যাবার জন্য। আবার যে অঞ্চলে
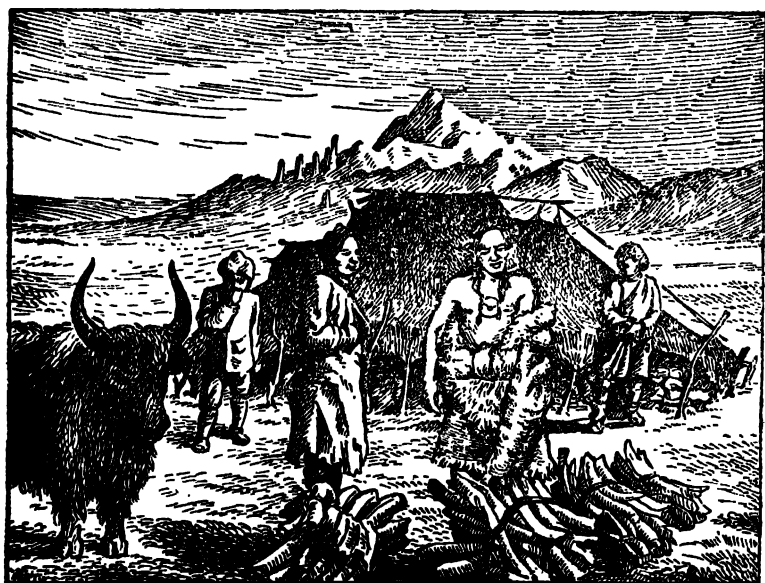
তিব্বতের যাযাবর পশুপালক তাঁবুতে বাস করে

পাইন গাছ জন্মে সেখানে পাইনকাঠ বিছিয়ে ঘরের ছাদ বানানো হয়, দেওয়ালের ওপর কাঠগুলিকে চেপে শক্ত ক'রে রাখার জন্য কাঠের দুই ধারে ভারি পাথর চাপিয়ে দিলেই হ'ল।

পশুপালকরা চমরী গরু আর মেষের পাল নিয়ে ঘাসের অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এদের অনেকের স্থায়ী বাড়িঘর নাই, পরিবার

পরিজন নিয়ে বাস করে তাঁবুতে। চমরীর লোম-দিয়ে-তৈরি ১২ থেকে ৫০ ফুট লম্বা তাঁবু খাটিয়ে তাতে বাস করে। চৌকোণা তাঁবুর চারিদিকে চমরী গরুর গোবর শুকিয়ে জমা ক'রে বা পাথর দিয়ে নীচু দেওয়াল তৈরি ক'রে নেয়, তাঁবুর মাঝখানে ২ ফুট মতো লম্বা সরু একটি ফাটল রাখে, সেখান দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যায়। শীতকালে এরা পাহাড়ের নীচু অংশে নেমে আসে, আবার গরম পড়লে বরফ গলে যাবার পর ঘাসে যখন পাহাড় ভরে যায়, তখন চলে যায় ওপরের দিক। তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমের তৃণ অঞ্চল পশুচারণের পক্ষে খুব উপযোগী।

ধর্ম ও সমাজ

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত। কিন্তু সিংহল বা ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ ধর্মের আচরণ যেরূপ, এখানে তেমন নয়। তিব্বতে বুদ্ধের ধর্ম লামাদের ধর্মে পরিণত হয়েছে। ভূতপ্রেত প্রভৃতি অপদেবতাকে খুশি রাখার জন্য পূজা দেওয়া, তাদের কু-নজর থেকে রক্ষার জন্য মন্ত্র-লেখা মাদুলি-ধারণ লোকেদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাছাড়া তিব্বতের বৌদ্ধ মঠগুলি শুধু ধর্মচর্চার বা পূজা-উপাসনার আলয় নয়; জমিদারির তদারক, ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো—এ-সবও মঠের শ্রমণরা ক'রে থাকে।

তিব্বতে মঠে যোগ দেওয়ার দিকে লোকেদের খুব ঝোঁক। কারো কারো হিসাবমতো সমগ্র লোকের চার ভাগের এক ভাগ মঠের শ্রমণ। জাতি বিচার নাই, ধনী দরিদ্র, অভিজাত সাধারণ সকল লোকের জন্যই মঠের দ্বার খোলা। বেশির ভাগ পুরোহিত অবিবাহিত থাকে। যারা বিবাহ ক'রে সংসার গঠন করে, তাদের স্ত্রী বাড়িতে থেকে বিষয়-সম্পত্তির তদারক করে। কতক লামা বিদ্যাচর্চায় নিযুক্ত থাকে, কতক ধর্মের আচারবিধিগুলি অভ্যাস করে যাতে জনসাধারণকে ধর্মের পালনীয় বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারে, কতক মঠের সম্পত্তি দেখা-শোনা করে, ব্যবসায়-বাণিজ্য চালায়, কতক বা ছাপার কাজ, ছবি

আঁকা ও অন্যান্য হাতের কাজ শেখে, কতক আবার ভৃত্য ও সৈনিকের কাজ গ্রহণ করে। তিব্বতীদের কাছে মঠে যোগ দেওয়া মানে সংসারের যাবতীয় কাজ ফেলে কেবল ঈশ্বরচিন্তায় সময় কাটানো নয়; মঠও একধরনের সংসার। মঠ জনসাধারণ ও সরকারের কাছ থেকে টাকা-পয়সা ভূমি ও নানা দান পায়। মঠের জোতজমির তদারক করা, টাকা পয়সা ব্যবসায়ে খাটিয়ে লাভ করা মঠের শ্রমণদের কাজ।

মঠের সব শ্রমণ বা লামার সম্মান সমান নয়। লামাদের মধ্যে যাঁরা প্রধান তাঁদের মনে করা হয় বুদ্ধের অবতার। জাতক কাহিনীতে

তিব্বতে দলাই লামার প্রাসাদ

বুদ্ধের পূর্বজীবনের অনেক কাহিনী ও জীবনীর বর্ণনা আছে। তিব্বতের প্রধান লামাদের বুদ্ধের আগের নানা জীবনের অবতার বলে গণ্য করা হয়। তিব্বতে এরূপ 'অবতার' আছে একশো জনের বেশি, সর্বপ্রধান হলেন দলাই লামা। অবতারদের মধ্যে একজন আছেন মহিলা-লামা। ইনি থাকেন গিয়ানৎসে থেকে দুইদিনের পথ দূরে একটি সুন্দর হ্রদের

ধারে সাম্-ডিং মঠে। দেশের সাধারণ লোক লামাদের সমীহ করে এবং লামারা মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক জানে বলে লোকে তাদের ভয়ও করে। তিব্বতীদের মধ্যে লেখাপড়ার বিশেষ প্রচলন নাই। লামারা বৌদ্ধ ধর্ম-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং মঠে শিষ্যদের শিক্ষা দেয়। এদের ধর্মাচরণের মধ্যে এমন কিছু কিছু আছে যা অপরের কাছে অদ্ভুত মনে হবে। লামার পাথরের জপমালা হাতে নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে—ওম্ মণিপদ্মে হুঁ। কাগজে এই মন্ত্র লিখে চাকারগায়ে আটকিয়ে দেওয়া হয়, বাতাসে চাকাটি ঘোরে, যতবার ঘোরে ততবার জপ করা হল! এমনি ছোট প্রার্থনা-চক্র লোকের। হাতে নিয়ে চলাফেরা করে, মাঝে মাঝে চাকাটি ঘুরিয়ে দেয়; কাজও হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করাও হয়ে যাচ্ছে, এই ভাব। প্রতি বাড়িতেই এই ধরনের প্রার্থনা-চক্র বা ধর্ম-চক্র লাগানো থাকে, সেগুলি বাতাসে ঘোরে। কখনও বা দীর্ঘ খুঁটির সাথে পাতলা কাপড় নিশানের মত উড়িয়ে দেওয়া হয়, তাতে প্রার্থনা-মন্ত্র লেখা। নিশানটি বাতাসে ওড়ে এবং লোকেদের বিশ্বাস, যে-লোক এই নিশান তুলে দিয়েছে তার প্রার্থনা করার কাজ ঐভাবেই হয়ে যাচ্ছে।

সমাজে পাঁচ শ্রেণীর লোক

তিব্বতের সমাজে জাতিভেদ নাই, সকলেরই ধর্ম এক, সকলেরই মঠে গিয়ে পূজা দেবার অধিকার আছে। তবু বিভিন্ন কাজ ও বংশ অনুসারে দেশের লোকেদের পাঁচটি শ্রেণীতে ফেলা হয়। প্রথম শ্রেণীতে হল মঠের লামা সম্প্রদায়। সকলেই ধর্মের কাজে সাক্ষাৎ ভাবে যুক্ত না থাকলেও মুণ্ডিতমস্তক গৈরিক রঙের আলখাল্লা-পরা লামার সকলের সম্মান লাভ করে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে হল দেশের প্রায় ১৫০টি অভিজাত বংশের লোকেরা। অভিজাতদের তিনটি আদি ধারা থেকে বর্তমানের পরিবার গঠিত হয়েছে। যারা বহু পূর্বে তিব্বতের কল্যাণের জন্য উল্লেখযোগ্য

কাজ করেছিল, এবং তার জন্য তখনকার সরকার পুরস্কার স্বরূপ তাদের ভূমি দান করেছিল, তাদের বংশধরগণ এখনো সে সম্মান ভোগ করে আসছে। যে বংশে দলাই লামা বা পাঞ্চেন লামা জন্মগ্রহণ করেন সে বংশ অভিজাত বলে গণ্য হয় এবং সরকারের কাছ থেকে ভূমিসম্পত্তি লাভ করে থাকে। এসব বংশের লোকেরা অভিজাত শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে। বর্তমানে চতুর্দশ দলাই লামা এবং দশম পাঞ্চেন লামা জীবিত আছেন ; এদের এবং আগের সব দলাই ও পাঞ্চেন লামার বংশধরেরা তিব্বতে অভিজাত শ্রেণীর লোক। তৃতীয় দলে লোক অপেক্ষাকৃত কম। দশম শতাব্দীর পূর্বে যে রাজারা এদেশে রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের অল্পসংখ্যক বংশধর যারা এখনো বেঁচে আছেন তাঁরা বনেদি সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। এছাড়া কোন সাধারণ লোকের প্রচুর অর্থ থাকলে সরকারের কাছে আবেদন করে সে যদি ওয়ারিশবিহীন কোন অভিজাত ব্যক্তির জমিদারি কিনে নিতে পারে তবে সেও অভিজাত বলে গণ্য হবে।

ব্যবসায়ী

তিব্বতীরা জাতিহিসাবে ব্যবসায়ী। দেশের বহুলোক অন্যান্য কাজের সঙ্গে ছোটখাটো কিছু ব্যবসা করে, দোকানপাট চালায়। ব্যবসা-বাণিজ্যই যাদের একমাত্র জীবিকা এরূপ লোক আছে অল্পসংখ্যক। মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য দূরে যাতায়াতের কাজ করে পুরুষরা, মেয়েরা দোকান ও খুচরা ব্যবসার তদারক করে। মঠের লামারা ব্যবসায়ে টাকা খাটায়, মঠের আয় বৃদ্ধি করে; অভিজাত লোকেরাও নেপালী, চীনা ও ভারতীয়দের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে। যে জিনিসের চাহিদা দেশে সবচেয়ে বেশি, যেমন—চা, পশম ও চাউল, সে সব ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে খাস সরকার।

পশুপালক

পশুপালকেরা পরিশ্রমী এবং স্বাধীন প্রকৃতির। চমরীগরু ও মেষের পাল নিয়ে এরা দেশের বিভিন্ন ঘাসের অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। এসব জায়গা ১৪ হাজার ফুটের বেশি উঁচুতে, কোথাও বসতি নাই। মালভূমি ও বৃক্ষহীন পাহাড়ের পাদদেশে ঘাসে ছাওয়া। উত্তর-পশ্চিমের তৃণভূমি অঞ্চল গোচারণের পক্ষে খুব উপযোগী। এই পশুপালকেরা ইয়াকের লোমে-তৈরি তাঁবুতে বাস করে।

চাষী

চাষ আবাদ করবার মত আবহাওয়া আছে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে। কাজেই চাষীদের বাস বেশির ভাগ এই অঞ্চলেই। গৃহস্থালির কাজ ক'রেও স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সঙ্গে মাঠে কাজ করে। চাষীরা জমিদার, মঠ ও সরকারের তালুকে আবাদের কাজ করে, এজন্য পরিবার পিছু তারা কিছুটা জমি পায় এবং তার প্রতিদানে তাদের খাজনা ও খাটুনি দিতে হয়। কতক লোক ঐ সব তালুকে দিনমজুর হিসাবে আবাদের কাজ করে। নিজের চাষের জমি আছে এমন চাষীর সংখ্যা খুব কম।

খাদ্য ও পানীয়

তিব্বতীরা বরাবর বিদেশীদের সন্দেহের চোখে দেখেছে। অন্য দেশের লোকেরা তাদের দেশ দেখতে যাবে তাও তারা পছন্দ করে না। বহুদিন পর্যন্ত তিব্বতের রাজধানী ছিল 'নিষিদ্ধ নগরী'; এখানে বিদেশী কেউ গেলে তার শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। পরে ইংরাজ সরকারের চাপে অবশ্য এ ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল হয়েছিল। তিব্বত এক বিচিত্র রকমের দেশ, যেমন শীত তেমনি দুর্গম। দুর্গমের প্রতি মানুষের একটা প্রবল আকর্ষণ রয়েছে, তাই সকল বাধাবিপত্তি ডিঙিয়েও সাহসী মানুষ দেখতে যায় কোন্ দেশ কেমন, কোথায় কি রকম অবস্থার মধ্যে কি

রকম পরিবেশে মানুষ বসবাস করছে, কেমন তাদের বাড়িঘর, কেমন তাদের জীবনযাত্রা।

তিব্বতীদের প্রধান খাদ্য হল ইয়াকের মাংস, ভেড়ার মাংস, যবের ছাতু, পনীর এবং চা। মুরগীর মাংস ও মাছ এরা খায় না। ইয়াক তিব্বতীদের প্রধান খাদ্যদাতা, দুধ দেয় তা থেকে হয় মাখন ও পনির। মাংস পাওয়া যায়, শীতের দেশে মাংস না হলে বাঁচার উপায় নাই; চামড়া পাওয়া যায়, এ থেকে হয় জামা-জুতা; পশম পাওয়া যায়, এ থেকে হয় মোটা কাপড়; গোবর থেকে হয় ঘুঁটে। যেদেশে কয়লা মেলে না এবং কাঠের অভাব, সেখানে রান্নার জন্য এই ঘুঁটের ওপরই বেশি নির্ভর করতে হয়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কিছু পরিমাণ ধান হয়, তবে তা সারাদেশের লোকের চাহিদা মেটাতে পারে না। দক্ষিণের লোকেরা এবং ধনীরা অন্য খাদ্যের সঙ্গে ভাত ফল ও সব্জি সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করে। ওদেশে ভাত খাওয়া এক লোভনীয় ব্যাপার, অর্থশালী লোক ছাড়া অন্যের সাধ্যে তা কুলায় না।

সোডা ও লবণ দিয়ে চা

তিব্বতীদের কাছে চা অতি প্রিয় পানীয়। তবে আমাদের তৈরি চা আর এদের চা স্বাদে এক রকম হবে না। চা তৈরি করতে এরা চীন থেকে আমদানি-করা ইঁট-চা (brick-tea) প্রথমে জল ও সোডা দিয়ে বেশ ক'রে সিদ্ধ করে; তারপর হাতা দিয়ে তুলে ছাকনি দিয়ে ছেকে অন্য একটি পাত্রে রেখে তাতে মাখন ও লবণ মিশিয়ে ঘোল টানার মত একটি যন্ত্র দিয়ে ঘাঁটতে ঘাঁটতে যখন সবটা ভালভাবে মিশে যায় তখন তৈরি হয় এদের সর্বজনপ্রিয় পানীয়। প্রতিদিন এরা ৩০ থেকে ৫০ পেয়ালা করে চা পান করে। আর একটি পানীয় হল বীয়ার; যব সিদ্ধ করে পচিয়ে বীয়ার তৈরি করা হয়, এতে নেশা হয় সামান্য। দেশে আখ হয় না, তাই বিদেশ থেকে আমদানি করা ছাড়া চিনি

পাওয়ার উপায় নাই। সোডা এবং লবণ দেশেই মেলে, মাখন আছে প্রচুর। কেবল, চীনের শক্ত জমাট-করা চা পেলেই পানীয় তৈরিতে অসুবিধা থাকে না। যব নিজেদের দেশেই কিছু পরিমাণ উৎপন্ন হয়। তা থেকে বীয়ার তৈরি করে তারা নিজেরাই।

উৎসব

সকল দেশের সমাজেই নানারূপ উৎসব আছে। শুধু খাদ্য সংগ্রহ করে এবং প্রতিদিনকার সাধারণ কাজ করেই মানুষ তৃপ্তি পায় না; সে চায় মাঝে মাঝে বাঁধা-কাজ থেকে ছুটি, যাতে আনন্দ উল্লাসে সে মেতে উঠতে পারে। আনন্দ মানুষের জীবন-রসায়ন। আনন্দ তার কাজে আনে উদ্যম, অপর মানুষের সঙ্গে সহযোগিতার ভাব গড়ে তোলে, নিজেদের মধ্যে একতা ও প্রীতির বাঁধন শক্ত করে। ধর্মকে কেন্দ্র করেই তিব্বতীদের প্রধান উৎসব। প্রতি মাসের ৮ই, ১০ই, ২৫শে এবং ৩০শে তারিখ এদের কাছে শুভদিন; আর অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন হল বিশেষ শুভ ও পবিত্র। এই দুইদিন স্ত্রীপুরুষ সবাই ভাল পোষাক পরে, ফুল ধূপধুনা, টাকা ও মাখন নিয়ে নিজেদের এলাকার মঠে গিয়ে সমবেত হয়। মঠের পূজা-ঘরে যে প্রদীপ দিনরাত্রি জ্বলে তার জন্য মাখন উপহার দেয়, আলো জ্বালিয়ে রাখতে তার দেওয়া মাখন কাজে লাগুক সবাই তা চায়; ধূপধুনা দেয়, ফুলের গুচ্ছ দেয়, টাকা দেয় প্রণামী, তারপর বেদীর সামনে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করে।

নববর্ষের উৎসব হল তিব্বতের সবচেয়ে বড় আনন্দের ব্যাপার। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকে এদের নূতন বৎসর শুরু হয়। এ সময় উৎসব চলে প্রায় এক মাস ধরে। বাড়িঘর সুন্দর করে সাজানো হয়, পায়স তৈরি হয় আর ভাঁড়ে ভাঁড়ে জমানো হয় মদ। কয়েকদিন ধরে নাচ গান আর ভোজন চলে; যত পার খাও, আনন্দ কর—এই

ভাব সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আশেপাশের মঠগুলি থেকে দলে দলে লামারা লাসায় আসতে থাকে, তৃতীয় দিনে দুপুরে প্রায় ২০ হাজার পুরোহিত লাসার প্রধান প্রার্থনা-মন্দিরে এসে সমবেত হয়। তারপর ১০ দিন ধরে দিনে তিনবার করে সমবেত প্রার্থনার অনুষ্ঠান। প্রথম মাসের ১৫ই তারিখ হয় আলোক-দিয়ে বাড়িঘর, মঠ-মন্দির সাজানোর উৎসব, আমাদের দীপান্বিতার মত। হাজার হাজার প্রদীপ অন্ধকারের মধ্যে আলোর মালার মত শোভা পায়, শহরকে মনে হয় স্বপ্নের দেশ। আলোকসজ্জার পর খেলাধূলা। ২০শে তারিখ থেকে শুরু হয় নানারকম খেলার প্রতিযোগিতা ; তার মধ্যে ঘোড়দৌড় দেখার জন্য লোকের ভীড় হয় সবচেয়ে বেশি।

এই নববর্ষের উৎসবের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল লামাদের প্রাধান্য। এই উৎসবের সময় লাসা নগরীর শাসনভার সরকারের হাতে থাকে না, একজন লামা এই সময়ের জন্য শাসনের সকল ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিব্বতীদের জীবনে ধর্ম যে সকলের উপরে, এ সাময়িক ব্যবস্থা বোধ হয় তারই প্রতীক।

তিব্বতীরা সাধারণত মৃতদেহ কবর দেয় না বা পোড়ায় না। দেহ টুকরা টুকরা করে কেটে পাহাড়ের ধারে ফেলে দেয় যাতে শকুনি, গৃধিনী প্রভৃতি পাখি খেতে পারে। মৃতদেহকে বৃথা মাটির নিচে পচিয়ে বা পুড়িয়ে না ফেলে তা কোন প্রাণীর সেবায় লাগুক এই উদ্দেশ্য থেকেই এ রীতি চালু হয়েছিল। কুষ্ঠ-রোগীদের মৃতদেহ থলিতে করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

গবর্নমেণ্ট

দলাই লামা তিব্বতের প্রধান ধর্মগুরু, দেশের প্রধান শাসনকর্তাও তিনিই। ধর্ম এদেশে রাজনীতি ও সমাজ জীবনের সাধারণ কাজ থেকে পৃথক নয়। তাই পুরোহিতরা একদিকে মঠে পূজা আরাধনার কাজ

করেন, আবার ব্যবসাবাণিজ্য চালানো, শাসনকাজে অংশ গ্রহণ করা এসবও করেন। দালাই লামাকে মনে করা হয় অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের অবতার, পাঞ্চেন লামা এমনি অমিতাভ বুদ্ধের অবতার বলে লোকেদের ধারণা। দলাই লামা দেহত্যাগ করলে অন্য একটি শিশুর মধ্যে তাঁর পুনরায় আবির্ভাব হয়, এই বিশ্বাসে লাসার প্রধান তিন মঠের লামারা দৈববাণীর সাহায্যে সে শিশুকে খুঁজে বের করেন এবং সাবালক না হওয়া অবধি তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়সে দলাই লামা দেশের শাসন ভার নিজহাতে গ্রহণ করেন।

রাজধানী লাসা শহরে পোটালা রাজপ্রাসাদে দলাই লামা বাস করেন। তাঁর বাসভবনটি একটি পাহাড়ের ওপর নির্মিত বিশাল এবং সুন্দর অট্টালিকা। এটি একাধারে মন্দির, রাজবাড়ি এবং দুর্গ; পাহাড়ের গা থেকে এমনভাবে গেঁথে তোলা হয়েছে যে, কোথায় পাহাড় শেষ হয়ে বাড়ি শুরু হল বোঝা কঠিন, সমস্ত পাহাড়টিকেই একটি দুর্গ ব'লে মনে হয়। সিঁড়ির অনেক ধাপ উঠলে তবে প্রাসাদের দরজার কাছে পৌঁছানো যায়, ভিতরের পথগুলি গোলক ধাঁধার মত ঘুরানো-ফিরানো, নূতন লোকের পক্ষে ভিতরে ঢুকে সব ঘর ঘুরে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। পাহাড়ের চূড়ার ওপর শাদা ও খয়েরী রঙের রাজভবনটি দূর থেকে মেঘলোকের রহস্যময় পুরীর মত দেখায়।

দলাই লামা দেশের শাসনকর্তা হলেও বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকার্য পুরোহিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে। লাসা ও তার শহরতলি ছাড়া দেশ ৮টি প্রদেশে বিভক্ত; শাসনকাজের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট আছেন প্রায় ৫০ জন এবং এই অঞ্চলগুলির বেশির ভাগই বে-সামরিক কর্মচারীর সঙ্গে পুরোহিত সম্প্রদায়ের কর্মচারীও শাসনকার্য পরিচালনা করেন। একটি জাতীয় সভা আছে, লামা এবং অভিজাত লোকেরা তার সদস্য কিন্তু নিয়মিত এর অধিবেশন হয় না। অধিবেশন যখন হয়,

তখন যাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় তারাই কেবল যোগদান করতে পারে। এই সভা কোন আইন রচনা করতে পারে না, দলাই লামার নিকট কেবল প্রস্তাব পেশ করতে পারে।

এক আসন, দুই দাবিদার

তিব্বতের ধর্মের প্রধান এবং রাজ্যের প্রধান কে—এই নিয়ে দলাই লামা ও পাঞ্চেন লামার মধ্যে বিরোধ। দলাই লামা অবলোকিতেশ্বরের অবতার আর পাঞ্চেন লামা অমিতাভ বুদ্ধের। জীবিত বুদ্ধদের মধ্যে অমিতাভর স্থান অবলোকিতেশ্বরের উপরে কিন্তু তিব্বতে দলাই লামার প্রাধান্য পাঞ্চেন লামার অনেক আগে থেকে। আদিতে পাঞ্চেন লামা ছিলেন পঞ্চম দলাই লামার শিক্ষক। তিনি খুশি হয়ে পাঞ্চেনকে অমিতাভর অবতার বলে ঘোষণা করেন; এর পরবর্তীকালে এই দুই প্রধানের মধ্যে কলহ চলতে থাকে। চীন সমর্থন করে পাঞ্চেন লামাকে, কিন্তু তিব্বতীরা দলাই এর প্রতি অনুগত। ১৯২৪ সনে দুইদলের মধ্যে বিরোধ চরমে ওঠে, নবম পাঞ্চেন লামা দেশ থেকে পালিয়ে চীনে গিয়ে আশ্রয় নেন; সেখানে ১৯৩৭ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। বর্তমান দশম পাঞ্চেন লামা চীনদেশে লেখাপড়া করেছেন, চীনের কমিউনিস্ট সরকার তাঁকেই তিব্বতের আসল শাসনকর্তা ব'লে ঘোষণা করে। এখানেই গোলমালের শেষ নয়।

নূতন সমস্যা

কমিউনিস্ট চীন তিব্বতের ওপর তার আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। দুই লামা-প্রধানের কলহ তার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে হয়েছে অনুকূল, কারণ তিব্বতে সৈন্য পাঠানোর সহজ অজুহাত সে পেয়ে গেছে। ১৯৫০ সনে কমিউনিস্ট বাহিনী তিব্বতে প্রবেশ করে, দেশের মধ্যে দেখা দেয় প্রবল আলোড়ন। চীনাদের মতলব সুবিধার নয়, হটাও তাদের—এই মনোভাব ছড়িয়ে পড়ে লামাদের মধ্যে। তিব্বতের

সৈন্যদল চীনাদের বাধা দেয়, কিন্তু একটি ছোট সেনাবাহিনী অধিক-সংখ্যক চীনা সৈন্যের সাথে লড়াইতে টিকবে কি ক'রে? তিব্বত সরকার লাসা ছেড়ে দক্ষিণ সীমানার দিকে সরে আসে, ১৬ বৎসর বয়স্ক দলাই লামা শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে (২৩শে মে) চীনের সঙ্গে তিব্বতের সন্ধি হয়, তার প্রধান সর্ত হ'ল: (১) তিব্বতের স্বায়ত্ত শাসন মেনে নেওয়া হবে; দলাই লামার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতার কোন পরিবর্তন হবে না; দেশের ধর্ম ও রীতিনীতি সমীহ করা হবে; (২) নবম পাঞ্চেন লামা ও ত্রয়োদশ দলাই লামার সময়ে উভয়ের মধ্যে যে বন্ধুভাব ছিল তা ফিরিয়ে আনা হবে; (৩) চীনা কমিউনিস্ট সরকার তিব্বতে একটি সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক কমিটি গঠন করবে; তিব্বতী সৈন্যবাহিনীকে ক্রমে চীনা বাহিনীর মতো পুনর্গঠন করা হবে; (৪) তিব্বতের বৈদেশিক ব্যাপার পরিচালনা করবে চীনের কমিউনিস্ট সরকার।

দুই লামা-প্রধানের বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া চীনের অভিপ্রায় নয়, আসল উদ্দেশ্য তিব্বত দখল করা। চীন-তিব্বত সন্ধিতে দলাই লামার ক্ষমতা স্বীকার করা হ'ল বটে কিন্তু চীন তিব্বতের ভিতরে সৈন্য মোতায়েন রাখার যে অধিকার লাভ করল, তাই হ'ল চীনাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ। চীনা সৈন্য তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার ক'রে বসল, চীনা কর্মচারী ও যন্ত্রবিদ্‌গণ অল্পদিনের মধ্যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সকল অফিস ও কাজকর্ম নিজেদের হাতে তুলে নিল। তিব্বতকে কমিউনিস্ট চীনের রাজনৈতিক কাঠামোর ছাঁচে গড়তে হবে, তারই আয়োজন চলতে লাগল।

তিব্বতের সঙ্গে ভারতের চিরদিনের মিত্রতা। তিব্বতীরা বৌদ্ধ। ভারতকে তারা পবিত্র ধর্মস্থান মনে করে; ভারতের হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র কৈলাস পাহাড় ও মানস সরোবর তিব্বতে অবস্থিত। কাজেই উভয়

দেশের মধ্যে পবিত্রতা ও প্রীতির বাঁধন বিরাজিত রয়েছে। তিব্বতের লোকেদের কাছে ভারত ধর্ম ও গুরুর দেশ। বাঙালী পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি তিব্বতেই দেহত্যাগ করেন। তিব্বতীরা এখনও তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে থাকে। রাজা রামমোহন রায় মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে লামাদের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে গিয়েছিলেন। বৃটিশ আমলে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। তিব্বতীরা ভেড়া ও ইয়াকের পিঠে পশম ও অন্যান্য দ্রব্য চাপিয়ে ১৪ থেকে ১৮ হাজার ফুট উঁচু গিরিপথ দিয়ে দার্জিলিং ও কালিম্পঙ-এর কাছাকাছি বেচাকেনা করতে আসত। এখান থেকে নিয়ে যেত চাউল, চা প্রভৃতি।

কমিউনিস্ট চীনের সৈন্য তিব্বতে প্রবেশ করার পর তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এক চুক্তি হয়। তাতে শর্ত হয় যে, তিব্বতের সঙ্গে চীনের এবং ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হবে। এর কিছুদিন পরে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লাসায় কমিউনিস্ট চীনের বিরুদ্ধে তিব্বতীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করে, সারাদেশে চলে মারামারি কাটাকাটি। দলাই লামা দেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন, বহু তিব্বতীও চীনাদের অত্যাচারে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়। কমিউনিস্ট চীনের নববিধানে দেশের লোক বাড়িঘর সহায়সম্পত্তি ফেলে বিদেশে শরণার্থীর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

তিব্বতের অতীত ইতিহাস শান্তি ও সমৃদ্ধির কাহিনীতে পূর্ণ নয়। বহুযুগ আগে তিব্বতের কয়েকজন রাজা দেশের শান্তি ও সুনাম

বাড়িয়েছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল, মঠ এবং মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু অভিজাত ও লামা সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা-লাভের কলহ বার বার দেখা দিয়েছে এবং এরই সুযোগে বাইরের রাষ্ট্র তিব্বত অধিকার করার চেষ্টা করেছে। মঙ্গোল সম্রাট কুবলাই খান পূর্ব তিব্বতকে তাঁর সাম্রাজ্যের অংশ ক'রে নিয়েছিলেন কিন্তু তা নামেমাত্র। তিব্বত বরাবর তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে; মঙ্গোল সৈন্য মাঝে মাঝে তিব্বতে লোকগণনার জন্য এসেছে, উদ্দেশ্য তিব্বত যে তাদের বিজিত দেশ, তারই নজীর রাখা।

চীনের মঞ্চু সম্রাটদের আমলে তিব্বতকে পুরাপুরি দখলে আনার জন্য অনেকদিন ধরে চেষ্টা চলে। সুযোগ পেলেই তিব্বতীরা বিদ্রোহ ক'রে চীনাদের হত্যা করত। ভারতের শাসন যখন ইংরাজদের হাতে ছিল তখন তারা তিব্বতের স্বাধীনতা কামনা করেছে; তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া যাতে তিব্বতের ভিতর দিয়ে ভারতের সীমানা পর্যন্ত আসতে না পারে। রাশিয়া বা চীনের পূর্ণ অধিকারে যাওয়ার চেয়ে দলাই লামার অধীনে তিব্বত শান্তিকামী মিত্রদেশরূপে থাকুক, এই ছিল ইংরাজ-শাসকদের বাসনা। কিন্তু চীন সম্রাটগণ একে একটি চীন প্রদেশে পরিণত না করা পর্যন্ত বিরত হচ্ছিলেন না। তিব্বতীরাও সহজে চীনাদের প্রভুত্ব মেনে নিতে রাজী ছিল না। পূর্ব তিব্বতে চীনারা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করতে থাকলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতীরা রুখে দাঁড়ায়, শুরু হয় বিদ্রোহ এবং গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ে। তিব্বতকে শায়েস্তা করার জন্য চীনা সেনাপতি চাও এর-ফেং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ২ হাজার সৈন্য নিয়ে লাসায় প্রবেশ করেন; কঠোর দমন-নীতি চলে, দলাই লামা ভারতে এসে আশ্রয় নেন এবং জনগণের আহ্বানে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে যান। স্বাধীনতাপ্রিয় তিব্বতীরা কখনই চীনের কঠোর শাসন মেনে নেয়নি।

চীন সম্রাটগণ যে কাজ সফল করতে পারে নাই, কমিউনিস্ট চীন তাই সম্পূর্ণ করতে উদ্যোগী হয়েছে। ইতিহাসের অতীত ঘটনা আবার নূতন ক'রে ঘটল, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে চীনাদের বিরুদ্ধে যেমন বিদ্রোহ হয়েছিল ১৯৫৯-এ হ'ল তার চেয়ে অনেক বড় আকারে, নূতন দলাই লামা আগের দলাই লামার মতই আশ্রয় নিলেন ভারতের মাটিতে। বিপ্লব, রক্তপাত অশান্তি দেশের মধ্যে বিরাজ করতে লাগল। আগেকার চীনা অভিযানের সঙ্গে বর্তমান অভিযানের অনেকখানি প্রভেদ আছে; কমিউনিস্ট চীন সামরিক শক্তিতে আগের দিনের চীন সম্রাটদের আমলের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল, তার তুলনায় তিব্বতের শক্তি নগণ্য; চীন সম্রাটদের আমলে তিব্বতে চীনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়লে তিব্বতীদের ধর্ম ও সমাজে বিশেষ পরিবর্তন আসত না, কিন্তু বর্তমান কমিউনিস্ট চীনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ধর্মের স্থান নাই, সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক অবস্থাতে ও আদর্শে দুই দেশের মধ্যে মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি। এরূপ ক্ষেত্রে তিব্বতের ওপর নয়া চীনের শাসন বিস্তারের অর্থ হ'ল তিব্বতের চিরাচরিত সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তন। তিব্বতের জনগণ যে চীনের অভিযানকে খুশি মনে মেনে নেয়নি দেশের অশান্তিই তার প্রমাণ। চীনারা তিব্বতী জাতিকে নির্মূল ক'রে ফেলার চেষ্টা করছে এমন অভিযোগও শোনা গেছে। সে যাহাই হোক্, এ-কথা ঠিক যে, তিব্বতী বিদ্রোহীরা চীনা দখলকারী সৈন্যকে শান্তিতে দিন কাটাতে দিচ্ছে না। তবে এর পরিণতি কোথায়, শেষ পর্যন্ত দলাই লামা তাঁর কর্তৃত্ব ফিরে পাবেন কিনা, অস্ত্রবলে একটি অনিচ্ছুক জাতিকে চিরদিন পদানত রাখা যাবে কিনা কেবল ভবিষ্যৎই তা বলতে পারে। জন-সাধারণ যদি মনের দিক থেকে প্রস্তুত না থাকে, তবে কোন মতবাদ জোর ক'রে চাপিয়ে দিলে তা স্থায়ী হয় কিনা তিব্বত তারও প্রমাণ দেবে।

চীনদেশ

কলিকাতার চীনাপট্টির ভিতর দিয়ে এক চক্কোর ঘুরে এলেই আপনি এমন কতক লোক দেখতে পাবেন যাদের সঙ্গে ভারতবাসীর দেহের গড়নে ও পোষাক-পরিচ্ছদে মিল নাই। এরা খাটো ধরনের, গায়ের রঙ সাদা তাতে হলদে ভাবটাই বেশি, মুখ কতকটা চ্যাপ্টা, চোখ ছোট এবং ওপরের দিকে কাৎভাবে টানা। এদের চুল কালো এবং সাধারণত সোজা-সোজা। ঢিলা পায়জামা ও কামিজ-পরা স্ত্রী-পুরুষ কাজকর্ম করছে, কিংবা দেখতে পাবেন কাঠের খড়ম পায়ে দিয়ে মেয়েরা কচি কোলের শিশুকে কাপড় দিয়ে পিঠের সঙ্গে বেঁধে পথে চলেছে; এরা চীনা। চীনদেশ এদের নিজেদের দেশ। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চীনারা নানা দেশে বসবাস ক'রে থাকে।

চীনদেশ এশিয়া মহাদেশের পূর্ব অংশে। এর উত্তরে ও পশ্চিমে বাহির-মঙ্গোলিয়া ও সোভিয়েট রাশিয়ার সীমানা ৬ হাজার মাইলের বেশি, উত্তর-পূর্বে কোরিয়া দেশ, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে ইন্দোচীন ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ-পশ্চিমে হিমালয় ও কারাকোরাম পর্বতমালা। মাঞ্চুরিয়া, সিংকিয়াং ও কয়েকটি ছোট দ্বীপসহ এরা আয়তন ৩২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭২৬ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ৫৮ কোটির কিছু বেশি।

দেশটি কেমন

চীনদেশ আয়তনে বিশাল, একটি ছোটখাট মহাদেশের মতো। বিরাট দেশ বলে এর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন রকমের জলবায়ু। হিমালয় পর্বত অঞ্চল এশিয়া মহাদেশের প্রধান নদীগুলির উৎপত্তিস্থল। এখান থেকে উৎপন্ন হয়ে কতক নদী যেমন হিমালয়-প্রাচীর কেটে পথ ক'রে নিয়ে ভারতে প্রবাহিত হয়েছে, তেমনি এর পূর্ব অংশ থেকে অনেকগুলি

নদী চীনদেশের মধ্যে ব'য়ে গেছে। এই নদী-উপত্যকায় লোকবসতি ঘন, উর্বর ভূমিতে ফসলের প্রাচুর্য, অধিবাসীরা জীবিকা অর্জনের নানা কাজে কর্মমুখর। তিনটি প্রধান নদীর সঙ্গে চীনাদের জীবনের যোগ-সূত্র। এদের গতি ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে তাদের জীবিকা, সুখ ও দুঃখ। হোয়াং-হো খেয়ালি নদী, মরুসদৃশ শুক্‌নো অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত ও নদীটি অগভীর, মাঝে মাঝে পলিমাটি এর গতিপথ প্রায় রোধ ক'রে ফেলেছে। কখনও নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে অকস্মাৎ প্রবল বৃষ্টিপাত হ'লে অগভীর নদীখাত দিয়ে জলধারা হু হু ক'রে ছুটে আসে, কূল ভাসিয়ে চাষের জমি বাড়িঘর ডুবিয়ে দিয়ে চলে যায়। দেশের লোকেরা তাই এই নদীর নাম দিয়েছে 'চীনের দুঃখ'।

হোয়াং-হোর দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত ইয়াং-সি চীনের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ নদী। বিপুল জলরাশি নিয়ে ধীর গতিতে বয়ে চলে ইয়াং-সি। বহু উপনদী উভয়দিক থেকে এসে এর সঙ্গে মিলেছে। স্টীমার ও বড় বড় নৌকা যাত্রী ও মাল নিয়ে দুই হাজার মাইল পর্যন্ত এই নদীপথে যাতায়াত করে। ইয়াং-সির গতিপথের ধারে গড়ে উঠেছে চীনের কর্মজীবন। সারাদেশের প্রায় অর্ধেক লোক এই নদীর অববাহিকায় বসবাস করে। নদীকে অবলম্বন ক'রেই কত লোকের জীবিকা ; জমিতে চাষ-আবাদ করে, জলসেচের সুবিধা পাওয়া যায় নদী থেকে, ব্যবসা-বাণিজ্য চলে নদীপথে, নদীই হ'ল সহজ এবং অল্প খরচের যোগাযোগ-পথ। তৃতীয় বড় নদীটি হ'ল সি-কিয়াং কিন্তু হোয়াং-হো বা ইয়াং-সির তুলনায় এটি অনেক ছোট, স্টীমার লঞ্চে এ নদীপথে প্রায় ২৫০ মাইল পর্যন্ত দেশের ভিতরে যাওয়া যায়।

জলের এক নাম জীবন। এই 'জীবন' নামটি যে সার্থক চীনদেশ তার বাস্তব প্রমাণ। এর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কোমল পলিমাটির স্তর শুষ্ক ধূলারাশিতে পরিণত হয়ে রয়েছে ; জলের পরশ

পেলে তা উদ্ভিদের পক্ষে পরম উপযোগী হয়ে উঠে কিন্তু সে-অঞ্চলে জলের একান্তই অভাব।

ছয়টি প্রাকৃতিক অঞ্চল

দেশ যদি বড় হয় এবং তার ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্নরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা দেখা যায়, তবে এক কথায় সে-দেশের অবস্থা প্রকাশ করা যায় না। তার ভিন্ন অঞ্চলে ঘুরলে দেশের এবং লোকদের সত্যকার পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়। আমরা যদি ট্রেনে বা এরোপ্লেনে ক'রে চীনদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকের অঞ্চলগুলি ঘুরে আসি, এদের দেশের ভূমির প্রকৃতি এবং মানুষের জীবনযাত্রার মোটামুটি চিত্র দেখতে পাব।

উত্তর চীনের সমভূমি অঞ্চল শুষ্ক মরুসদৃশ। মাটি অতিশয় উর্বর কিন্তু জলের করুণাবিন্দুর অভাবে তা ধূসর রেণুতে পরিণত। বছরে বৃষ্টিপাত হয় মাত্র ২২ ইঞ্চি, শীতকালে যে পরিমাণ তুষার পড়ে তা গ'লে ধূলিকে কিছুটা ভিজিয়ে দেয়। শীতকালীন ফসল হ'ল গম, বাজরা। আমাদের দেশে গরমের দিনে আকাশে সজল মেঘের মনোহর শোভাযাত্রা দেখি ; এ অঞ্চলের লোকেরা এমন মেঘ কোনদিনই দেখেনি। শীতকালে অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত যে মেঘ তাদের আকাশ ছেয়ে আসে, তা বাষ্পের মেঘ নয়, ধূলির মেঘ। দেশের ভিতরের দিক থেকে শুক্‌নো বাতাস প্রবল বেগে বইতে থাকে ; বৃক্ষহীন, জলহীন অঞ্চলের ওপর দিয়ে ব'য়ে আসার সময় পলিমাটির কোমল রেণু-চূর্ণ আকাশে উড়িয়ে চারিদিক অন্ধকার ক'রে ফেলে। এই অঞ্চলে রয়েছে চীনের ব্যবসা ও শিল্পকেন্দ্র ; সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের জন্য এ এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে বহুদূর-বিস্তৃত রেলপথ।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শ্যামলতার চিহ্ন নাই। কতক স্থানের মাটি অতিশয় কোমল উর্বর, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে তা হয়েছে শুক্‌নো মরুভূমি।

পাহাড়গুলি মেঘহীন আকাশের দিকে ন্যাড়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের গায়ে সবুজ গাছপালার ছোপ নাই, বাতাসের দাপটে মাটি ক্ষ'য়ে গিয়ে ধূলিকণায় পরিণত হয়ে দিকে দিকে উড়ে গেছে। মনে হয় কোন মহাদৈত্য বিরাট চামচ দিয়ে কুরে কুরে মাটি তুলে নিয়েছে।

এ অঞ্চলে লোকবসতি কম, রেলপথ সামান্য, বছরে বৃষ্টি পড়ে মাত্র ১৫ ইঞ্চির মতো, শীতের তীব্রতা অত্যন্ত বেশি। প্রাচীন কালে যখন স্থলপথে ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, এই অঞ্চল ছিল চীনদেশের প্রবেশ-পথ। হুয়েন-সাং এই অঞ্চল পার হয়ে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করেছিলেন, মার্কোপোলো ইউরোপ থেকে এই পথ দিয়ে চীনের সম্রাট কুবলাই খানের রাজসভায় এসেছিলেন। যখন সমুদ্র-পথ জানা গেল এবং ইউরোপ থেকে জাহাজে চীনদেশের উপকূলে এসে পৌঁছানো সম্ভব হ'ল, তখন থেকে সমুদ্রের তীরের অঞ্চল হয়ে উঠল গুরুত্বপূর্ণ।

চীনদেশের মধ্যভাগ সুজলা, সুফলা ও লোকবসতিপূর্ণ। আমাদের পাঞ্জাব যেমন পঞ্চ নদীর দেশ, তেমনি চারিটি নদীর অঞ্চল ব'লে এই মধ্য-এলাকা চীনাভাষায় 'জেকোয়ান' নামে পরিচিত। চারিদিকে শৈলমালা একটানা না হ'লেও এ অঞ্চলটিকে উত্তর ও দক্ষিণ থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে। বৃষ্টিপাত মাঝারি ধরনের, নদীর জল থেকে ফসলের মাঠে জল সেচনকরার সুবিধা, জলবায়ু আরামদায়ক। এই সকল কারণে এ অঞ্চল চাষ-আবাদের উপযোগী। নদীতীরে ব্যবসা-বাণিজ্যের বন্দর গড়ে উঠেছে কিন্তু শিল্প-কারখানা বিশেষ নাই।

জেকোয়ানের দক্ষিণে ইয়াং-সির নিম্ন অববাহিকা চীনের ঘন লোক-বসতি ও ধানচাষের অঞ্চল। অনেক জায়গা জুড়ে ভূমি সমতল, পলিমাটিতে জমি হয়েছে উর্বর, আরামদায়ক জলবায়ু এবং বৃষ্টিপাত লোকেদের জীবিকা অর্জনের অনুকূল হয়েছে। এই অঞ্চলে ধান যেমন ফলে প্রচুর, ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন চলে ব্যাপক, কল-কারখানার কাজও

তেমনি প্রসারলাভ করেছে। পূর্ব উপকূলের লোকেরা মাঝে মাঝে সাগরের বদমেজাজের দরুন দুর্ভোগ ভুগে থাকে। সাগর থেকে ঝড়-তুফান প্রচণ্ড বেগে উপকূলের দিকে ছুটে আসে, পাহাড়ের মতো উঁচু ঢেউ তীরে এসে আছাড় খেয়ে পড়ে, কখনো বা দেশের ভিতরেও কিছুদূর পর্যন্ত মানুষের বাড়িঘর খেতখামার নষ্ট করে, দুর্যোগে পশু ও মানুষের জীবননাশ হয়। এইরূপ ঝটিকা ও উদ্দাম সাগরে-তরঙ্গকে চীনাদের ভাষায় বলে 'টাইফুন'।

চীনের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল পাহাড়-পর্বতময়, সমুদ্রের কাছাকাছি থাকায় জলবায়ু কতকটা মৃদু। উষ্ণমণ্ডলের এই এলাকায় বৃষ্টিপাত মাঝারি ধরনের, পাহাড়ের গায়ে অরণ্যের সমাবেশ, নদীর মোহনায় ও উপত্যকায় সমভূমিতে ধানের চাষ হয় প্রচুর। এ অঞ্চলে চীনাদের সঙ্গে বহু অ-চীনাদেরও বসতি রয়েছে।

চীনদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ইন্দোচীন ও ব্রহ্মদেশের সীমানা দিয়ে অবস্থিত। পাহাড়-পর্বত দিয়ে ঘেরা, বনজঙ্গল দিয়ে ছাওয়া এই অঞ্চলের সঙ্গে চীনের উত্তর অঞ্চলের অনেক পার্থক্য। উচ্চতার জন্য জলবায়ু স্নিগ্ধ; উপত্যকা অংশ ছাড়া অন্যত্র চীনাদের বসতি কম। দুর্গম অঞ্চলে যাতায়াত কঠিন; যোগাযোগের অসুবিধার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারলাভ করেনি। পাহাড়ের উচ্চ অংশে অ-চীনাদের বসতি আছে কিছু পরিমাণে। উঁচুনীচু ঢেউ-খেলানো পাহাড়ময় ভূমি, জায়গায় জায়গায় নিবিড় অরণ্য। এই এলাকা দিয়ে ইন্দোচীনের সঙ্গে যোগাযোগ। বিপ্লবী ও বিদ্রোহীদের গরিলা যুদ্ধ চালানোর অনুকূল এই অঞ্চল রাজনৈতিক অশান্তির বীজক্ষেত্রের মতো।

বনজঙ্গল ঘুরে দেখি

হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে কিংবা ব্রহ্মদেশের পাহাড়ময় অংশে যেমন নিবিড় সুশ্রী বন, চীনদেশ তেমন অরণ্যের একান্ত

অভাব। তার কারণ ঘন বনভূমি সৃষ্টির উপযোগী প্রচুর বারিবর্ষণ এদেশে নাই। মহাদেশের মতো বিরাট দেশটিকে অরণ্যের দিক থেকে দুইটি প্রধান উদ্ভিদ-রাজ্যে ভাগ করা যায়; উত্তর-পশ্চিম নিয়ে অর্ধেক-খানিতে তৃণভূমির প্রাধান্য, দক্ষিণ-পূর্ব নিয়ে বাকি অর্ধেক কাঠের বন। তবে যে পরিমাণ আয়তনের দেশ তার তুলনায় বনজঙ্গলের পরিমাণ কম। দেশের ওপর দিয়ে হাওয়াই জাহাজে ক'রে উড়ে যেতে সবুজের চেয়ে ধূষর ও গৈরিক রঙের মাটিই চোখে পড়ে বেশি। উঁচুনীচু আন্দোলিত ভূমি শ্যামল আস্তরণের অভাবে রুক্ষ নিরানন্দ রূপ ধারণ ক'রে আছে, মনে হয়।

দেশের উত্তর অঞ্চল মরুসদৃশ। মাঝে মাঝে লবণ হ্রদ, পাথরের টুকরা-বিছানো মরু প্রান্তর আর বালিয়াড়ি স্থির সমুদ্রের বিবর্ণ ঢেউ-এর মতো। ঝড়ের সময় এই বলিয়াড়িগুলি সচল হয়ে ওঠে, রাশি রাশি ধূলি বাতাসে উড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে জমা হয়। ঝড়ের শেষে আবার সেই শান্ত দৃশ্য। মরু অঞ্চলের মাঝে মাঝে আছে মরূদ্যান। যেখানে সামান্য পানীয় জলের পরশ, সেখানেই উদ্ভিদের সতেজ সুন্দর চেহারা। মরূদ্যানে দেখা যাবে আঙুর, পপলার ও এল্‌ম গাছের সুশ্রী সমাবেশ। বসন্তকালে হ্রদগুলিতে দেখা যায় নানাজাতীয় হাঁস ও অন্যান্য জলচর পাখি। কলকাকলিতে স্থান মুখরিত ক'রে তোলে, অল্পদিনের জন্য এরা এখানে অতিথি হয়, বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে; বাচ্চারা একটু বড় হ'লে তাদের সঙ্গে নিয়ে চলে যায় নূতন আস্তানার উদ্দেশ্যে; জনহীন জলাশয়গুলি আবার নীরব নিঝুম হয়ে পড়ে।

তিব্বতের পূর্ব অংশে চীনের সীমানা দিয়ে বনজঙ্গল আছে। সাং-পো (ব্রহ্মপুত্র) নদীর উপত্যকা নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত। চীনদেশের পূর্বদিকে এগিয়ে যেতে দেখা যাবে এই বনভূমি পাতলা হয়ে এসেছে। চীনের দক্ষিণ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছুটা বেশি,

পাহাড়ের ওপর এবং গায়ে কর্পূর গাছ ও চিরহরিৎ পাইনের বন এবং নীচু ও সমতল অংশে আছে বাঁশবন; বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বাঁশের অরণ্য। দেশের পাহাড় অঞ্চলে টাকিন বা হরিণজাতীয় বুনো ছাগল দেখা যায়, তিব্বতের পূর্ব অংশের পাহাড়ে দেখা যায় অতিশয় হিংস্র ভালুক, নাম পাণ্ডা। মধ্য-চীনের নদীতে আছে ছোটজাতের কুমীর; বনে দেখতে পাওয়া যায় রঙিন বনকপোত আর ছাতারে জাতের পাখি—যাদের ডাক শুনলে মনে হবে কোন লোক বোধ হয় আড়াল থেকে হাসচে।

ওরা কাজ করে

জাপানী ও চীনাদের কথা উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম-অনুরত।

একটিমাত্র বিশেষণে চীনাদের জাতীয় চরিত্রের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। এরা অতিশয় পরিশ্রমী। অনলসভাবে নিজের নিজের কাজে লিপ্ত থাকাই এদের স্বভাব। দেশ কৃষিপ্রধান, অধিকাংশ লোক চাষ-আবাদ ক'রে জীবিকা অর্জন করে। নূতন বৈজ্ঞানিক পন্থা গ্রহণ ক'রে চাষের ফসল বাড়ানোর দিকে এদের তত আগ্রহ নাই যতখানি আছে নিজেদের প্রাচীন পদ্ধতি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করার। বৃষ্টিপাত অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যশস্যের চাষে তারতম্য দেখা যায়। জমির চারিদিকে আল দিয়ে একটু উঁচু বাঁধের মতো ক'রে জল আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়, কাদা জমিতে মোষের কাঁধে লাঙল বেঁধে মাটি তৈরি করা হয় ধানের চারা লাগানেরে জন্য। প্রায় ৪ হাজার বছর ধরে যে প্রণালীতে চাষ হয়ে আসছে চীনদেশে, চাষীরা তার পরিবর্তন ঘটাতে খুব ইচ্ছুক নয়। মাটিতে সার দিয়ে কোমস পরিচ্ছন্ন ক'রে মাঠের জমিকে বাগানের মতো তৈরি করে; সার হ'ল মানুষের মলমূত্র ও গাছপালার সবুজ-সার।

রাসায়নিক সার প্রয়োগ না ক'রেও ভূমির উর্বরতা কিভাবে বাড়ানো যায় এবং প্রতি বৎসর একই জমিতে একের বেশি ফসল একই সঙ্গে উৎপাদন করা যায়, চীনারা তার সফল প্রমাণ দিয়েছে। চাষের কাজ এদের হাতে শিল্পকাজে পরিণত হয়েছে। উৎকৃষ্ট বীজ নির্বাচন, ফসল উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, কীটপতঙ্গের উৎপাত নিবারণ, বৈজ্ঞানিক

চীনা চাষী মোষ দিয়ে জমি চষছে

উপায়ে গৃহপালিত পশুর প্রজনন এবং সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে চাষীদের জ্ঞানের ও উদ্যমের অভাব রয়েছে। তবু তারা একই জমিতে ৩টি এবং কখনো বা ৪টি ফসল একই সঙ্গে উৎপাদন করে—এর সবগুলি একই সঙ্গে বোনে না, একটি ফসল কিছুটা বেড়ে উঠলে অন্যটি লাগায়।

এইভাবে দেখা যাবে মাঠে কোন ফসল পেকেছে, তা কাটার সময় হয়েছে, আবার কতক রয়েছে আধা-পুষ্ট, কতক বা একেবারেই কচি। সমভূমিতে যেখানেই মাটি আবাদের উপযোগী সেখানেই ফসল ফলানোর ব্যবস্থা হয়, পাহাড়ি অঞ্চলেও পাহাড়ের গা কেটে কিছুটা সমতল জমি বের ক'রে ধাপে ধাপে চাষের জমি তৈরি করা হয়। চাষীদের চেষ্টা ও যত্নের অভাব নাই, তবু মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে তারা রেহাই পায় না। কারণ, মাটি উর্বর হ'লেও অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির দরুন অনেক সময় ফসল নষ্ট হয়ে যায়। কখনো বা বৃষ্টির অভাবে জমিতে জল না পেয়ে শস্য শুকিয়ে যায়, আবার কখনো বা বন্যায় মাঠ ও বাড়িঘর যায় ভেসে। প্রকৃতির খেয়ালখুশির ওপর চাষীর ভাগ্য অনেকখানি নির্ভর করে।

উৎপন্ন ফসল

চীনের বিপুল সংখ্যক লোকের খাদ্য উৎপাদন করা এক বিরাট সমস্যা। দেশের সকল অঞ্চলের জলবায়ু প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদনের অনুকূল নয়; কাজেই যেখানে ভূমি ও জলবায়ু সুবিধাজনক সেখানেই ধান, গম, বাজরা প্রভৃতি চাষের চেষ্টা করা হয়। মধ্য ও দক্ষিণ চীনে ধানের চাষের দিকেই চাষীর ঝোঁক বেশি। এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বড় নদীগুলি প্রবাহিত, বৃষ্টিপাতের পরিমাণও উত্তরের চেয়ে বেশি। ধানের পরই প্রধান শস্য হ'ল গম। উত্তর অঞ্চলের বৃষ্টিবিরল অংশে ফলানো হয় গম ও বাজরা। খাদ্যশস্যের চাহিদা মেটাতে চীনা চাষীরা সয়াবিনের চাষ সুরু করেছে ব্যাপকভাবে। মাঞ্চুরিয়ার শুক্‌নো অঞ্চলে সয়াবিন ফলে প্রচুর। সয়াবিনে খাদ্যগুণযুক্ত উপাদান আছে যথেষ্ট মাত্রায়, উৎপাদনে খরচ কম ব'লে দামে সস্তা। দুধ মাংস ও প্রধান খাদ্যশস্যে যে গুণ আছে সয়াবিনে তা সবই বিদ্যমান; তাই উত্তর-চীনে সয়াবিন প্রধান উৎপাদন দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। সয়াবিন থেকে রান্নার

তেল, সাবান তৈরির জন্য তেল, যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারের জন্য তেল, পশুখাদ্য খইল প্রভৃতি পাওয়া যায়। এসবের জন্য বিদেশে রপ্তানিযোগ্য বাণিজ্যের পণ্য হিসাবেও সয়াবিনের চাহিদা বেড়েছে।

চা চীনদেশের একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। প্রাচীন কাল থেকেই চাষীরা চা উৎপাদন ক'রে আসছে, এর ব্যবহারও ব্যাপক। কিন্তু ভারতে ও সিংহলে যেমন চা-বাগিচার কর্মীরা চা-পাতা তুলে যন্ত্রে তা শুকিয়ে নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত ক'রে থাকে, চীনদেশে চায়ের চাষ তেমন হয় না। চাষীরা তাদের বাড়ির আশেপাশে চা-গাছ লাগায়, তার পাতা সংগ্রহ ক'রে কাঁচা অবস্থায় চাপ দিয়ে জমাট খণ্ড তৈরি করে। এই পাতার ঢেলার নাম ইঁট-চা (brick tea)। তিব্বতে ইঁট-চায়ের আদর খুব বেশি। এছাড়া কালো-চা এবং সবুজ-চা-ও বিদেশে রপ্তানি করা হয়। চীনের চা রঙে ও গন্ধে ভারতের বা সিংহলের চায়ের সমকক্ষ নয়।

তুলা চীনদেশের একটি প্রয়োজনীয় ফসল। ইয়াং-সি উপত্যকা এবং উত্তর চীনের কতক অঞ্চল তুলাচাষের পক্ষে বেশ উপযোগী। এখানকার মাটি এবং জলবায়ু কতকটা উত্তর আমেরিকার মেক্সিকোর মতো। পৃথিবীর উৎকৃষ্ট তুলা জন্মে এই অঞ্চলে। চীনারা আমেরিকার লম্বা-আঁশের তুলার বীজ নিজেদের দেশে বুনে তুলার উৎকর্ষ বাড়ানোর চেষ্টা করছে; পুরাপুরি না হ'লেও অনেকটা সফল হয়েছে এ ব্যাপারে। কিন্তু রেশম উৎপাদনে পৃথিবীতে চীনাদের তুলনা নাই। দেশে তুঁতগাছ (মাল্‌বেরি) জন্মে প্রচুর, কোন কোন অঞ্চলে দুই-তিন থেকে ছয়-সাত বারও এ গাছে নূতন পাতা আসে; এই পাতা খেয়ে বাড়ে রেশমকীট। রেশমকীটের রক্ষণাবেক্ষণ, তার গুটি গরম জলে সিদ্ধ ক'রে তা থেকে রেশমসূতা বের করার কাজ পল্লী-অঞ্চলের চীনাদের সারাবছর ধ'রে চলে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই চীনের রেশম

চীনদেশের বাইরেও সুপরিচিত। আমাদের দেশে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং কবি কালিদাসের যুগে চীনাংশুকের খুব সমাদার ছিল। এখনও ইয়াং-সি নদীর নিম্নে উপত্যকা প্রদেশে সাট্লি নামে যে তুষারের মতো সাদা মিহি রেশম তৈরি হয়, পৃথিবীতে তা শ্রেষ্ঠ। চীনা চাষীরা তাদের চিরাচরিত প্রথায় রেশমকীটের গুটি থেকে সূতা প্রস্তুত ক'রে কাপড় বোনে; জাপানীরা রেশম উৎপাদনে যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে এর পরিমাণ বেশি করেছে কিন্তু গুণপনায় হাতে-তৈরি চীনা রেশমই এখনও সবার সেরা। চীনদেশেও অবশ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রেশমকীট পালন, এর রোগ নিবারণ, মাল্‌বেরি চাষের উন্নতিসাধনের চেষ্টা চলেছে। গুটি থেকে কাঁচা রেশম তৈরি করা এবং রেশমসূতা দিয়ে কাপড় বোনার জন্য বড় বড় কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছে ক্যাণ্টন, সাংঘাই, সুচাও, চেকিয়াং প্রভৃতি শহরে। রেশমগুটি এবং কাঁচা রেশমও বিদেশে রপ্তানি হয় বেশ প্রচুর পরিমাণে।

আফিম

একজন নাম-করা লেখক বলেছেন—রাশিয়ানদের কাছে ধর্ম আফিমের মতো, আর কোন চীনাদের কাছে আফিম ধর্মের মতো। পৃথিবীর আর কোন দেশে চীনাদেশের মতো এত বেশি আফিমের চাষ হয় না, পৃথিবীর আর দেশের লোক চীনাদের মতো এত বেশি আফিম খায় না। খাদ্যশস্যের অভাবে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, তবু যে জমিতে গম উৎপন্ন করা যেত সেখানে চাষী পপি (আফিম) চাষ করার দিকে বেশি উৎসাহী। অধিকমাত্রায় আফিম দেহে বিষের কাজ করে, ডাক্তারি শাস্ত্রে এ-কথা বলে কিন্তু চীনারা এ নেশা ছাড়তে পারে না। কুলি বা রিক্সাওয়ালা পরিশ্রম দূর করার জন্য তামাকের মতো আফিম খায়; আমেরিকান বা ইংরেজের কাছে হুইস্কি বা বিয়ারের যে-নেশা, চীনা আফিম-খোরদের কাছে আফিমের আকর্ষণ তেমনি। আফিম

খাওয়া কমানোর জন্য দেশের সরকার নেশাখোরদের কঠোর শাস্তির এমন কি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু তবু নেশাখোরের সংখ্যা খুব কমেনি।

চাষের অন্যান্য জিনিসের মধ্যে আছে তামাক, রেমি (পাটজাতীয় শক্ত আঁশের গাছ), আখ, চীনাবাদাম, তৈলবীজ, ওষুধে লাগে এমন নানাজাতের গাছগাছড়া। চাষযোগ্য জমি কখনই চীনা চাষীরা ফেলে রাখবে না, তাই গরু-মোষ চরাণোর উপযোগী চরণক্ষেত্র নাই; দুধ-মাখনের জন্য বেশি সংখ্যায় গরু পালনের রেওয়াজ এদেশে নাই। ক্ষেত-খামারের ফসলের ঝাড়াই-ফেলাই খেয়ে যে-সব প্রাণী বাঁচতে পারে, এমন গৃহপালিত প্রাণী চাষীরা পোষে; শূয়োর, ছাগল, হাঁস, মুরগীর সংখ্যা অনেক।

ধর্ম, সমাজ ও পরিবার

জাতিহিসাবে চীনাদের ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়ামি নাই। তারা যুক্তিবাদী ও বাস্তবপন্থী। তাই একই সঙ্গে কন্‌ফুসিয়াস, বুদ্ধ ও লাওৎসের ধর্মমত গ্রহণ করতে বা যা বাস্তব জীবনে ব্যবহার করা যায়, তা পালন করতে তাদের কোন মানসিক বিরোধ নাই। পরলোক আছে কিনা তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, বর্তমান জীবনই তাদের কাছে একান্ত বাস্তব এবং উপভোগের বিষয়। কন্‌ফুসিয়াস ছিলেন গৌতমবুদ্ধের যুগের লোক; তিনি প্রাচীন চীনের বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি নূতন কোন ধর্মমত প্রচার করেন নি, মানুষের চরিত্র ও সৎ আচরণের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, দেশে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থা থাকবে, নাগরিকগণ আচরণে হবে ভদ্র এবং অপরের সঙ্গে আচরণে সুরুচি ও উদারতার পরিচয় দেবে। মানুষের আচরণকে তিনি পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ ক'রে তা কিরূপ হওয়া উচিত, সে-বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই পাঁচ শ্রেণী হ'ল—প্রজার

সঙ্গে শাসকের আচরণ, পতির সঙ্গে পত্নীর আচরণ, পিতার সঙ্গে পুত্রের আচরণ, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের আচরণ এবং বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর আচরণ। বৌদ্ধ ধর্মে জাতিভেদ-প্রথা নাই; চীনারা এটি গ্রহণ করেছে।

লাওৎসের তাউ-ধর্মমত কতকটা কনফুসিয়াসের মতের মতোই; তিনিও প্রচার করেছিলেন মানুষের ব্যবহার সৎ হওয়া উচিত। যদিও বৌদ্ধ ধর্মের লামাবাদের প্রভাবে চীনাদের অনেকে ভূতপ্রেত, অপদেবতায় বিশ্বাস করে এবং তাদের কুদৃষ্টি এড়ানোর জন্য বাড়িতে সাইনবোর্ড লাগায় ও আরো অনেক কৌশল করে, তবু মোটামুটিভাবে চীনাদের পূজা-অর্চনা ও ধর্মের আচরণগত দিকে বিশেষ ঝোঁক নাই। দেশে কমিউনিস্ট-শাসন চালু হওয়ার পর ধর্মের ব্যাপারে ভাটা পড়েছে।

চীনাদের সমাজের কয়েকটি বিশেষ দিক আছে, যা লক্ষ্য করবার বিষয়। এদের জাতিভেদ নাই, সমাজে জাতিবর্ণের দরুন ছোট ব'লে কাহাকেও হেয় গণ্য করা হয় না। সকল কাজই মর্যাদার, তা সে চাষের কাজই করুক আর কুলি-মজুরের কাজই করুক। তবে অতি প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষিত লোকের আদর ও সম্মান সবার চেয়ে বেশি। এদের বিশ্বাস, শিক্ষায় মানুষের মন উন্নত হয়, আচরণ হয় ভদ্র এবং রুচিকর। দ্বিতীয় হ'ল পরিবারের প্রতি প্রীতিপূর্ণ আচরণ এবং আকর্ষণ। কনফুসিয়াসের শিক্ষা চীনাদের জীবনে গভীর রেখাপাত করেছে। সন্তান পিতাকে ভক্তি করবে—এই নীতি তিনি নানাভাবে, নানা উপদেশে এমনভাবে চীনাদের জীবনে বদ্ধমূল ক'রে দিয়েছেন যে, পিতাপুত্রের প্রীতির সম্পর্ক এবং তারই ফলে পূর্বপুরুষদের উপাসনা চীনাদের কাছে ধর্মস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিতা যতদিন জীবিত থাকেন পুত্র থাকে তাঁর বাধ্য, অনুগত, পিতার মৃত্যু হ'লেও তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাতে হয়। এদের ধারণা, পিতা মারা গেলেও তাঁকে বাড়ির কাছা-কাছি রাখতে হবে যাতে তাঁকে সদাই স্মরণ করা যায়। মৃত ব্যক্তির

সৎকার করার সময় এদের মধ্যে শোকের চিহ্ন দেখা যায় না, জাঁকজমক ক'রে, হৈ-হুল্লোড় ক'রে মৃতদেহ কোন উঁচু জায়গায় সামান্য গর্ত খুঁড়ে কবর দেওয়া হয়। মৃতদেহ কাঠের বাক্সে রেখে রঙিন কাপড় দিয়ে ঢেকে শোভাযাত্রা ক'রে কবরখানায় নেওয়া হয়। পুরুষের শবাধার ঢাকা হয় লাল কাপড় দিয়ে, স্ত্রীলোকের শবাধার নীল কাপড় দিয়ে। শোভা-যাত্রীদের পোষাক সাদা। চীনদেশে সাদা কাপড় শোকের চিহ্ন। মৃতদেহ সৎকারের সময় বাজি পোড়ানো হয়, কখনো কখনো নাটক অভিনয় ক'রে উৎসব করা হয়ে থাকে। চীনাদের পল্লীর কাছে মাঠে ঢিপির মতো সারি সারি কবর দেখতে পাওয়া যাবে; এ-সব সমাধিস্থানে চাষ-আবাদ করা হয় না। এইভাবে দেশের আবাদযোগ্য জমির শতকরা ৪ ভাগ পতিত থেকে যায়। পরিবারের লোকজন এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দরদ বেশি থাকার ফলে, অনেক সময় চীনারা জাতি বা স্বদেশ প্রেমের চেয়ে পরিবার ও স্বজনের স্বার্থকেই বড় ক'রে দেখেছে। চীনাদের জাতীয় চরিত্রে এটি একটি দুর্বলতা।

চীনাভাষা

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে মিশরের ছবি দিয়ে মনের ভাব-প্রকাশের কৌশলই আদি ভাষা ব'লে গণ্য করা হয়। বিভিন্ন জিনিসের ছবির সাহায্যে প্রতীক-চিহ্ন দিয়ে ভাব বোঝানোর কৌশলই হ'ল প্রথম ভাষা। চীনাদের ভাষা এইরূপ প্রতীক-চিহ্ন।

আমাদের সংস্কৃত, বাংলা বা ইংরেজি, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় যেমন অক্ষর আছে, সেগুলি সাজিয়ে একত্র যোগ ক'রে পৃথক পৃথক শব্দ গঠন করা হয়, চীনের ভাষা তেমন নয়। এদের ভাষায় পৃথক অক্ষর নাই, প্রতিটি শব্দ পৃথক, প্রত্যেকে এক-একটি প্রতীক-চিহ্ন। কোন কথাকে বাক্যে প্রকাশ করতে হ'লে পর পর কতকগুলি ছবি-প্রতীক সাজিয়ে দিতে হবে; এর জন্য ব্যাকরণের দরকার নাই। 'কাল' মাত্র দুটি।

মনের ভাব প্রকাশের জন্য ছবির মতো শব্দগুলি ওপর থেকে নীচে পর পর বসিয়ে দেওয়া হয়। শব্দ-ছবিগুলি খুব কৌতুককর। শব্দের জন্য কিরূপ ছবি ব্যবহার করা হয়, তার কয়েকটি উদাহরণ দিই :

শব্দ		ছবি বা প্রতীক
গল্পগুজব	...	তিনটি স্ত্রীলোক
লুটপাট	...	একটি লোক অন্য লোককে তাড়া করেছে
স্ত্রী	...	ঝাঁটা-হাতে স্ত্রীলোক
সন্ন্যাসী	...	মানুষ ও পাহাড়
মোকদ্দমা	...	দুইটি কুকুর
ভাল	...	স্ত্রীলোক ও শিশু
কয়েদী	...	বাক্সের ভিতর লোক
বৃষ্টি	...	জলের ফোঁটা
সকলে	...	তিনজন লোক
বাড়ি	...	ছাদের নীচে শূয়োর
পূব	...	গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য
পশ্চিম	...	পাখি বাসার দিকে উড়ে চলেছে
মানুষ	...	একজোড়া পা

প্রতিটি শব্দ পৃথক এক-একটি প্রতীক-চিহ্ন ব'লে এ ভাষা শিখতে বহু শব্দের রূপ মনে রাখতে হয় এবং লেখার অভ্যাস করতে হয়। চীনাভাষায় প্রায় ৪০ হাজার এরূপ শব্দ আছে, এ-সব মুখস্থ করা দারুণ কঠিন ব্যাপার। একটি বছর দশ বয়সের চীনা ছেলে যখন স্কুলে যায়, তখন সে মোটামুটি ২ হাজার শব্দ শিখেছে। চীনা দৈনিক খবরের কাগজ প্রতিদিন গড়ে ৭ হাজার শব্দ ব্যবহার করে। চীনদেশে এমন লোক খুব কমই আছে, যারা চীনাভাষার সব শব্দ চেনে এবং লিখতে পারে। লেখা কঠিন এজন্য যে, প্রতিটি শব্দ অপর শব্দ থেকে পৃথক। জটিল প্রাচীন চীনাভাষাকে সহজ করার জন্য পাই-হুয়া অর্থাৎ

সরল চীনাভাষা চালানোর চেষ্টা চলেছে। আমাদের কথ্য ভাষার মতো কতকটা সহজ সরল হওয়ায় এর প্রচলন ক্রমে বাড়তির পথে।

জাতীয় চরিত্র

চীনদেশ কৃষির দেশ। প্রতি ১০০ জন লোকের মধ্যে ৮৫ জনই চাষী। জমিতে চাষ-আবাদ ক'রে, হাঁস, মুরগী ও শূয়োর পালন ক'রে, রেশমকীট প্রতিপালন ক'রে তার গুটি থেকে রেশমসূতা তৈরি ক'রে এরা জীবিকা অর্জন করে। চাষীরা জমিকে ভালবাসে, জমিতে সারাদিন খাটতে এদের আলস্য নাই, এদের মুখের রঙ আর মাটির রঙ একই প্রকার। জীবনকে এরা ভালবাসে, শত দুঃখের মধ্যেও নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয় না, পরলোকের প্রতি আকর্ষণ নাই, বর্তমান জীবনই এদের কাছে প্রধান। পরিবারে মেয়ের চেয়ে ছেলের আদর বেশি ; বংশের ধারা সে-ই তো বজায় রাখবে, পিতৃপুরুষের সেবা, অর্চনার ভার সেই-তো নেবে, জমি চাষ ক'রে বা অন্য কাজ ক'রে সংসার প্রতিপালনের প্রধান দায় তো তারই। চীনারা গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান, আপন পরিবারের লোকদের প্রতি অনুরক্ত। এরা সহিষ্ণু, যুক্তি মেনে চলে এবং বাস্তববাদী। জাতিহিসাবে এরা বিদেশীকে ঘৃণা ও অবিশ্বাসের চোখে দেখে ; সভ্য এবং প্রাচীন জাতি ব'লে এদের মনে আছে গর্ববোধ। তাই এরা শ্বেতকায় বিদেশীকে বলে 'বিদেশী শয়তান'। ইউরোপীয়দের নাক চীনাদের তুলনায় লম্বা ; লম্বা নাক চীনাদের মতে শয়তানের লক্ষণ। জাপানীদের সঙ্গে চীনাদের ধর্মের দিক দিয়ে কিছুটা মিল থাকলেও, উভয়ে উভয়কে ঘৃণার চোখে দেখে। জাপানীরা চীনাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রে বলে, ওরা 'আধা-মরা' লোক ; চীনারা জাপানীদের বলে 'বেঁটে চোর', কখনো বলে 'চোর বানর'। ইতিহাসে একটি মজার কথা আছে। ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সম্রাট চীনের সম্রাটের কাছে প্রথম রাজদূত পাঠান। যে চিঠিখানা নিয়ে জাপানী রাজদূত চীনের সম্রাটের হাতে দেন, তাতে

লেখা ছিল—'সূর্যোদয়ের দেশের সম্রাট সূর্যাস্তের দেশের সম্রাটের কাছে চিঠি লিখিছেন।' জাপানীরা বলে, এইটিই যথার্থ মন্তব্য।

এক নজরে দেশের ইতিহাস

চীনদেশের ইতিহাস খুব প্রাচীন, শুধু প্রাচীন বললে ঠিক বোঝা যায় না, কতদিন আগে এর সূত্রপাত। পৃথিবীতে যে কয়টি দেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন তার প্রত্যেকটিই গড়ে উঠেছিল নদীর তীরে—মিশরের সভ্যতা নীলনদের তীরে, ব্যাবিলনের সভ্যতা টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর তীরে, সিন্ধু-সভ্যতা ভারতে সিন্ধুনদের তীরে এবং চীনের সভ্যতা হোয়াং-হো-ইয়াং-সি নদীর তীরে : ব্যাবিলনের সভ্যতা আর সিন্ধুতীরের সভ্যতা প্রায় একই সময়ের ; চীনের সভ্যতা সুরু হয় এই সময়ের কিছু-কাল পরে। পৃথিবীর মানচিত্র নজর করলে একটি মজার তথ্য দেখা যাবে : মানুষের সভ্যতা যেন পশ্চিম দিক থেকে ক্রমে পূর্বদিকে এগিয়ে এসেছে। সিন্ধু-সভ্যতার পরের যুগে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ২৮শত বছর আগে মঙ্গোলজাতির কতক গোষ্ঠী একত্র হয়ে চীনদেশের মধ্যভাগে হোয়াং-হো এবং ইয়াং-সি নদীর অঞ্চলে এক সভ্যতার পত্তন করে।

এর পর এই লোকেরা ক্রমে আশেপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং গড়ে তোলে একটি সাম্রাজ্য। ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মৌর্যযুগ ভারতের ইতিহাসে গৌরবের যুগ ; ঠিক ঐ সময়ে চীনদেশে 'চীন' নামে এক রাজবংশ রাজত্ব করছিল। এই বংশের নাম থেকেই হয়েছে দেশের নাম। চীনবংশের সবচেয়ে নাম-করা সম্রাট হলেন শি-হুয়াং-টি। ইনি মাত্র ১৫ বছর (২২১ থেকে ২০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) দেশ শাসন করেছিলেন, কিন্তু এর মধ্যেই অক্ষয় কীর্তি অর্জন ক'রে গেছেন। রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি চীন সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। ঐ যুগে মধ্য-এশিয়ার মঙ্গোলদের আক্রমণ চীন রাজ্যের পক্ষে ভয়ের

কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মঙ্গোলরা ছিল অতি নিষ্ঠুর এবং অসীম সাহসী। তেজী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তারা দলে দলে এসে হামলা চালাত চীনের নানা জায়গায়। এদের অভিযান ঠেকানোর জন্য সম্রাট শি-হুয়াং-টি মঙ্গোলিয়া থেকে পূবে সাগর পর্যন্ত ১৫ শত মাইল দীর্ঘ ইটের প্রাচীর নির্মাণ করেন। উঁচুনীচু পাহাড়ময় জায়গার ওপর দিয়ে
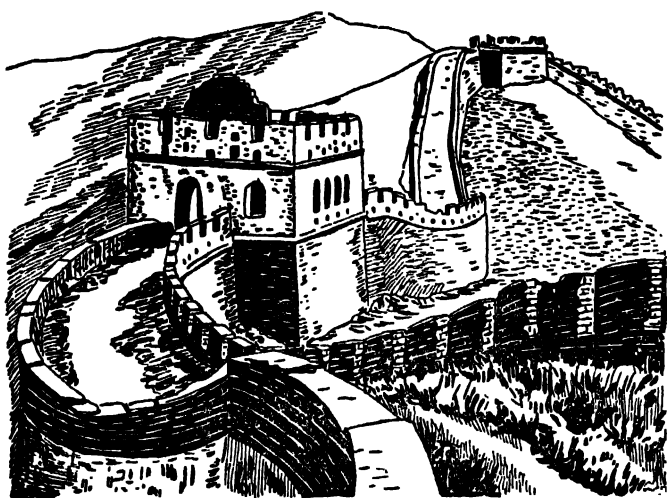
চীনের প্রাচীর

এই প্রাচীর চলে গেছে, মাঝে মাঝে আছে প্রাচীরের ওপরে চৌকোণা পর্যবেক্ষণ-ঘর। সেখান থেকে প্রহরী শত্রুর ওপর নজর রাখত। প্রায় ২২ শত বছরের প্রাচীন চীনের প্রাচীর এখনও মানুষের বিস্ময় জাগায়।

মঙ্গোলদের অধিকারে চীন

শি-হুয়াং-টি মঙ্গোলদের অভিযান থেকে দেশরক্ষার জন্য দেওয়াল গড়েছিলেন, কিছুকাল এদের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল সত্য, কিন্তু অবশেষে চেঙ্গিস খাঁর বিপুল বাহিনীকে কেউ রুখতে

পারল না। মঙ্গোল-নেতা চীনের প্রাচীর ভেদ ক'রে দেশের মধ্যে গিয়ে পৌঁছল, তখনকার সুং রাজবংশ ভেঙে দিয়ে চীনকে এক বিরাট মঙ্গোল সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত করলো। এ হ'ল ত্রয়োদশ শতকের ঘটনা, ভারতে তখন মুসলমান সুলতানদের আমল। চেঙ্গিস খাঁর পুত্র কুবলাই খাঁ ছিলেন চীনের এক বিশেষ নামজাদা সম্রাট। এর পর চীন সাম্রাজ্যের ভাঙা-গড়া চলেছে বহুদিন এবং বহুবার। অবশেষে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সান্-ইয়াৎ-সেন দেশে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন।

চীন-জাপান যুদ্ধ

জাতিহিসাবে চীনারা গর্বিত; বিদেশীকে তারা চিরদিন ঘৃণার চোখে দেখেছে, তাদের দেশে বিদেশীর আগমন তারা পছন্দ করেনি। সমুদ্র-পথ আবিষ্কারের পর ইউরোপের ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতির লোক যখন বাণিজ্য করতে চীনদেশে এসেছিল, চীনারা তাদের সুনজরে দেখেনি, তাদের বাণিজ্য করার অধিকার দিতেও রাজী ছিল না; কিন্তু এই বিদেশীরা চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জোর ক'রেই বাণিজ্যের অধিকার আদায় ক'রে নিয়েছে এবং যুদ্ধ ক'রে সমুদ্রের উপকূলের কতক বন্দর এবং কিছু অঞ্চল নিজেদের দখলে নিয়েছে।

চীনের দুর্বলতার সুযোগে জাপানও যুদ্ধে চীনকে পরাজিত ক'রে তার ভূমি দখল ক'রে নিয়েছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সঙ্গে চীনের তৃতীয় যুদ্ধ সুরু হ'ল। আধুনিক অস্ত্র ও যুদ্ধের কৌশলে বলশালী জাপান চীনকে গ্রাস করার জন্য দীর্ঘদিন ধ'রে যুদ্ধ চালায়। চীনের রাজধানী পিকিং শহর জাপানীরা অধিকার ক'রে নেয়। চীনারা মরীয়া হয়ে জাপানকে ঠেকানোর চেষ্টা করে, ২০ লক্ষের বেশি চীনা এই যুদ্ধে নিহত হয়। এই যুদ্ধ চলতে চলতেই সুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তখন মিত্রশক্তি—আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া—দাঁড়ায়

জাপানের বিরুদ্ধে। অবশেষে আমেরিকা আণবিক বোমা ফেলে হিরোশিমা ও নাগাসাকি ধ্বংস ক'রে ফেললে জাপান পরাজয় স্বীকার করে, জাপানের হাত থেকে চীন রক্ষা পায়।

জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কুওমিন্‌টাং অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী দলের নেতা চিয়াং-কাই-শেক ছিলেন নায়ক। যুদ্ধের পর তিনি বিদেশীর আক্রমণ থেকে রেহাই পেলেন বটে, কিন্তু দেশের মধ্যে সুরু হ'ল গৃহযুদ্ধ। কমিউনিস্ট দল ক্রমে কুওমিন্‌টাং দলকে হটাতে হটাতে চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে সরিয়ে দিল। চিয়াং-কাই-শেক ফরমোজা ও তার আশে-পাশে কয়েকটি ছোট দ্বীপে তাঁর অধিকার আজ পর্যন্ত বজায় রেখেছেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে স্থাপিত হয়েছে কমিউনিস্ট-শাসন।

কমিউনিস্ট চীন অল্পকালের মধ্যে দেশে বিরাট পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে। বড় বড় কল-কারখানা গড়ে তুলে দেশকে যন্ত্রশিল্পে উন্নত করার উদ্যম চলেছে, সমবায় প্রথায় কৃষি-খামার গড়ে তুলে চাষের ফসল বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষিপ্রধান পুরাতন চীনের স্থানে শিল্পপ্রধান নূতন চীন গড়ার প্রয়াস চলেছে। মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি, অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনের প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি পাল্‌টে যাচ্ছে।

কমিউনিস্ট চীনের মনোভাব এশিয়ার এক সমস্যার সূচনা করেছে। বহুদিন চীনদেশটি ছিল অরাজকতা, দুর্নীতি এবং বাইরের শক্তিমান রাষ্ট্রের শোষণের ফলে দুর্বল। নূতন শক্তিলাভের উন্মাদনায় নয়াচীন নূতনভাবে রাজ্য-বিস্তারে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। কৌশলে সে তিব্বতে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে জোর ক'রে দেশটি দখল করেছে। ভারতের সঙ্গে চীনের চিরদিনের মিত্রতার সম্পর্ক ছিল। শান্তিকামী ভারত তার প্রতিবেশীদের কল্যাণই কামনা করে। কমিউনিস্ট চীন প্রথম ভারতের সঙ্গে পরস্পর শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার নীতিতে

পঞ্চশীল গ্রহণ করে। উভয় দেশের মধ্যে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু চীন বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে চুপিচুপি ভারতের হিমালয় অঞ্চলে অনেকখানি জায়গা দখল ক'রে বসেছে, তার অজুহাত চীনের প্রাচীন মানচিত্রে নাকি ঐ অঞ্চল চীনের ব'লে দেখানো আছে। চীনের এই আচরণ সৎ প্রতিবেশীর আচরণ নয়। ঐতিহাসিক দলিলপত্র দিয়ে ভারত সরকার প্রমাণ করেছেন যে, চীনের দাবি অন্যায় এবং একেবারেই যুক্তিহীন। শান্তিপ্রিয় অথচ নিজের পুণ্য ভূমি রক্ষায় দৃঢ়সংকল্প ভারত এই কামনা করে যে, চীন তার ভুল বুঝে ভারতের জমি ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে যাবে নতুবা এই ঘটনা দুই দেশের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ হয়ে থাকবে এবং দুইটি জাতির মনোমালিন্য ইতিহাসে বিপদের সংকেত বহন করে।

পাকিস্তান

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তারিখের আগে পৃথিবীতে পাকিস্তান ব'লে কোন দেশ ছিল না। যে-অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়েছে, তা ছিল ভারতবর্ষের অংশ। ভারতবর্ষে সাত শত বছরেরও আগে মুসলমানগণ বাইরে থেকে এসে রাজ্য স্থাপন করেছিল। তাদের ধর্ম ও ভাষা ছিল হিন্দুদের থেকে পৃথক। উভয়ে উভয়কে প্রভাবিত ক'রে বসবাস করছিল। ইংরেজ আমলের শেষদিকে ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার কামনা প্রবল হয়ে ওঠে। এই স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করে ভারতীয় কংগ্রেস। প্রথমদিকে মুসলমানগণও ছিল কংগ্রেসের সমর্থক। পরে কূটনীতিক ইংরেজ কংগ্রেসকে হীনবল করার জন্য মুসলমানদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে, গঠিত হয় মুসলিম লীগ। মহম্মদ আলি জিন্না ছিলেন মুসলিম লীগের প্রধান নায়ক। মুসলিম লীগের দাবি হ'ল : যেহেতু ভারতবর্ষে হিন্দুদের সংখ্যাই বেশি এবং তাদের ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতি মুসলমানদের থেকে পৃথক,তাই ভারতকে ভাগ ক'রে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠন ক'রে দিতে হবে। কংগ্রেস প্রথমে হিন্দু ও মুসলমানকে দুই জাতি ব'লে মেনে নেয়নি, কিন্তু দেশে সাম্প্রদায়িক গোলমাল ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা বেধে যায়, প্রায় ১০ হাজার লোক নিহত হয়। দেশে এইরূপ রক্তপাত ও অশান্তির ভাব দেখে কংগ্রেস দেশ-বিভাগে রাজী হয় ; ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ইংরেজ-শাসনের অবসান ঘটে, গঠিত হয় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান।

পাকিস্তানের আয়তন ৩ লক্ষ ৬৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৮ কোটি ৬০ লক্ষ।

দেশটি কেমন

ভারতের দুই প্রান্তের দুটি অঞ্চল নিয়ে এই পাকিস্তান গঠিত এবং এ-অঞ্চল দুটির ভূমির প্রকৃতি, জলবায়ু ও বাসিন্দাদের জীবনযাত্রায় মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি। তাছাড়া দুটি অঞ্চলের মধ্যে দূরত্ব প্রায় এক হাজার মাইল। ভারতের পূর্ব অংশে পূর্ববঙ্গ ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান এবং ভারতের পশ্চিম অংশে পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুনদের পশ্চিমের বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান। মাঝখানে ভারত, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে স্থলপথে সংযোগ নাই। পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্র আর একটিও নাই, যার এক অংশ অন্য থেকে এতখানি তফাৎ।

পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে আয়তনে প্রায় ৬ গুণ বড়, কিন্তু লোকসংখ্যা পূর্ববঙ্গেই সারা পাকিস্তানের অর্ধেকের বেশি। পূর্ববঙ্গ বাঙালীর বাসভূমি; দেশ-বিভাগের সময় ও পরে অনেক বাঙালী হিন্দু ভারতে চলে এসেছে; তবু এখনও পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। পূর্ব-পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। দেশটি সমতল, নদীর পলিমাটিতে উর্বর, মৌসুমি বায়ুতে ভেসে-আসা মেঘ দেশের মধ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত করে। দেশের ওপর দিয়ে হাওয়াই-জাহাজে ক'রে যেতে মাঠ দেখা যায় সবুজ। মখমলের গালিচার মতো বিছানো, নদী-নালাকে মনে হয় আঁকাবাঁকা রূপালি সুতা।

পূর্ব-পাকিস্তান কৃষিপ্রধান দেশ। পাট এবং ধান প্রধান উৎপন্ন ফসল। পৃথিবীর মোট পাট উৎপাদনের শতকরা ৯৮ ভাগ পাট হয় এদেশেই। মাটি কোমল, গুমোট আবহাওয়া, বৃষ্টি বেশি, বর্ষার জল দাঁড়ায় জমিতে; এইরূপ অবস্থা পাটচাষের পক্ষে অনুকূল। ধান এদেশে যা উৎপন্ন হয়, তা দেশের লোকের চাহিদা মেটাতেই লাগে।

পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমি অন্য ধরনের। সিন্ধুনদের অববাহিকায় রয়েছে নীচু সমভূমি, কিন্তু এছাড়া দেশের অন্য অঞ্চল পাহাড়ময় এবং উঁচুনীচু মালভূমি। পশ্চিম পাকিস্তানের খুব কম অংশে বছরে বৃষ্টিপাত হয় ২০ ইঞ্চির বেশি, অধিকাংশ জায়গাতেই বৃষ্টির পরিমাণ ৫ ইঞ্চিরও কম। সিন্ধুর পূর্বধারে দীর্ঘ মরুভূমি, এর বালিয়াড়ি অনেকদূর পর্যন্ত ঢেউয়ের মতো উঁচুনীচু হয়ে গেছে; পশ্চিমধারে বেলুচিস্তানের পাষাণময় অঞ্চল, কোথাও কোথাও পাঁচ হাজার ফুটের বেশি উচ্চ। সিন্ধু উপত্যকার পশ্চিম দিক দিয়ে গিরিশ্রেণী বিরাজিত রয়েছে, উত্তরে হিন্দুকুশ মাঝখানে সুলেমান পর্বত, দক্ষিণে কিরথার শৈলমালা। সুলেমান পর্বতের কাছে বোলান গিরিপথ, এখানে দিয়ে ইরাণে যাওয়া যায়; উত্তর অংশে খাইবার গিরিপথ, এ পথ দিয়ে যাওয়া যায় আফগানিস্তানের দিকে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই দুটি গিরিপথ, বিশেষ ক'রে খাইবার পথ ভারতে আসার এবং ভারত থেকে যাওয়ার প্রধান স্থলপথ হয়ে আছে। এ পথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলেছে, বিদেশীরা এসেছে এই পাহাড়ি পথ দিয়ে।

পূর্ব-পাকিস্তানে বৃষ্টিপাত বেশি কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে কম। এখানে সিন্ধুনদের জল খাল দিয়ে জমিতে সেচন ক'রে ফসল ফলানো হয়। ভূমি উর্বর; গম, তূলা, বাজরা প্রচুর উৎপন্ন হয়। পাকিস্তানে মাঝারি ও দীর্ঘ আঁশের উৎকৃষ্ট তূলা জন্মে। সিন্ধুর পশ্চিমে উচ্চভূমি অংশে চাষ-আবাদের কাজ চলে না। এ-সব অঞ্চলে যাযাবরদের বাস; তারা পাহাড়ের উপত্যকায় ও উঁচু অংশে মেষ চরিয়ে জীবিকা অর্জন করে। বেলুচিস্তান এবং পশ্চিম সীমান্তের লোকেরা মেষ পালন করে; পশম বিক্রি ক'রে তারা যে টাকা পায় তাই তাদের প্রধান সম্বল।

লোকের জীবনযাত্রা

পাকিস্তান চাষ-আবাদের দেশ; এর মাটি ও জলবায়ু কৃষির পক্ষে উপযোগী। বৃহৎ যন্ত্রশিল্প চালু ক'রে দেশকে শিল্পপ্রধান করতে হলে

দেশেই প্রচুর কয়লা ও লোহা থাকা চাই কিন্তু পাকিস্তানে এ-দুটি জিনিসেরই অভাব। বিদেশে থেকে কাপড়, যন্ত্রপাতি, যানবাহন আমদানি করতে হয়; জাপান, যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকা হ'ল সরবরাহ-কারী দেশ। পাকিস্তানে গন্ধক, ক্রোমাইট, অ্যান্টিমনি, অ্যাসবেসটস প্রভৃতির খনি আছে কিন্তু এ-সব খনি থেকে তুলে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হয়নি। ইদানিং পূর্ববঙ্গে পাটকল ও কিছু কাপড়ের কল স্থাপন ক'রে শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা চলেছে।

কুটীরশিল্পের কাজের ভিতর দিয়ে অনেক লোক তাদের জীবিকা অর্জন করে। এর মধ্যে প্রধান হল তাঁতের কাজ, গালিচা বোনার কাজ, বাঁশ-বেত-কাঠের কাজ, সোনারূপা ও লোহার কাজ, পিতল-কাঁসার বাসন-কোসন তৈরির কাজ, চামড়ার কাজ। শিয়ালকোটে টেনিস-র‍্যাকেট ও খেলার অন্যান্য উৎকৃষ্ট সরঞ্জাম তৈরি হয়। এগুলি ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকাতে রপ্তানি হয়ে থাকে। বাংলাদেশের হাতির দাঁতে কারুকার্য সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। কৃষি, পশুপালন, কুটীরশিল্প ছাড়াও নদী ও সমুদ্র থেকে মাছ ধরা কতক লোকের উপজীবিকা। সমুদ্রের ধারের শহরের লোকেরা সমুদ্রের মাছের ওপরই বেশি নির্ভর করে; সমুদ্রে মাছও মেলে প্রচুর।

গবর্ণমেণ্ট

ভূমিকম্পের দরুন কখন কখনও ভূপৃষ্ঠে পরিবর্তন ঘটে; হয়ত কোন অঞ্চল মাটির নীচে ব'সে যায়, কোন নূতন ভূমিখণ্ড হয়ত সমুদ্রের মধ্য থেকে জেগে ওঠে। এমনি রাজনৈতিক ভূমিকম্পের ফলে পাকিস্তানের উৎপত্তি। যে মানসিক উত্তেজনা, আন্দোলন, হিংসা ও কলহের মধ্যে এই নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব, তার প্রভাব রয়ে গেছে দেশের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে। মুসলমানগণ এক পৃথক ধর্ম ও জাতির লোক। এই নীতির ওপর ভিত্তি ক'রে পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন সুরু হয়,

এই বৈষম্যকে প্রধান ক'রে তুলে অশিক্ষিত গোঁড়া জনসাধারণকে উত্তেজিত করা হয়। কাজেই নূতন রাষ্ট্র যখন গঠিত হ'ল, সাধারণ লোকের মনে এই ধারণা হ'ল যে, মুসলমানদের জন্য ইস্‌লামিক রাষ্ট্রের পত্তন, সেখানে অমুসলমানদের সমান নাগরিক অধিকার থাকবে না।

কিন্তু পাকিস্তানে মুসলমানের সঙ্গে বহু হিন্দুও বসবাস করে। ধর্মের জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করায়,হিন্দুদের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে, বহু হিন্দু দলে দলে ভারতে চ'লে আসে তাদের ধন-সম্পত্তি ফেলে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক অনিশ্চিত অবস্থা এবং হিন্দুদের প্রতি বিরূপ ভাব প্রথমদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে দারুণ শংকার কারণ হয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ভারতে। দেশ-বিভাগের পর হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য দূর হবে এবং দুই রাষ্ট্র শান্তিতে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলতে পারবে, এইরূপ আশা ক'রে হিন্দুগণ অবশেষে খণ্ডিত ভারত পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রথম থেকেই ভারতের উদারতার সুযোগ নিয়ে অশান্তি জিয়িয়ে রাখার কৌশল গ্রহণ করেছে। তাই ভারতের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান আজ পর্যন্ত বন্ধু-প্রতিবেশীতে পরিণত হয়নি।

পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে শাসন-ব্যাপারে কিরকম এলোমেলো ভাব চলেছে, তা বোঝা যায় ঘন ঘন রাষ্ট্রনায়কদের পরিবর্তন থেকে। ১৪ বৎসরের মধ্যে ডজনখানেক রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধান মন্ত্রী অদলবদল হয়েছে। পাকিস্তানকে ইস্‌লামিক প্রজাতন্ত্র ব'লে ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু কিছুদিন পরই সংবিধান বাতিল ক'রে দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইস্‌কান্দার মীর্জা দেশে সকল রাজনৈতিক দল ভেঙে দেন (১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর) এবং সামরিক শাসন চালু করেন। ঐ মাসের ২০শে তারিখে প্রেসিডেন্ট মীর্জার কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করেন জেনারেল আয়ুব খান। গণতন্ত্র বিলুপ্ত, রাজনৈতিক দলের নেতাদের টুঁ-শব্দ

করার জো নাই। অতীতে দুর্নীতিমূলক কাজে জড়িত ছিলেন এই অপরাধে অনেক নেতাকে সামরিক আদালতের কঠোর সাজা মাথা পেতে নিতে হয়েছে। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান ঘোষণা করেছেন, যতদিন দেশ থেকে দুর্নীতি দূর না হচ্ছে ততদিন সামরিক শাসন বলবৎ থাকবে।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক

পুরাণে একটি কাহিনী আছে ঃ বিষ্ণু যখন অনন্ত-শয়নে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন, তাঁর কানের ময়লা থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্যের উৎপত্তি হয়। জন্মের পরই তারা বিষ্ণুকে আক্রমণ করে। ভারতের অংশ-নিয়ে-গঠিত পাকিস্তানও তার জন্মের পরই ভারতের সঙ্গে বিবাদ শুরু করে। দেশীয় রাজ্য কাশ্মীর ভারত-বিভাগের সময় কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দেয় নাই। জোর ক'রে এই রাজ্যটিকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী উপজাতীয় লোকেদের সঙ্গে নিয়ে কাশ্মীর আক্রমণ করে। দেশ যখন বিপন্ন, তখন কাশ্মীরের মহারাজা ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ভারত সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভারতীয় সৈন্যগণ অসীম বীরত্বসহকারে দুর্বৃত্তদের হটিয়ে দেয়, কিন্তু সমগ্র কাশ্মীর পাক-সৈন্যের অধিকার থেকে মুক্ত করার আগেই যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ক'রে বিষয়টির মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রসংঘের দরবারে পেশ করা হয়। সেই থেকে কাশ্মীরে কিছু অংশ পাকিস্তানের দখলে রয়ে গেছে।

কাশ্মীরের মহারাজার ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আবেদন ভারত সরকার গ্রহণ করেছিলেন এই শর্তে যে, দেশে শান্তি স্থাপিত হ'লে গণভোট গ্রহণ ক'রে বিষয়টি পাকাপাকিভাবে নিষ্পত্তি করা হবে। রাষ্ট্রসংঘ নির্দেশ দিয়াছেন, গণভোটের আগে পাকিস্তানকে কাশ্মীর এলাকা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। পাকিস্তান সে-শর্ত পালন করেনি। ইতিমধ্যে ভারতের সঙ্গে যুক্ত কাশ্মীর এলাকায় গণতান্ত্রিক

পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়েছে এবং কাশ্মীরের গণ-পরিষদ্ ভারতে যোগদানের স্বপক্ষ অভিমত প্রকাশ করেছেন। ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে কাশ্মীর পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছে। ওদিকে যুদ্ধ-বিরতি রেখার ওপারে পাক-অধিকৃত এলাকায় ১৪ বছরের মধ্যে একবারও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। পাকিস্তান হয়ত মনে করে, যুদ্ধের হুম্‌কি দেখিয়ে এবং সীমান্তে চুরি-ডাকাতি ও গোলমাল সৃষ্টি ক'রে কাশ্মীর অধিকার ক'রে নেওয়া যাবে। এ-পথে যে মঙ্গল হবে না, পাকিস্তান হয়ত এখনো তা সম্পূর্ণ বোঝেনি।

ভারতের সামরিক শক্তি যে পাকিস্তানের চেয়ে অনেকগুণ বেশি, পাকিস্তান তা জানে এবং জানে বলেই বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক'রে নিজের বল বাড়ানোর চেষ্টায় আছে। ভারত নিরপেক্ষ থাকার নীতি গ্রহণ করেছে; রাশিয়া বা আমেরিকা কোন শক্তিজোটেই সে যোগদান করেনি। কিন্তু পাকিস্তান দুটি সামরিক চুক্তির অংশীদার—একটি হ'ল সিয়াটো অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা চুক্তি, অন্যটি বাগদাদ চুক্তি। এই সামরিক-গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য কমিউনিজ্‌মের প্রসার বন্ধ করা। সামরিক-গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে পাকিস্তান আমেরিকার কাছ থেকে দান হিসাবে প্রচুর যুদ্ধের অস্ত্র ও সরঞ্জাম পেয়েছে, অবশ্য যদি কখনো রাশিয়ার সাথে আমেরিকার যুদ্ধ বাধে তখন পাকিস্তানে আমেরিকান সৈন্যের ও বিমানের ঘাঁটি দিতে হবে। পাকিস্তানের জনসাধারণ সামরিক-জোটে যোগ দেওয়ার পক্ষপাতী কিনা, তা যাচাই ক'রে দেখা হয়নি। ওদেশে জনসাধারণের মনের কথা মনেই চেপে রাখতে হয়, সরকারের সমালোচনা করলেই বিপদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক; ভারতের শিল্প ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য ভারতকে সে অর্থঋণ দিয়ে সাহায্য করছে। পাকিস্তানকে যুদ্ধের অস্ত্র দেবার সময় সে এই শর্ত আরোপ করেছে যে, ভারতের বিরুদ্ধে ঐ সব অস্ত্র ব্যবহার করা

চলবে না। পাকিস্তান হয়ত ভাবে, অস্ত্র যদি হাতে থাকে, কখন্ এবং কিভাবে প্রয়োগ করা হবে তা ঠিক করবে তো সে নিজে !

পাকিস্তান ভারতের অতি-নিকট প্রতিবেশী। শুধু তাই নয়, দুই দেশের জনগণের মধ্যে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির অনেক মিল রয়েছে। উভয় রাষ্ট্র বন্ধুভাবে বসবাস করলে উভয়েরই মঙ্গল কিন্তু এ পর্যন্ত পাকিস্তান যে নীতি অনুসরণ ক'রে এসেছে, তাতে মনে হয় কোন-না-কোন অজুহাতে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ তাজা রাখাই তার উদ্দেশ্য।

ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই জমিতে জলসেচনের প্রয়োজন হয়; সেজন্য পাঞ্জাবের ভিতর দিয়ে যে নদীগুলি প্রবাহিত তাদের জল লোকেদের জীবনস্বরূপ। খালের জলের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যে বিরোধ ছিল, বিশ্বব্যাঙ্কের সালিশিতে তার রফা হয়েছে। ভারত পাকিস্তানের প্রতি যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছে। প্রধান মন্ত্রী নেহরু বহুবার ঘোষণা করেছেন যে, পাকিস্তান সমৃদ্ধ উন্নত হোক ভারত তাই কামনা করে কিন্তু পাকিস্তান ভারত সম্বন্ধে যে এরূপ কামনা করে তার কোন কথা শোনা যায়নি। ভারতের সীমানা পার হয়ে এসে পাকিস্তানী হানাদাররা ভারতীয় নাগরিকদের গরু-মোষ চুরি ক'রে নেয়, ভারতীয় কৃষকের জমির ফসল চুরি ক'রে কেটে নেয়, পাকিস্তানে যে সব হিন্দু বসবাস করছে তাদের জীবন ও সম্মান হানি করে। এরূপ ছোট ছোট সূচের খোঁচা বিরক্তিকর এবং ভারতীয়দের মনে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলে। তবে ভারতীয়েরা এটা আশা করে যে, পাকিস্তানে ভবিষ্যতে যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনসাধারণ খোলাখুলিভাবে মনের কথা বলতে পারে, তবে দুই দেশের মনকষাকষি দূর হয়ে যাবে ; কারণ সাধারণ মানুষ রাজনীতির প্যাঁচ বোঝে না, তারা সুখে-শান্তিতে বাস করতে চায়, তাদের মনে ভারতের প্রতি শুভেচ্ছার অভাব নাই।

———

আফগানিস্তান

এশিয়া মহাদেশের মানচিত্রে আফগানিস্তানের দিকে তাকালে মনে হয়, বিরাট আকারের একটি কচ্ছপ আরব সাগর থেকে উঠে মধ্য-এশিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে; তার প্রসারিত গলা গিয়ে পৌঁচেছে ভারতের সবচেয়ে উত্তর সীমায় পামির মালভূমির ওপর। পামির পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতর মালভূমি—একে বলা হয় 'পৃথিবীর ছাদ'। এটি যেন হিমালয় পর্বতমালার একটি পাকানো-জট, এখান থেকে পর্বতের শাখা কয়েক দিকে ছড়িয়ে গেছে—কারাকোরাম, আলতাই, তিয়েনসিন, হিন্দুকুশ। অনেকগুলি দড়ি একত্র ক'রে গাঁট বেঁধে তার প্রান্তগুলি নানা দিকে টেনে দিলে যেমন দেখতে হয়, পামির গ্রন্থি ও সেখান থেকে ছড়িয়ে-পড়া পর্বতশাখাগুলি তেমনি। এখান থেকে হিন্দুকুশ পর্বত দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে ধনুকের মতো বেঁকে আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে পশ্চিমে এশিয়া মাইনরের দিকে চলে গেছে। হিন্দুকুশ ও তার শাখা-প্রশাখা আফগানিস্তানের মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়ে দেশকে করেছে অসমতল। টেবিলের ওপর কাপড় বিছিয়ে দিয়ে দু'হাত দিয়ে দুদিক থেকে চাপ দিয়ে সরিয়ে দিলে যেমন কুঁচকে ভাঁজ হয়ে যায়, আফগানিস্তানের ভূমি-প্রকৃতি কতকটা তেমনি উঁচুনীচু, ঢেউ-খেলানো।

[আফগানিস্তানের আয়তন ২ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গমাইল, লোক-সংখ্যা (১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবমতো) ১ কোটি ২০ লক্ষ।]

দেশটি কেমন :

দেশ-বিভাগের আগে ভারতবর্ষের সঙ্গে আফগানিস্তানের সীমানা দীর্ঘ এলাকা জুড়ে সংলগ্ন ছিল। এখন শুধু কাশ্মীরের উত্তর সীমায় আফগানিস্তানের সীমানা ভারতের ভূমির সঙ্গে যুক্ত। অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক। অশোকের

রাজত্বকালে এদেশটি ভারতের অংশ ছিল। তখন দেশবাসীরা ছিল বৌদ্ধ; বৌদ্ধ মঠমন্দিরও স্থাপিত হয়েছিল। স্থলপথে যত বিদেশী ভারতে অভিযান করতে এসেছিল, তাদের প্রায় সকলেই এসেছিল আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে, খাইবার গিরিপথ পার হয়ে। কাজেই সে-যুগে আফগানিস্তান ছিল ভারতে প্রবেশের সদর দরজার মুখে।

আফগানিস্তানের দক্ষিণ অংশে পাষাণময় মরু অঞ্চল। সেখানে থেকে ভূমি ক্রমে উঁচু হয়ে এসে উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বতে মিশেছে। উত্তরের গিরিশ্রেণী বিশাল প্রাচীরের মতো। তা পার হয়ে উত্তর দিকে যাওয়া সম্ভবপর নয়। কতক পর্বত-চূড়া খাড়া বর্শাফলকের মতো, প্রায় ২৪ হাজার ফুট উঁচু। গিরিপথ যা আছে তাও ৯ হাজার ফুটের নীচে নয়, বারো মাস বরফে ঢাকা থাকে; তাতে রয়েছে হিমবাহ। জলবায়ু বিচিত্র রকমের। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে গরম ও ঠাণ্ডার তারতম্য তো হয়ই, তাছাড়া দিন ও রাত্রির মধ্যেও উত্তাপের অনেকখানি পার্থক্য ঘটে।

গরমের দিনে তাপমাত্রা কখনো ১১২ ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠে, কাজেই তখন বেশ উষ্ণ; কিন্তু শীতকালে শীতের তীব্রতা হয় দারুণ। উত্তরের পাহাড় দিক থেকে নিদারুণ কন্‌কনে হাওয়া উপত্যকার ওপর দিয়ে প্রবল বেগে গর্জন ক'রে বইতে থাকে। নদী ও ঝরনা বরফের স্তর হয়ে যায়, ঘরের জলও শক্ত ইটের মতো হয়ে পড়ে; তাপমাত্রা নেমে যায় শূন্য ডিগ্রিরও নীচে। আবার এর বিপরীত অবস্থা ঘটে গ্রীষ্মকালে। এই সময় পশ্চিম দিক থেকে গরম বাতাস ঘণ্টায় প্রায় ১১০ মাইল বেগে প্রবাহিত হয়, তার ফলে আফগানিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা বাতাসে আগুনের হল্‌কার মতো উত্তাপ অনুভব করে। সারাদেশে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম; নীচু অংশে বছরে ৭ ইঞ্চি, কাবুলে বছরে ১৩ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়ে থাকে। শীতকালে যে বরফ পড়ে, সেই বরফ-গলা জলে নদী পুষ্ট হয়।

নদনদী

আফগানিস্তান নদনদীর দেশ নয়। শ্যামল সমতল শস্যক্ষেতের দেশও নয়। এর নদীগুলি উপত্যকার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত। প্রধান নদী হেল্‌মান্দ্, তার শাখানদী হ'ল আর্ঘানদার, হরিরুদ, মুর্ঘাব আমু। আফগানিস্তানের কোন নদীতেই নৌকা চালানো যায় না।

আফগান জাতি

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক আফগানিস্তানে ভিতর দিয়ে ভারতের দিকে এসেছিল। এরা প্রথমে আফগানিস্তানে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল, তারপর অগ্রসর হয়েছিল ভারত সীমান্তের দিকে। কাজেই বর্তমান আফগানিস্তানের যারা অধিবাসী তারা সবাই একই জাতির লোক নয়; সবাই নিজেদের আফগান ব'লেও পরিচয় দেয় না। দেশে রয়েছে অনেক উপজাতি, কতকের ভাষা পারসী, কতকের পুস্তু। আফগানিস্তানের একটি প্রধান উপজাতি হ'ল দুরাণী, এদের আদিবাস ছিল পারস্যে। এছাড়া আছে ঘিলজাই, তাজিক, উজ্‌বেক, আইমাক, কাফির প্রভৃতি। ঘিলজাইরা তরবারি-চালনায় খুব পটু। কাফিররা হ'ল সেই আফগানদের বংশধর যারা গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারকে ভারত-অভিযানের সময় সহায়তা করেছিল। এখন কেবল কাফিররাই পূর্বপুরুষের উপাসক; অন্য সবাই মুসলমান।

আফগানরা বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায়। টিকালো এদের নাক, চুল কালো ও লম্বা। কথায় বলে—আফগানকে জীবনে দুবার স্নান করানো হয়। জন্মের ঠিক পরেই একবার, কবর দেবার ঠিক আগে আর একবার।

আফগানদের জাতীয় পোষাক হ'ল ঢিলা পায়জামা, সার্ট; তার ওপর গায়ে-আঁটা ওয়েস্টকোট, তাতে প্রায়ই নক্সা-কাটা; সবার

ওপর দীর্ঘ বড় আলখাল্লা। মাথায় পরে কুল্লা অর্থাৎ মাথার চাঁদি-ঢাকা টুপি, তার ওপর জড়ায় পাগড়ি। পাগড়ির এক প্রান্ত পিঠের ওপর ঝুলে পড়ে। গরীব লোকেরা খালি পায়েই থাকে, কখনও বা ঘাসের-তৈরি স্যাণ্ডেল পরে। ধনীরা পরে কারুকার্য-করা চামড়ার জুতা ও চটি।

গ্রাম ঘুরে দেখি

আমাদের দেশের পল্লী যেমন, আফগানিস্তানে তেমন পাড়াগাঁ দেখতে পাওয়া যাবে না। দেশের মধ্যে পাহাড় আর তার মাঝে মাঝে নীচু উপত্যকা। এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে, এক উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকায় যেতে অনেক ঘোরা পথ পার হতে হবে। কোন গ্রামেই লোকসংখ্যা বেশি নয়; পাঁচ-ছয়টি পরিবার নিয়েই একটি গ্রাম গঠিত হ'তে পারে; আবার যেখানে তিনশো পরিবার আছে সেটাই একটা শহরের মতো।

গ্রামের সাধারণ বাড়িঘর ইট ও মাটি দিয়ে তৈরি, ছাদ সমতল। মই দিয়ে ছাদে ওঠা যায়; বাসিন্দারা গরমকালে রাত্রিতে ছাদে ঘুমায়। ঘরের জানালায় কাচ নাই, দরজা-জানালা মোটা কাঠ দিয়ে তৈরি। রান্নাঘর প্রধান ঘরের পিছন দিকে ছোট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, পৃথক করা। লোকেদের সাধারণ আসবাব-পত্র হ'ল—দড়ির খাটিয়া, গম পেষার জন্য হামানদিস্তা, মাটির উনান, মাংস রান্না করার একটি পাত্র আর রুটি সেঁকার জন্য লোহার একটি পাত।

আফগানরা সাহসী ও অত্যন্ত পরিশ্রমী। যুদ্ধ মারামারি দেখে এরা ডরায় না। প্রতিটি গ্রাম এক একটি দুর্গের মতো। এক উপজাতির লোকের সঙ্গে অন্য দলের প্রায়ই বিবাদ বাধে। সুযোগ পেলেই একদল অন্য দলের গ্রাম আক্রমণ করে ছাগল, ভেড়া ও অন্যান্য সম্পত্তি লুঠপাঠ ক'রে নিয়ে যায়। প্রতিটি আফগানকে তাই প্রাণ নেবার ও

দেবার জন্য তৈরি থাকতে হয়। দেশে মাঝে মাঝে পাহাড়ের ওপর দেখা যায় পাথরের ছোট ছোট কেল্লা আর নজরখানা—পাহাড়ের ওপর তৈরি উঁচু ঘরের মতো; তার মধ্যে থেকে গ্রামের চারপাশে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। শত্রুকে আসতে দেখলে গ্রামবাসীকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়। তারা তখন খান অর্থাৎ সর্দারের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে।

আফগানিস্তানের লোক কাবুলিওয়ালাদের পরিচয় আমাদের অনেকেরই জানা আছে। কেউ কেউ সুদূর বাংলাদেশের শহরে এবং পল্লীতেও টাকা লগ্‌নি কারবার ক'রে থাকে। আফগানিস্তানের ভিতর এমন কতক উপজাতি আছে যারা কোথাও নির্দিষ্টভাবে বসবাস করে না, তারা যাযাবর; ভেড়া ছাগল নিয়ে পাহাড়ের গায়ে, উপত্যকায় চরিয়ে বেড়ায়। আফগানরা অত্যন্ত প্রতিহিংসা-পরায়ণ, কেউ অন্যায় করলে এরা তা ভোলে না এবং প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত মনে রোষপোষণ করে। আবার, এদের চরিত্রের অন্য বৈশিষ্ট্য হ'ল এদের অতিথির প্রতি আদরযত্ন ও রসিকতা। শত্রুও যদি এদের বাড়ির অতিথি হয় এরা তার সমাদর করে, তখন সে বন্ধু। এরা সাহসী যোদ্ধা; বিদেশীর কাছে অনেক সময় এরা নিষ্ঠুর হিংস্র ব'লে মনে হতে পারে কিন্তু এদের সঙ্গে মিশলে দেখা যাবে আফগানরা বন্ধুবৎসল, হাসি-খুশিতে ও সরস রসিকতায় সহজেই বন্ধুতে পরিণত হয়।

আফগানদের জীবনযাত্রা

আফগানিস্তান সুজলা দেশ না হলেও এর ভূমি—বিশেষ ক'রে হিন্দুকুশের উত্তরের পলি অঞ্চল এবং পূর্ব ও দক্ষিণ অংশের ভূমি বেশ উর্বর। এই সব অঞ্চলে এবং উপত্যকায় যেখানে জল মেলে, জমিতে জলসেচ করা যায়, সেখানেই ফসল ফলে প্রচুর। আফগানিস্তান কৃষিপ্রধান দেশ। তবে চাষের যোগ্য ভূমি খুব বেশি নাই। মোট

২ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গমাইল দেশের মাত্র ২০ হাজার বর্গমাইল জমিতে চাষ-আবাদ হয়, অবশিষ্ট স্থান জুড়ে রয়েছে মরুভূমি ও পাহাড়পর্বত।

আফগান চাষীরা রীতিমত পরিশ্রমী। কৌশল ক'রে জমিতে জলের ধারা প্রবাহিত ক'রে শস্যকে সতেজ ক'রে তোলে। ঘিলজাই চাষীরা জানে 'কারেজ' অর্থাৎ মাটির তলা দিয়ে জলের খাল তৈরি করে জমিতে জলসেচের কৌশল। আধুনিক ধরনের জলসেচ প্রণালীরও প্রবর্তন হয়েছে কতক অঞ্চলে।

আফগানরা ফল ও মাংস বিক্রি করছে

চাষীরা বছরে দু'বার ফসল ফলায়—বসন্তকালে গম, যব, ভুট্টা; হেমন্তকালে ধান, জোয়ার, তামাক, ভেরেণ্ডা। কাবুল ও কান্দাহারের কাছে সব্‌জি ক্ষেত দেখা যায় প্রচুর। এখানকার তরমুজ যেমন বড়

তেমনি সুমিষ্ট। আফগানিস্তান ফলের দেশ। ফলের বাগানগুলি বসন্তকালে মুকুলে ভরে যায়। আঙ্গুর, বেদানা, ন্যাসপাতি, আখরোট ডুমুর কত রকমের ফল। অনেকের পক্ষে এই বিবিধ ফলই সারা বছরের প্রধান খাদ্য। কিসমিস, বেদানা, পেস্তা, আখরোট প্রভৃতি ফল বিদেশে রপ্তানি হয় প্রচুর পরিমাণে। মালবেরি উৎপন্ন করা হয় প্রচুর; কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা বাদামের সঙ্গে চূর্ণ ক'রে এ দিয়ে 'তুল্‌চান' অর্থাৎ পিঠা তৈরি ক'রে রাখে শীতকালে খাওয়ার জন্য।

কৃষির সঙ্গে অন্য প্রধান উপজীবিকা হ'ল পশুপালন। ছাগল, ভেড়া, দুম্বা আফগানদের মূল্যবান সম্পদ। দুম্বা একজাতীয় ভেড়া, এর লেজে চর্বি জমতে জমতে অনেক বড় হয়ে পড়ে। ছাগল, ভেড়া, দুম্বার মাংস অধিবাসিদের খাদ্য; দুম্বার লেজের চর্বি মাখনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। ছাগল-ভেড়ার চামড়া ও পশম থেকে তৈরি হয় পোষাক। আফগানিস্তানের তৃণভূমি অঞ্চল তৃণভোজী প্রাণীর বিচরণ-ক্ষেত্র। এখানকার ঘোড়া উৎকৃষ্ট এবং বহুসংখ্যায় পালিত হয়। বিদেশে ঘোড়া বিক্রি ক'রে আফগানরা অর্থ উপার্জন ক'রে থাকে। এদের আর একটি প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হ'ল মেষের চামড়া। বছরে প্রায় ৫৬ লক্ষ মেষচর্ম বিদেশে রপ্তানি হয়। পশম দিয়ে তৈরি হয় অতি উৎকৃষ্ট ধরনের কার্পেট, কম্বল ও ফেল্ট্‌। মেষের সঙ্গে আফগানদের জীবনের যোগ নিবিড়—মাংস হয় খাদ্য, পশম হয় শিল্পকাজের উপাদান, চামড়া হয় বিদেশের অর্থ অর্জনের সামগ্রী আর মেষের দুধ থেকে হয় মাখন ও ঘি।

বন-সম্পদ

আফগানিস্তানের পাহাড়ময় অঞ্চলে মূল্যবান কাঠের বন আছে। ছয় হাজার থেকে দশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছের সুশ্রী, সতেজ, ঘন বন—পাইন, ওয়াল্‌নাট, হেজেল, ইউকাঠের বন।

গাছগুলি দীর্ঘ, শক্তিশালী। পশ্চিমদিকের শুকনো মালভূমি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে বাবলাজাতীয় গাছ; এর আঠা থেকে তৈরি হয় ধূপ। আফগানিস্তানে নানাজাতের ঔষধ গাছগাছড়া মেলে; এ-সব থেকে মানুষের পক্ষে উপকারী ঔষধপত্র তৈরি হয়। এদেশ থেকে উৎকৃষ্ট হিং ও ধূপ ভারতে রপ্তানি হয়ে থাকে।

খনিজ দ্রব্য

আফগানিস্তানে মূল্যবান খনিজ দ্রব্যের পরিমাণ কম নয়। সোনা, রূপা, তামা, লোহা, কয়লা, সীসা, গন্ধক আছে প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনিজ পদার্থ মাটির তলা থেকে তোলা এবং কাজে লাগানোর ব্যবস্থা এখনো হয়নি। হিরাটের কাছে পেট্রোলিয়াম পাওয়া গেছে এবং পাঞ্জশের উপত্যকায় রূপার খনির কাজ চলেছে। পাষাণময় দেশে মাটির নীচে যে মূল্যবান পদার্থ সাঞ্চত রয়েছে, তা আহরণ করার ব্যবস্থা করলে আফগানিস্তান যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গবর্নমেন্ট

আফগানিস্তানে রাজতন্ত্র প্রচলিত। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আফগান-রাজা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। জনসাধারণের কোন প্রতিনিধির শাসন-ব্যাপারে মতামত দেবার অধিকার ছিল না। রাজা আমানুল্লা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলন করেন; তবে দেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছনে প'ড়ে আছে ব'লে শাসনের ব্যাপারে সংস্কার চলতে থাকে ধীরে ধীরে। আফগানিস্তানের বর্তমান রাজা নজীর শাহ ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সাক্ষাৎভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ না করলেও রাজপরিবারের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে রাজপরিবারের লোক নিযুক্ত করেছেন; প্রধানমন্ত্রী সর্দার হাসিম খাঁ এবং প্রধান সেনাপতি উভয়েই বর্তমান রাজার কাকা। আফগান

প্রায় সবাই মুসলমান। তাদের দেশের সংবিধান শরিয়ৎ অর্থাৎ মুসলমান-আইনের ওপর ভিত্তি ক'রে রচিত।

দেশে আইন রচনার জন্য আছে একটি জাতীয় সভা (মজ্‌লিস্‌-ই-শুরা-ই-মিলি)। এর ১৩০ জন সদস্য বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। আর একটি মজলিশে আছে ৪৫ জন সদস্য। অভিজাত শ্রেণীর এই সদস্যদের নির্বাচন করেন রাজা। এইভাবে দুইটি পরিষদ্‌—আপার হাউস ও লোয়ার হাউস গঠিত হয়। এছাড়া আর একটি বৃহৎ পরিষদ্‌ আছে, নাম 'লোয়ে জির্গা' ; এর সদস্য একহাজারের বেশি। দেশে কোন জরুরি সংকটজনক অবস্থা দেখা দিলে লোয়ে জির্গার সদস্যগণ সকল প্রদেশ থেকে এসে সমবেত হন। প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই মহা-পরিষদ আহ্বান করা হয়েছিল এবং সদস্যগণ আফগানিস্তানকে যুদ্ধে কোন পক্ষে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ থাকার নীতি গ্রহণ করিয়েছিলেন। আফগানিস্তান ভারতের বন্ধু-রাষ্ট্র। উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান-প্রদানের সম্পর্ক বিদ্যমান আছে।

আফগানিস্তানে রেলপথ নাই। উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে উট ও ঘোড়ার পিঠে মাল বোঝাই ক'রে নিয়ে বণিকের দল বিভিন্ন শহরে যাতায়াত করে। পথে চোর-ডাকাতের ভয় ; পাহাড়ের মধ্যে ডাকাত-দল লুকিয়ে থেকে বণিকের মালপত্র কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। বণিকরা তাই দল বেঁধে হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করে। ইদানীং মোটর চলাচলের উপযোগী ভাল রাস্তা তৈরি হয়েছে, তবু শীত ও বসন্তকালে বরফে এবং বানের জলে এই পথ দুর্গম হয়ে ওঠে।

দেশরক্ষা

তুরস্কের সঙ্গে আফগানিস্তানের প্রীতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক। তুর্কী সামরিক পরামর্শদাতাদের সহায়তা নিয়ে আফগানিস্তান তার সৈন্য-বাহিনী নূতন ক'রে গড়ে তুলেছে। সৈন্যদলে যোগদান নাগরিক-

দের ইচ্ছাধীন; তবে প্রতি এলাকার জন্য যোগদানকারী লোকের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকায় কিছুটা আবশ্যিকভাবেও লোক নেওয়া হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৯০ হাজার; সংকট দেখা দিলে ৩ থেকে ৪ লক্ষ জোয়ানকে অল্প সময়ের মধ্যে সৈন্যবাহিনীতে পাওয়া যেতে পারে এমন ব্যবস্থা আছে। ট্যাংক, সাঁজোয়া বাহিনী, বিমানধ্বংসী কামান প্রভৃতি আধুনিক ধরনের অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যবাহিনীতে নেওয়া হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ থেকে উন্নতধরনের আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র পাওয়ায় আফগানিস্তান সামরিক দিক থেকে বলশালী হয়েছে।

পুস্তুনিস্তান

আফগানিস্তানে বিভিন্ন উপজাতির লোক আছে, এদের একটি হ'ল পুস্তু। এরা খাইবার গিরিপথ এলাকায় বাস করে। আফগান-গোষ্ঠির এই লোকদের সংখ্যা হবে ৬০ লক্ষের মতো। আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সীমা নির্ধারিত হয় ডুরাণ্ড লাইন দিয়ে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যর মর্টিমার ডুরাণ্ড তখনকার ভারতবর্ষের ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমানা ঠিক ক'রে এই লাইন চিহ্ন করেছিলেন। খাইবার গিরিপথ অঞ্চলের পুস্তুন বা পাক্তুনগণ নিজেদের এলাকা স্বাধীন ব'লে মনে করে এবং তাদের দাবি পাকিস্তানের ভিতর যে আরো প্রায় ২০ লক্ষ পুস্তুন রয়েছে তাদের নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করবে। আফগানিস্তান এই দাবির সমর্থক। উপজাতির লোকেরা অত্যন্ত একগুঁয়ে, যুদ্ধ মারামারিতে কখনই পিছু-পা নয়। তারা যেমন নির্মম ও সাহসী, তেমনি বন্দুক-চালনায় পটু। এরা নিজ নিজ জির্গা বা দলের নায়কের নির্দেশ মেনে চলে, রাজশক্তির অধীনতা মেনে নিতে রাজী নয়। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতারা দুই জাতি-তত্ত্ব অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতির লোক, এরা একত্রে বসবাস করতে পারবে না—এই নীতি প্রয়োগ ক'রে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করেছিলেন।

এখন পুস্‌তুনগণ যদি এই নীতিই প্রয়োগ ক'রে পৃথক হতে চায়, তাদের দাবিকে পাকিস্তান অগ্রাহ্য করবে কোন যুক্তিতে? কিন্তু পাকিস্তান সরকার আফগান-পুস্‌তুনদের দাবিকে গায়ের জোরে ঠেকিয়ে রেখেছে। আর নিজেদের সামরিক শক্তি বাড়ানোর জন্য আমেরিকাকে কমিউ-নিজমের ভয় দেখিয়ে আধুনিক যুদ্ধের হাতিয়ার খয়রাত গ্রহণ করেছে। ভারতের প্রতি পাকিস্তান যেমন বন্ধুভাব পোষণ করে না, আফগানি-স্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধু বা ভাল প্রতিবেশীর মতো নয়।

সম্প্রতি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে মনোমালিন্য প্রবল হয়ে ওঠার ফলে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। পাকিস্তান মনে করে, আফগানিস্তানের বাণিজ্যের পথ বন্ধ ক'রে দিয়ে তাকে এমন বেকাদায় ফেলবে যে, সে পুস্‌তুনদের দাবি সমর্থন না করতে বাধ্য হবে। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে একটি দেশকে এত সহজে কাবু করা যাবে কিনা সন্দেহ, বিশেষ ক'রে রাশিয়া যখন রয়েছে আফগানিস্তানের পূর্ণ সমর্থক।

মালয়

মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। নীলসাগরের মধ্যে অসংখ্য দ্বীপ, ছোটবড় মাঝারি নানা আকারের; মৌচাকের কাছে পুঞ্জ পুঞ্জ মৌমাছির মত। মনে হয়, বিধাতা পুরুষ মাটি দিয়ে মহাদেশ গড়ার পর হাতের মাটি সাগরের মধ্যে ঝেড়ে ফেলেছিলেন, সেই ছিটেফোঁটা সমুদ্রের জলে জেগে রয়েছে। এগুলি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

মালয় এসিয়া মহাদেশর সর্বদক্ষিণ অংশ। থাইল্যাণ্ডের কিছু অংশ দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে এসেছে, এরই দক্ষিণ প্রান্ত মাঝে-মোটা দুই-অংশ-সরু মিস্টি আলুর মত দেখতে কতকটা, ক্রমে পূবদিকে বেঁকে চীন সাগরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এইটি মালয়; মালয়ীরা বলে 'তাজা মালয়্' অর্থাৎ মালয় দেশ। বিষুবরেখার ১০ ডিগ্রি উত্তরে ক্রা যোজক। ভৌগোলিক দিক থেকে বিবেচনা করলে এখান থেকেই মালয়দেশ সুরু হয়েছে বলা চলে। ক্রা যোজক চওড়া মাত্র ৪০ থেকে ৫০ মাইল; মাঝে মাঝে সাগরের অংশ দেশের মধ্যে অনেকদূর পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। ক্রা যোজক থেকে মালয়ের দক্ষিণ প্রান্তে রুমেজিয়া প্রণালী পর্যন্ত দেশটি ৭৫০ মাইল; সবচেয়ে চওড়া অংশের বিস্তার প্রায় ২০০ মাইল।

মালয়ের মোট আয়তন ৫০ হাজার ৬ শত বর্গমাইল, লোকসংখ্যা (১৯৫৭ সনে হিসাব মত) ৬২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯১৫। মালয়দেশ আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের দেড়গুণের চেয়ে কিছু বেশি কিন্তু কেবল ২৪ পরগণা জেলাতেই যে পরিমাণ লোক (৬২,৯৩,৭৫৮—১৯৬১ সনের আদমসুমারি অনুসারে) সারা মালয়দেশের লোকসংখ্যা তারচেয়েও কিছু কম।

দেশটি কেমন

মালয় পাহাড়ময় দেশ। দেশের পশ্চিম অংশ দিয়ে তিনশো মাইল লম্বা গিরিমালা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ঢেউ খেলিয়া গেছে। চওড়া এই শৈলমালার নাম গুনং কর্বু। উত্তর ও পূর্ব অংশে আর দুইটি ছোট পাহাড় আছে, নাম গুনং বেনম্ ও গুনং তাহান। এ দুটিই পাহাং রাজ্যে অবস্থিত। মালয়ের সর্বোচ্চ পাহাড় আমাদের দার্জিলিং পাহাড়ের মত, ৭ হাজার ফুটের কিছু বেশি উঁচু। পাহাড়ময় অংশের বেশির ভাগ স্থানের উচ্চতা ৪ হাজার ফুটের মত। দেশের ওপর দিয়ে

এরোপ্লেনে ক'রে উড়ে যেতে দেখা যাবে মাঝে মাঝে সমতলভূমিতে ও পাষাণময় অঞ্চলে পিরামিডের মত ছোট ছোট পাহাড় খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। চূণাপাথরের এই বিচ্ছিন্ন পাহাড়গুলি যেন এক একটি মৌন-সন্ন্যাসী, গাছপালা ঝোপজঙ্গলে সারাদেহ আবৃত, প্রায় প্রতিটি পাহাড়েই আছে বেশ প্রশস্ত গুহা। জীবজন্তু তো এখানে আশ্রয় নেয় বটেই, এককালে হয়তো এগুলি মানুষেরও নিরাপদ বাসস্থান ছিল।

মালয়ের কোন পাহাড়ের চূড়াতেই তুষার জমে না কিন্তু সারাবছরেই ঝমঝম বৃষ্টি হয় ব'লে নদীগুলি বারমাস জলে পূর্ণ থাকে। সবচেয়ে বড় নদী হল পাহাং, ২৭১ মাইল দীর্ঘ। পাহাং রাজ্যের মাঝখান থেকে উৎপন্ন হয়ে এটি প্রায় একশো মাইল দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়েছে, তারপর সোজা পূর্বদিকে ঘুরে চীনসাগরে গিয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় বড় নদী হল পেরাক, দৈর্ঘ ২৫২ মাইল। পেরাক রাজ্যে এর উৎপত্তি; দক্ষিণদিকে বয়ে এসে পশ্চিমে মালাক্কা প্রণালীতে গিয়ে পড়েছে। কেলান্‌টান রাজ্যের মধ্যে প্রবাহিত আর একটি বড়নদী, এর নামও কেলানটান। এগুলি ছাড়া অনেকগুলি ছোট ও মাঝারি ধরণের নদী উপনদী রয়েছে। নদীর সঙ্গে মানুষের বিশেষ করে কৃষিপ্রধান দেশের মানুষের প্রাণের যোগ। মালয়ের পশ্চিম উপকূলে পাহাড় ও সাগরের মধ্যেকার সমভূমি অঞ্চল পলিমাটি দিয়ে গঠিত। এখানে ধান ফলে প্রচুর, আর মাটির নীচে আছে এমন খনিজ উপাদান যা থেকে টিন তৈরি করা হয় প্রচুর পরিমাণে। দেশের উত্তর অংশের সমভূমিকে ধান ও টিনের ভাণ্ডার বলা চলে। পশ্চিম উপকূলে যেখানে নদী এসে মিশেছে সাগরের সঙ্গে সেখানেই দেখা যাবে নিবিড় বনভূমি; এরূপ বনের গাছ জলা জায়গায় জন্মে, ডাল থেকে শিকড় ঝুলে ঝুলে নামে মাটিতে। সাগর থেকে উপকূলের দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়; মনে হয় শাড়ির সবুজ আঁচলখানি নীল জলের প্রান্তে এসে ঠেকেছে।

পূর্ব উপকূলের দৃশ্য সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। নদীর মোহনাগুলি ছাড়া অন্যত্র নিবিড় বনভূমি নাই, সোনালিরঙের বালুকা-বিছানো বেলাভূমি ক্রমে ঢালু হয়ে সাগরের দিকে চলে গেছে। বালুচরে সুশ্রী ঝাউগাছ চিকণ মিহি পাতাভরা ডালপালা ছড়িয়ে নিশিদিন সোঁ সোঁ করে একটানা গান করে চলেছে যেন। অশান্ত সাগর; মাথায় সাদা ফেনা নিয়ে বড় বড় ঢেউ গর্জন করে কূলে এসে আছড়ে পড়ে।

একঋতুর দেশ

আমাদের দেশে ছয়টি ঋতুর কথা আমরা বইতে পড়ি। আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমরা অন্তত চারিটি পৃথক ঋতু অনুভব করতে পারি—গ্রীষ্ম, বর্ষা শরৎ ও বসন্ত। কিন্তু মালয়কে বলা চলে একটিমাত্র ঋতুর দেশ। বিষুবরেখার কাছাকাছি উত্তরদিকে অবস্থিত দেশটির কোন অংশই সাগর থেকে একশো মাইলের বেশি দূরে নয়; তিন দিকে সাগর দিয়ে ঘেরা ব'লে সমুদ্রের দিক থেকে বাতাস দেশের মধ্যে চলে যায়। জলবায়ু সারা বছর ধরে প্রায় একইরূপ থাকে, গরম এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকে প্রচুর পরিমাণে—এই হল এখানকার স্বাভাবিক অবস্থা। দেশের মধ্যে পাহাড়ময় অঞ্চলে জলবায়ু স্নিগ্ধ, আরামদায়ক।

সারাদেশের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে ১০০ ইঞ্চি। সিংহলে যেমন বছরে দুইবার বর্ষা হয়, এখানেও তেমনি।

গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ মে থেকে জুলাই পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে মৌসুমিবায়ু দেশের মধ্যে কিছু পরিমাণ বৃষ্টি আনে কিন্তু বৃষ্টি বেশি হয় অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যে সময় উত্তর-পূব থেকে ফেরৎ-মৌসুমি প্রবাহিত হয়। এসময় চীন সাগরে দেখা দেয় ঝড়তুফান। তাই মালয়ের পূর্ব উপকূলে দেখা যায় ঝড়ঝাপটা আর বিক্ষুব্ধ সাগরের উত্তাল আলোড়ন। চীনের পূর্ব উপকূলে যেমন টাইফুন অর্থাৎ সমুদ্রের বিশাল ঢেউ দেশের মধ্যে কিছুদূর পর্যন্ত ছুটে এসে লোকজনের দারুণ ক্ষতি

করে. মালয়ে তেমন হয় না বটে তবে অকস্মাৎ কালবৈশাখীর মত ঝড় বেগে চলে আসে সাগরের দিক থেকে। এইরূপ ঝড়বাতাস 'সুমাত্রা' নামে পরিচিত; সুমাত্রা দ্বীপের দিক থেকে আসে ব'লে হয়ত এ নাম।

বনজঙ্গল ঘুরে দেখি

মালয়ের বনজঙ্গলে বেড়াতে গেলে নয়ন জুড়াবে। যেমন ঘন সতেজ গাছপালা, তেমনি তাদের মহিমান্বিত রূপ। জলবায়ুর গুণে অরণ্য নিবিড় এবং বৈচিত্রে পূর্ণ। পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছ, একশো দেড়শো ফুট দীর্ঘ বলিষ্ঠ বনস্পতি; তলদেশে ঘন ঝোপঝাড়, পায়ে হেটে বনের মধ্যে প্রবেশ করা অসাধ্য, পোষা হাতিতে চড়ে গেলে হিংস্রপ্রাণীর হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। বনে দেখতে পাবেন বিচিত্র রঙে এবং বিচিত্র আকারের অর্কিড, গাছে গাছে ঝুলে রয়েছে, যেন ঝুলানো বাগান। এদেশে অর্কিড আছে প্রায় ৮০০ রকমের, রঙে চোখ জুড়ায়, গন্ধে মন মাতায়। এখানে দেখতে পাবেন নানাজাতের লতাগাছ, ঝোপজঙ্গলের ভিতর গাছ বেয়ে ওপরে উঠেছে, অরণ্যের গাছের মাথায় যেন বিছিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ শক্ত বেত ও অন্যান্য শক্ত লতা—এদের বলা হয় রনতান—অন্য গাছ অবলম্বন করে বেড়ে ওঠে, এদের পাতায় বঁড়সির মত কাঁটা, লতার গা থেকে লম্বা কাঁটার শিস আঁকসির মত অন্য গাছকে আঁকড়ে ধরে বেয়ে উঠতে সাহায্য করে। বেত এদেশের একটি প্রয়োজনীয় বনসম্পদ। বেত দিয়ে তৈরি হয় আসবাবপত্র, নানা আকারের পাত্র; ঘর তৈরিতে শক্ত দড়ির কাজ করে; বিদেশে রপ্তানি হয় প্রচুর। এই লতাজাতীয় গাছে পরগাছা দেখতে পাবেন অনেক; এদের মধ্যে র‍্যাফ্‌লেসিয়া আরনল্ডি হল সবচেয়ে বড় আকারের ফুল, চওড়া ১৮ ইঞ্চি।

পাহাড়ের পাদদেশে ও নীচু সমভূমি অঞ্চলে আছে বড় বড় বাঁশের বিস্তৃত অরণ্য। নানা কাজে ব্যবহার করা হয় এইসব বাঁশ। স্থানীয়

লোকদের বাড়িঘর তৈরি করতে লাগে। নদীতে বাঁশের ভেলায় করে অনেক লোক যাতায়াত করে, নিত্যব্যবহারের অনেক জিনিস তৈরি করে বাঁশ দিয়ে। দেশের প্রায় ৭০ ভাগ অংশ নিবিড় বনে ঢাকা। সাগরতীরের গাছগুলি আমাদের দেশের সুন্দরবন অঞ্চলের গাছের সমগোত্রীয়। এ থেকে পাওয়া যায় জ্বালানি কাঠ, গাছের ছাল থেকে তৈরি হয় ওষুধ ও রঙ। বালুকাবিছানো সমুদ্রতীরে নারিকেল ও ঝাউগাছের প্রাচুর্য; এদের স্নিগ্ধ শ্যামল সৌন্দর্য, বাতাসের সঙ্গে গাছের ডালপালার সঙ্গীতময় আলোড়ন উপকূলভাগ মুখর করে রাখে।

প্রকৃতির চিড়িয়াখানা

মালয়ে বিচিত্র ধরনের জীবজন্তুর বাস। এখানে এমন কতক জাতের জীব আছে যা এশিয়া মহাদেশের অন্য কোথাও নাই; পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বন্য-প্রাণীর সঙ্গেই এখানকার প্রাণীর মিল বেশি। তাই অনেকে মনে করেন পৃথিবীর প্রাচীনযুগে এখানকার দ্বীপমালা হয়ত একটানা স্থলভাগ ছিল, তারপর কোন সময় ভূমিকম্পের ফলে ভূমি উঁচুনীচু হয়ে যায়, কতক অংশ উঁচু হয়ে ওঠে, কতক অংশ বসে যায় জলের নীচে। এইভাবে গঠিত হয় বিচ্ছিন্ন অসংখ্য দ্বীপ।

মালয়ের নিবিড় বনভূমি বন্য-জীবের স্বর্গভূমি। পাহাড়ের গায়ে ও ওপরে গভীর অরণ্যে দেখতে পাবেন বুনোহাতির দল, ছোট-বড়, মাঝারি, স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলে এক একটি পরিবার; দলপতি আছে, তার নির্দেশ মেনে চলে সবাই, কেউ অবাধ্য হলে আছে তার শাস্তির ব্যবস্থা। হাতি ক্ষিপ্ত না হলে তাকে বিশেষ ভয় নাই, মানুষকেই সে বরং এড়িয়ে চলে কিন্তু মালয়ের বনে যে বাইসনের দল চরে বেড়ায় তারা অতি ভয়ংকর। দেখতে মোষের মত, চার পায়ের নীচের দিকটা ঈষৎ বাদামি রঙের, মনে হয় মোজা পরেছে। দেহ অতিশয় বলিষ্ঠ।

এই ভারতীয় বাইসন অতিশয় হিংস্র প্রকৃতির, সামনে মানুষ দেখলে এরা তাকে শিং দিয়ে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে শেষ করে ফেলবে। এদেশে দুই জাতের গণ্ডার আছে—এক-শিংওয়ালা ও দুই-শিংওয়ালা। এক-শিংযুক্ত বড় আকারের গণ্ডার সংখ্যায় অনেক কমে গেছে। বনে আছে বিচিত্ররঙের তাপির, বাঘ, কালো চিতাবাঘ, মেঘবর্ণ চিতা, নানা আকারের বাঘডাশ। বাঘডাশগুলি পাখির ডিম আর কচি বাচ্চার সন্ধানে গাছে গাছে বেড়ায়।

ঝোপজঙ্গলে ও স্যাৎসেতে বনে আছে শূয়োর ও কাকর হরিণ। এখানে দেখতে পাবেন ইঁদুর হরিণ; বাদামি রঙ, গায়ে সাদারঙের ছিটা, মুখ দেখতে অনেকটা ইঁদুরের মত, আকারে খরগোশের মত। ঘন বনজঙ্গলের মধ্যে মাটি দিয়ে চলাফেরা কঠিন; কাঠবিড়ালী তাই একগাছ থেকে অন্য গাছে যেতে মাটিতে হেঁটে চলে না, গাছের উঁচু ডাল থেকে হাওয়ায় ভেসে অন্যগাছের নীচু ডালে গিয়ে নামে। কেমন ক'রে? দেহের দুই পাশে সামনের পায়ের সঙ্গে পিছনের পায়ে পাতলা চামড়া জোড়া আছে; শূন্যে চার-পা ছড়িয়ে লাফ দিলে দুই পাশের চামড়া এরোপ্লেনের ডানার মত তাকে বাতাসে ভেসে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। প্যারাস্যুট দিয়ে যেমন সৈন্য নামে চলমান হাওয়াই জাহাজ থেকে, গ্লাইডার যেমন বাতাসে ভর দিয়ে নেমে আসে মাটিতে তেমনি। মালয়ের বনে বুনো ফল আছে প্রচুর। বাদুড়ের খাদ্যের অভাব নাই, দেশে বাদুড়ের সংখ্যাও প্রচুর। ফলাহারী একজাতের বাদুড়ের ছড়ানো পাখার মাপ হবে চার থেকে পাঁচ ফুট। দেশে পাখি দেখতে পাওয়া যায় বহু রকমের এবং বহু রঙের। কীটপতঙ্গ কত রকমের আছে তার ইয়ত্তা নাই; বিবিধ আকারের এবং রঙের নক্সাযুক্ত প্রজাপতি আছে প্রায় ৯০০ জাতের। মাটি ও জলবায়ুর গুণে সমগ্র দেশটিই যেন একটি উদ্যান-রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

দেশের আদিবাসিন্দা

মালয় যেমন বিচিত্র জীবজন্তুর বাসভূমি তেমনি এর নিবিড় অরণ্যে বাস করে এমন কতক মানুষ যারা আদিম মানবের মতই পশুশিকার করে জীবনধারণ করে, সভ্যতার আলোকে আসেনি। আদিবাসীদের বেশির ভাগ মালয়ী, কিছু সংখ্যক আছে অরণ্যচারী লোক। জাতির দিক থেকে এদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নাই, তফাৎ শুধু আচার-ব্যবহারে ও ধর্ম-বিশ্বাসে। মালয়ীরা সবাই মুসলমান; ইন্দোনেশিয়াদের সঙ্গে এদের অনেক মিল। অনেক যুগ ধরে আসে সাগর পাড়ি দিয়ে হয়ত। ইন্দোনেশিয়ার লোকেরা মালয়ের উপকূলে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এরা মালয়ী ভাষায় কথা বলে, চাষ-আবাদ ক'রে, নদী ও সাগর থেকে মাছ ধ'রে জীবিকা অর্জন করে।

অরণ্যচারীদের মধ্যে আছে তিনটি বিভাগ: নেগ্রিটো, ক্ষুদ্র আকারের নিগ্রো ধরনের লোক; সেনোই, সুঠাম দেহ, গায়ের রঙ ঈষৎ ফর্সা, মাথার চুল কোঁকড়ানো; মালয়ী আদিবাসী, বলিষ্ঠ গড়ন, গায়ের রঙ কালো, মাথার চুল খাড়া-খাড়া। এদের প্রায় সবাই বনে-জঙ্গলে পশুপাখি শিকার ক'রে বেড়ায়, কেউ কেউ জঙ্গলের মধ্যে এক এক জায়গায় গাছপালা কেটে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে পরিস্কার ক'রে নিয়ে সামান্য চাষবাস করে; আবার পরের বছর চলে যায় অন্য জায়গায়। এদের শিকারের হাতিয়ার নিজেদের তৈরি বাঁশের চোঙ-বন্দুক। বন্দুক বলতে আমরা বুঝি গুলীবারুদ থাকবে, শিকারকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লে আওয়াজ করে গুলী ছুটে যাবে। কিন্তু এদের বন্দুক হল ফাঁপা বাঁশের নল, সরু একটি নল আর একটি কিছু মোটা নলের ওপর বসানো। লম্বায় হবে ৮ ফুটের মত। নলের আগায় থাকে ছোট একটি তীর, তাতে বিষমাখানো। শিকারকে লক্ষ্য ক'রে মুখ দিয়ে

জোরে ফুঁ দিয়ে তীরটি ছুঁড়ে দেওয়া হয়। শিকার ঘায়েল হয় সামান্যই কিন্তু তা মারা পড়ে বিষের জন্য। আদিবাসীরা ইপো-গাছের বাদামি রঙের রস দিয়ে বানায় তীব্র বিষ, আবার কয়েক প্রকার লতা থেকেও এরা বিষ তৈরির কায়দা জানে। নেগ্রিটোরা শিকারে তীরধনুক ব্যবহার করতো, তারাও ক্রমে চোঙ-বন্দুক চালানোর কৌশল শিখে নিয়েছে। নিবিড় বনে লতাপাতার কুটিরে এরা বাস করে। বনে আছে নানা জীব, এরাও তাদেরই সঙ্গী ; প্রভেদ এই যে, এরা কথা বলে, নিজেদের মধ্যে যুক্তিপরামর্শ করে ফাঁদ দিয়ে শিকার ধরা ফন্দি খাটায়, আগুন দিয়ে ঝলসিয়ে নেয় খাওয়ার মাংস। মালয়ের অরণ্য দূর থেকে দেখতে সুন্দর কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে হলে প্রাণটি হাতে রাখতে হবে, কখন বা যায়।

গ্রাম ঘুরে দেখি

গ্রাম দেখতে গেলেই প্রকৃত মালয়ের পরিচয় মিলবে। জল, জঙ্গল আর মাটির সঙ্গে এদেশের মানুষের প্রাণের যোগ ; এদের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করেই চলে বাসিন্দাদের জীবন। দুই রকম গ্রাম দেখা যাবে। সাগরতীরের গ্রামগুলি ছবির মত পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত। নীল সাগরের স্বচ্ছ জল একেবারে ঘরের কাছে, আশেপাশে সুশ্রী সতেজ নারিকেল গাছ, তাতে রাশি রাশি ফল ; একটু দূরেই পলি-বিছানো সমতল ভূমিতে সতেজ ধানের জমি, তারপরে দেখা যাবে অরণ্যে-আবৃত পাহাড়, গ্রামগুলি প্রহরীর মত যেন মাথা তুলে তাকিয়ে আছে। জলে নৌকা, পাল খাটানো তাতে। এগুলি লোকেদের মাছধরার নৌকা। মাছ মেলে প্রচুর, নারিকেলের শাঁস আর মিষ্টজলের অভাব নাই। পশ্চিম উপকূলের জমিতে ধান জন্মে। ভাত আর মাছ লোকেদের প্রধান খাদ্য। গ্রামকে বলা হয় কামপঙ্।

কামপঙে গেলে আপনাকে মিষ্টি ডাব দিয়ে অভ্যর্থনা করবে, খেতে দেবে থালা ভরা ভাত আর বাটি ভরা মাছ।

দেশের ভিতরের দিকের কামপঙগুলি বন-জঙ্গলের ধারে হলেও কাছেই নদী-খাল-বিল থাকবে। নদী থেকে মাছ ধরার জন্য লোকেরা বাঁশ ও বেতের খাঁচা তৈরি করে জাল পেতে রাখে; শেষ দিকে কাদামাটির মাঠে চাষ আবাদ করে, ধান হল প্রধান ফসল। দেশের আয়তনের অনুপাতে লোকসংখ্যা কম। ফসল ফলানোর উপযোগী জমি থাকলেও তার পুরাপুরি ব্যবহার হয় না।

ওরা কাজ করে

জীবিকা অর্জনের জন্য মালয়ীরা নানা কাজ করে। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষকেই খাদ্য সংগ্রহের জন্য, বাসগৃহ নির্মানের জন্য, সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করার জন্য পরিশ্রম করিতে হয়। স্বাধীনভাবে মানুষের যে-কোন কাজ ক'রে অর্থ উপার্জনের অধিকার আছে কিন্তু জীবিকা অর্জনের ব্যাপারে সত্যই কি মানুষ স্বাধীন? বাঙালীরা যদি মনে করে আরবের বেদুইনদের মত জীবনযাপন করবে, তা কি সম্ভব? তেমনি বেদুইনরা যদি মনে করে জমিতে ধান ও পাট ফলাবে, বাড়িতে হাতি পুষবে, হাঁস মুরগী পালন করবে, তা কি সম্ভব? কখনই না। কারণ, মানুষ যেখানে বাস করে সেখানকার ভূমি জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে তার জীবন যেন এক সূতায় গাঁথা। যেমন ফসল সেখানকার জমিতে ফলে তাই তাকে ফলাতে হবে, সেখানকার ভূমির নীচে যেমন খনিজ আছে তাই তাকে কাজে লাগাতে হবে, সেখানকার জলবায়ু আবহাওয়া যেমন, তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাকে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতে হবে। তাই বলছিলাম, মানুষ পুরপুরি স্বাধীন নয়, প্রকৃতির হাতের পুতুল; প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের সদ্ব্যবহার সে যদি করতে পারে তবে তার জীবন সম্পদে ভরে উঠবে নিশ্চিত।

দুধের গাছ

ঘরের পাশে যদি এমন গাছ থাকত যা থেকে বারোমাস খেজুরের রসের খাঁটি দুধ ঝরত, তবে কী মজাই না হত। মালয়ের সমভূমি ও পাহাড়ের গায়ে যে গাছ রয়েছে প্রচুর তা থেকে ঘন দুধ পাওয়া যায় যথেষ্ট পরিমাণে; তবে এ দুধ খাওয়া চলে না, এ থেকে তৈরি হয় রবার। সুশ্রী দীর্ঘ গাছগুলি, বটপাতার মত সুন্দর সবুজ সতেজ চকচকে মসৃণ পাতা, পাতা ভাঙলে দুধের মত রস বেরয়। এই রবারগাছের গোড়ার দিকে ছাল কেটে নল লাগিয়ে দিলে টস্‌টস্‌ ক'রে রস ঝ'রে পড়ে; একটি পাত্রে সেই রস জমা হয়, পাত্রটি ভরে গেলে ঢেলে নেওয়া হয় অন্য বড় পাত্রে। রবার বন থেকে সংগৃহীত আঠা-রস থেকে কারখানায় তৈরি হয় রবার ও রবারের নানা দ্রব্য। উষ্ণ বৃষ্টিবহুল মালয়দেশ রবার-চাষের খুব উপযোগী। দেশের সমগ্র আবাদী জমির শতকরা ৬৪ ভাগ জুড়ে তৈরি করা হয়েছে রবার-বন। অনেকগুলি আছে বড়বড় বাগিচা, এগুলি প্রায় সবই ইউরোপীয়দের পরিচালনাধীন, ছোট ছোট রবার-বাগান তৈরি করা হয়েছে মালয়ীদের নিজস্ব জোত ও খামারে। বড় রবারবাগিচার মোট পরিমাণ হবে ২০ লক্ষ ৩০ হাজার একর, ছোট ছোট বাগানের মোট পরিমাণ প্রায় সাড়ে পনর লক্ষ একর। ১৯৫৫ সনে মালয়দেশে উৎপন্ন মোট রবারের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টন; বিদেশে রপ্তানি ক'রে দেশ ৮৫ কোটি ৯৫ লক্ষ মালয়-ডলার* অর্জন করেছিল। এই হিসাব থেকেই বোঝা যাবে বিদেশ থেকে অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে রবার মালয়ের কেমন মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য হয়। পৃথিবীতে যত স্বাভাবিক রবার উৎপন্ন হয়, তার শতকরা ৩২ ভাগ মেলে মালয় থেকে। রবার-গাছকে বলা যায় মালয়ের কামধেনু।

* ১ মালয়-ডলার ২ শিলিং ৪ পেন্সের সমান।

আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম সিন্‌থেটিক রবার তৈরির কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে, তবু আসল রবারের চাহিদা কমেনি। মালয়-সরকার নূতনভাবে রবারগাছ রোপণ ক'রে উৎকৃষ্ট রবার তৈরির দিকে মনোযোগ দিয়েছে। রবার চাষ মালয়ের চাষীর একটি বড় অবলম্বন। প্রথমে জঙ্গল কেটে এবং আগুন দিয়ে পুড়িয়ে জমি পরিষ্কার ক'রে নেওয়া হয়। রবার গাছের বীজ থেকে চারা তৈরি ক'রে নার্সারিতে পালন করা এক বছর; তারপর একর-প্রতি জমিতে ৮০টি ক'রে চারা যত্ন সহকারে রোপণ ক'রে বাড়িয়ে তুলতে হয়। আগাছা তুলে ক্ষেত পরিষ্কার রাখা আবশ্যক; বৃষ্টিপাতের ফলে যাতে মাটি ধুয়ে না যায়, সেজন্য গাছের ফাঁকে ফাঁকে এমন শস্য বপন করা হয় যাতে মাটির ক্ষয় নিবারণ হয় অথচ জমি জঙ্গলাকীর্ণ হয় না।

ধান ও নারিকেল

সাগর উপকূলের সমভূমি ও স্যাতসেতে জলাভূমি অঞ্চলে উৎপন্ন হয় ধান। মাঠে সবুজ ধানের ওপর যখন বাতাস ঢেউ খেলে যায়, বাংলাদেশের পল্লীর দৃশ্যই মনে পড়ে। সমভূমির আর একটি ফসল ফল নারিকেল; সুশ্রী সতেজ গাছে নারিকেল-ফলের ঝুলানো স্তূপ দেখে দর্শকের মন খুশিতে ভ'রে ওঠে। শুধু সুস্বাদু খাদ্য নয়, নারিকেল থেকে বাণিজ্যের অর্থও আসে প্রচুর। আর অন্য ফসলের মধ্যে আছে মিষ্টি আলু, ভুট্টা, চীনাবাদাম, শশা ও আনারস। আনারসের খেত দেখলে আপনি বিস্মিত হবেন। যতদূর চোখ যায় কেবল সারি সারি আনারসের গাছ সতেজ পাতাগুলি খাঁজকাটা তলোয়ারের মত উঁচিয়ে রেখেছে। বড় বড় রসাল ফল, এদের সবুজ, হলদে, কমলালেবুর মত রঙ চোখ জুড়ায়, সুঘ্রাণে জিভে জল আসে।

মালয়ের পাহাড়-অঞ্চলে নানাজাতের মূল্যবান কাঠের অরণ্য আর

পাহাড়ের ঢালু গায়ে দেখা যাবে চা-বাগিচা; সমান-ক'রে ছাঁটা সতেজ সবুজ গাছগুলি দূর থেকে পাহাড়ের গায়ে বিছানো গালিচার মত দেখায়। অরণ্য এদেশের একটি বড় সম্পদ। জ্বালানি কাঠ, ঘরের খুঁটি প্রভৃতি তৈরি করার জন্য কাঠ এবং কাঠকয়লা তৈরি করার জন্য সাধারণ কাঠ ছাড়া মালয় ১৯৫৫ সনে অরণ্য যে মূল্যবান কাঠ সংগ্রহ করেছিল তার পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৪২ লক্ষ ৭৯ হাজার কিউবিক ফুট। চাষ-আবাদ ক'রে ভূমি থেকে কি পরিমাণ ফসল পাওয়া গিয়েছিল এখানে তার একটি হিসাব দেওয়া হল।

কৃষিজাত দ্রব্য

	১৯৫২	১৯৫৫
রবার	৫,৮৩,০০০ টন	৬,৩৯,০০০ টন
চাউল	৭,০০,০০০ ,,	৬,৫২,০০০ ,,
নারিকেল শাঁস	১১,০০০ ,,	১৫,০০০ ,,
নারিকেল ছোবড়া	১,৫৫,০০০ ,,	১,৪৪,০০০ ,,
নারিকেল তেল	৮১,০০০ ,,	৯৫,০০০ ,,
তাল তেল	৪৫,০০০ ,,	৫৬,০০০ ,,
টিনে-ভরতি আনারস	১৩,৮৫১ ,,	২৩,৭১৭ ,,
চা	৩৭,৮৫,০০০ পাউণ্ড	৫৩,০৬,০০০ পাউণ্ড

টিনের খনি

টিনের খনি না তো টাকার খনি। মালয় থেকে পৃথিবীর মোট টিনের তিনভাগের এক ভাগ পাওয়া যায়। পেরাক এবং সেলাঙ্গর রাজ্যের পলিমাটির স্তরে টিনের আকর (ক্যাসিটেরাইট) মেলে প্রচুর

পরিমাণে। ড্রেজার দিয়ে মাটি খুঁড়ে এবং গ্র্যাভেল পাম্পের সাহায্যে টিনের আকর তোলা হয়। লোহার পাত গলিত টিনের মধ্যে ডুবিয়ে নিলে পাতের গায়ে উজ্জ্বল স্তর লেগে যায়। আকরিক টিন থেকে বিক্রির যোগ্য টিনের পাত তৈরির জন্য কারখানা গড়ে উঠেছে পেনাঙ্ ও সিঙ্গাপুরে। এদেশের অন্যান্য খনিজ হল লোহা, সোনা, বক্সাইট, ইল্‌মেনাইট, উলফ্রাম প্রভৃতি। কি পরিমাণ খনিজ পদার্থ মাটির নিচে থেকে তোলা হয় এখানে তার হিসাব দেওয়া হল।

খনিজ পদার্থ

	১৯৫২	১৯৫৫
আকরিক টিন	৫৬,৮৩৮ টন	৬১,২৪৫ টন
লৌহ আকর	১০,৫৫,৫০৬ ,,	১৪,৬৬,১৮৪ ,,
কয়লা	৩,১৪,৯২২ ,,	২,০৬,১১৮ ,,
সোনা	১৯,৮০৬ ট্রয়-আউন্স	২২,৮৩৮ ট্রয়-আউন্স

মাছধরা

মালয়ের সমুদ্রকূলে এবং দেশের ভিতরকার নদী ও খালবিলে মাছ আছে প্রচুর। জেলেরা বড় জাল দিয়ে সাগর থেকে মাছ ধরে; নদী বা বিলের ধারে যাদের বাড়ি তারা মাছ ধরার জন্য বাঁশের খাঁচা জলে পেতে রেখে কিংবা ছোট ছোট জাল দিয়ে নিজেদের খাওয়ার উপযুক্ত মাছ শিকার করে। দেশে জেলের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। মাছ এদেশের লোকের খাদ্যের একটি প্রধান উপকরণ; মাছ রোদে শুকিয়ে শুট্‌কে ক'রে রাখে, পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলে এর চাহিদাও রয়েছে।

শ্যামল সুন্দর দেশ

মাথার ওপর নীল আকাশ, নীল সাগরের ঢেউ দেশের তটভূমিতে এসে লুটিয়ে পড়ে, নীলাভ পাহাড় সবুজ অরণ্যে দেহ আবৃত ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে, মিস্ট-জলের প্রবাহ নিয়ে নদীগুলি কলকল বেগে ছুটে চলেছে সাগরের দিকে, নারিকেলকুঞ্জ দিয়ে ঘেরা গ্রামগুলি শান্ত পরিবেশে বিরাজ করে। কাঠের তৈরি বাড়িঘর, কোন-কোনটি টিন দিয়ে ছাওয়া অথবা টালি দিয়ে। গরীব লোকেদের ঘর বাঁশ কাঠের খুঁটির ওপর পাতার ছাউনি। লোকেরা অতিথিপরায়ণ ; ভাত, মাছ, নারিকেলের পিঠা টিনের থালায় কিংবা মাটির বাসনে করে এনে অতিথির সামনে হাজির করে ; চোখেমুখে আন্তরিকার ছাপ ও সরল হাসি। অধিবাসীরা বেশির ভাগই মুসলমান, কিছুসংখ্যক আছে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান। পুরুষেরা পরে রঙিন লুঙ্গি বা পায়জামা ও ইউরোপীয় পোষাক কোট প্যাণ্ট ; স্ত্রীলোকদের পোষাক হল সারোঙ্গ বা চীনাদের মত স্কার্ট ও ব্লাউস। উজ্জ্বল রঙের পোষাকের প্রতি এদের বিশেষ আকর্ষণ। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই জীবিকা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করে ; হাটবাজার করা, দোকান চালানোতে মেয়েরাই অগ্রণী, গৃহস্থালীর কাজও তাদেরই হাতে।

তলোয়ারের ঝিলিক

সকল দেশের লোকেরই কতকগুলি জাতীয় উৎসব আছে, তেমনি আছে বিশেষ ধরনের খেলাধুলা। দৈনন্দিন জীবনে বৈচিত্র্য আনতে আনন্দের কলহাস্য ও নৃত্যসংগীতের ছন্দোময় উল্লাসের প্রয়োজন আছে। উৎসবই জীবনে আনে আনন্দের প্রবাহ। মালয়ীদের মধ্যে তলোয়ার খেলা খুব জনপ্রিয়। সুসজ্জিত কয়েকজন ক'রে তরুণ উজ্জ্বল ঝকমকে তলোয়ার হাতে নিয়ে যুদ্ধের ভঙ্গিতে খেলায় মেতে ওঠে। ফাঁকা

জায়গায় দর্শক জমে যায়, তাদের চোখেমুখে খুশির ছাপ, সূর্যকিরণে তরবারিগুলির বিদ্যুতে মত ঝিলিক দেয়।

অতীত ও বর্তমান

প্রাচীনকালে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ভারতের ধর্ম ও সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল। ভারতীয় নাবিকগণ সাগর পাড়ি দিয়ে বাণিজ্য করতে যে ঐসব দেশে, পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে ভারতের ধর্ম, সাহিত্য ও রীতিনীতিও দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। মালয়ের প্রাচীন সভ্যতা ভারতেরই দান। কলিঙ্গ (বর্তমান উড়িষ্যা) থেকে বণিকেরা এবং মাদ্রাজের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে পল্লবগণ মালয়ে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। পেরাকরাজ্যে কেদা-র নিকটে পল্লবদের যে শিলালিপি পাওয়া গেছে, তা লেখা হয়েছিল ৪০০ খৃষ্টাব্দে। ভারতের গুপ্তযুগ ছিল সমৃদ্ধি ও সম্পদের যুগ; ভারতের ধর্ম, ভাষা ও সাহিত্যের দিগ্বিজয়ের যুগ।

সুমাত্রা দ্বীপে শ্রীবিজয় নামে এক বৌদ্ধসাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, এর রাজধানী ছিল প্যালেম্‌বাঙ্‌ নামক স্থানে। শ্রীবিজয়ের শাসকগণ সপ্তম শতকে মালয়ের অধিকাংশ অঞ্চল জয় করে নিয়েছিলেন। শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ত্রয়োদশ শতকে। জাভায় মাজাপাহিত নামে এক হিন্দু সাম্রাজ্য শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের বিলোপ ঘটিয়ে মালয় অধিকার করে নেয়। এইভাবে ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ শাসনাধীন না হলেও স্থানীয় বৌদ্ধ ও হিন্দু সাম্রাজ্যের অংশরূপে মালয় ছিল অনেক দিন। চতুর্দশ শতকে মালয়ের একটি ছোট রাজ্য মালাক্কার শাসক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ক্রমে সমগ্র মালয়ে এই ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে মসলার বাণিজ্য করতে ওলন্দাজ, পোর্তুগীজ ও ইংরেজ বণিকরা এসেছিল এদেশে। তারা শুধু বাণিজ্য করেই ক্ষান্ত হয়নি, দেশ দখল ক'রে কায়েম হয়ে বসেছিল। এইসব বিদেশী

বণিকদের ছিল যুদ্ধজাহাজ, কামান, বন্দুক; তাদের দেশের সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা ছিল রাজ্যজয়ের ব্যাপারে। এশিয়ার শান্তিপ্রিয় জাতিগুলি এদের সঙ্গে লড়াই ক'রে জিততে পারেনি। ইউরোপ এসে এশিয়ায় প্রাধান্য করতে সুরু করেছিল, এখানকার ধনসম্পদ লুটে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বণিক-দেশগুলি ঐশ্বর্যে স্ফীত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মহাকালের রথের চাকা চলে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায়। ইংরেজরা একে একে মালয়ের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি অধিকার ক'রে নিয়ে রবার-ক্ষেত্র, টিনের খনি, চা-বাগিচা ও অরণ্য থেকে লাভের মোটা অঙ্ক শোষণ করছিল এমন সময় শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপানীরা ইংরেজদের মালয় থেকে বিতাড়িত করে সমগ্র দেশ দখল ক'রে বসল; অবশ্য জাপানও বেশিদিন এ অঞ্চল অধিকারে রাখতে পারেনি। জাপানের পরাজয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে মালয়ের রাজনৈতিক জীবনে কিছুদিন বাঁধনহীন এলোমেলো অবস্থা বিরাজ করতে থাকে।

স্বাধীনতার আস্বাদ

যুদ্ধের দুর্যোগ কেটে গেলে ইংরেজরা আবার আসে মালয়ে, উদ্দেশ্য ফেলে-যাওয়া শাসনভার আবার গ্রহণ করবে। ইতিমধ্যে দেশের জনগণের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে, অল্পকালের জন্য হলেও বৃটিশের শাসনমুক্ত হওয়ার আস্বাদ তারা পেয়েছে। বৃটিশরা এসে আবার দেশের রাজা হয়ে বসবে—এ ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজী ছিল না কেউ। ফলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। যুদ্ধের সময় অনেক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল; তাই নিয়ে গরিলা যুদ্ধ চালাতে লাগল স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী দল। অবশেষে বৃটিশ সরকার বুঝতে পারল নবজাগ্রত এশিয়ায় বিদেশীর আসন শিথিল হয়ে গেছে। ১৯৫৭ সনের ৩১শে আগষ্ট মালয় ফেডারেশন

স্বাধীনতা লাভ করল; ভারতের মত মালয়ও বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ-এর সদস্যপদ গ্রহণ করে।

মালয় ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র মালয়ের ৯টি রাজ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে। এ রাজ্যগুলি হল—জোহোর (লোকসংখ্যা ৯,২৫,৯১৯), পাহাঙ্‌ (৩,১২,৯৭৮), নেগ্রি সেম্‌বিলান (৩,৬৫,০৪৫), সেলাঙ্গর (১০,১২,০৪৭), কেদা (৭,০১,৪৮৬), পেরালিস্‌ (৯০,৮৩৪), কেলান্‌টান (৫,০৫,১৭১) ট্রেঙ্গান্নু (২,৭৮,১৪৭), পেরাক (১২,২০,৬৩৩) এবং ২টি বৃটিশ সেটেলমেণ্ট-পেনাঙ্‌ (২,৭৪,৩২৫) ও মালাক্কা (২,৯১,২৩৩)। কুয়ালা-লামপুর মালয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব শাসনকর্তা আছে এবং রাজ্যের আইন-সভা সেই রাজ্যসংক্রান্ত আইনকানুন রচনা করে। আবার প্রতি রাজ্যের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত ফেডারেল আইন সভায় রচিত হয় সেই সব আইন যা সমগ্র মালয়ে প্রযোজ্য। দেশে গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, তবু এখানে সার্বভৌম রাজার পদ বজায় আছে। কি ক'রে সম্ভব? রাজতন্ত্র আর গণতন্ত্র কি একই সঙ্গে চলেছে? না, এখানকার রাজার সঙ্গে অন্য দেশের রাজার পার্থক্য আছে। মালয়ে সার্বভৌম রাজা ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন, রাজপুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন না।

মালয়ের সমস্যা

মালয়ের সমস্যা অনেকটা ভারতেরই মত। এখানে বিভিন্ন জাতির লোকের বাস, তাদের ভাষাও পৃথক। সরকারী ভাষা হল মালয় ও ইংরেজি কিন্তু এছাড়া দেশের মধ্যে প্রচলিত আছে চীনা, তামিল, তেলেগু ও মালয়ালাম। এসব ভাষায় দৈনিক সংবাদপত্র ছাপা হয়। বহু-ভাষার দেশে জাতীয় সংহতি গড়ে তোলা কঠিন, উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখাও সহজসাধ্য নয়। নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক

শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে, মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হয় কেবল সেই সব স্কুলে, যেখানে ইংরেজি হল শিক্ষার প্রধান মাধ্যম। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে দেশে ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে, ইংরেজির মাধ্যমেই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। অবশ্য সেই সঙ্গে মালয়-ভাষার উন্নতি সাধনেরও চেষ্টা চলেছে।

মালয় উপলব্ধি করেছে শিক্ষার প্রসার ছাড়া দেশে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না, শিক্ষার উন্নতি ভিন্ন বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগও অসম্ভব। অথচ বর্তমানের বিজ্ঞানের যুগে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে, জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নত করতে হলে যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটাতেই হবে। ১৯৫২ সনে দেশে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ক'রে আবশ্যিক করা হয়। নানাজাতির শিশুদের জন্য এই বিদ্যালয়গুলিকে বলা হয় জাতীয় বিদ্যালয়, এখানে ইংরেজি অথবা মালয়-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষনীয় অপর ভাষা হল চীনা ও তামিল। দেখা যায় মালয়ের ছাত্রকে অন্তত ৩টি ভাষা এবং প্রায়ই ৪টি ভাষা শিখতে হয়। ১৯৫৪ সনের হিসাবে দেখা যায় দেশে শিক্ষিত লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৪০।

উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হল মালয় বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৪৯ সনে এ বিশ্ববিদ্যালয় সিঙ্গাপুরে স্থাপিত হয়। এখানে সাহিত্য কলা, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মালয়ে দুইটি টেকনিক্যাল কলেজ আছে, কুয়ালা-লামপুরে আছে একটি বিখ্যাত চিকিৎসা গবেষণাগার

দেশরক্ষা

স্বাধীনতা অর্জন করা যেমন কঠিন, দেশ রক্ষা করাও তার চেয়ে কম কঠিন নয়। সদাজাগ্রত দৃষ্টি এবং দেশের জন্য আত্মত্যাগের প্রস্তুতি হল

স্বাধীনতা রক্ষার মূল্য। বর্তমান জগতে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি যখন মারাত্মক অস্ত্র তৈরি করতে নিযুক্ত হয়েছে এবং এইসব ব্রহ্মাস্ত্র তৈরি করতে খরচ পড়ে অসাধারণ, তখন বিজ্ঞানে এবং আর্থিক দিক দিয়ে অনুন্নত দেশের পক্ষে আত্মরক্ষা একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। মালয় স্বাধীন হলেও দেশরক্ষার ভার ন্যস্ত রেখেছে বৃটেনের ওপর। আভ্যন্তরীণ শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব তার নিজের ; সমগ্র ফেডারেশনের জন্য সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। নিজেদের পুণ্য মাতৃভূমি রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব দেশের জোয়ানরাই মাথায় তুলে নেবে, তারই প্রস্তুতি চলেছে নীরবে অথচ গভীর উৎসাহের সঙ্গে।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে মালয় ভারতের মতই দলনিরপেক্ষ এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সকল দেশের সঙ্গে সহযোগিতায় বিশ্বাসী।

থাইল্যাণ্ড

আগে নাম ছিল শ্যাম। ১৯৪৯ সনে দেশের নাম পরিবর্তন ক'রে রাখা হয়েছে থাইল্যাণ্ড, অধিবাসীদের নিজেদের ভাষায় মুয়াং থাই। এককালে ভারতীয় বণিক ও বৌদ্ধ হিন্দু ধর্মপ্রচারকদের কাছে সুবর্ণভূমি, শ্যাম, কম্বুজ অতি পরিচিত ছিল। ভারতের ধর্ম, শিল্পরীতি, সাহিত্য, পুরাণকথা এদেশে প্রচারলাভ করেছিল। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারত এ অঞ্চলে দেশ জয় করতে যায়নি, জয় করেছিল মানুষের মন। আজও তাই ভারতের ধর্ম এ অঞ্চলে স্নিগ্ধ আলোক বিকিরণ করছে। দেশের মধ্যে গেলেই সুন্দর সুন্দর মঠ-মন্দির ও বুদ্ধমূর্ত্তি দেখে বিদেশী ভ্রমণকারীরা বুঝতে পারবে ধর্ম, চারুশিল্প ও রুচিবোধের মধুর মিশ্রণ ঘটেছে অধিবাসীদের জীবনে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাগর-ঘেঁষা এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬৫৯ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ১৯৫৬ সনের হিসাবমত ২ কোটি ২৮ লক্ষ ১১ হাজার ৭০১। থাইল্যাণ্ড আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের ৬ গুণ কিন্তু এর লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও কম। শ্যাম উপসাগর ধনুকের আকারে বেঁকে থাইল্যাণ্ডের দক্ষিণে বিরাজিত, দেশের সর্বদক্ষিণে মালয়দেশ, উত্তরে এবং পশ্চিমে ব্রহ্মদেশ, উত্তরপূর্বে ও পূর্বে লাওস এবং দক্ষিণ-পূর্বে ক্যাম্বোডিয়া। দেশটি একহাজার মাইল দীর্ঘ, সবচেয়ে চওড়া অংশে এর বিস্তার ৪৮০ মাইল। দেশের স্থল-সীমান্তে নীলপাহাড় স্থির প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে, দক্ষিণে নীল জলরাশি সদাচঞ্চল তরঙ্গলীলায় মত্ত।

দেশটি কেমন

তিন দিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, মধ্যভাগে নিম্ন সমভূমির দেশ থাইল্যাণ্ড; একে তুলনা করা যায় বিরাট একটি কোশার সঙ্গে। ব্রহ্মদেশের সীমান্ত থেকে লাওস, ক্যাম্বোডিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত তিন দিক প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে পাহাড়-প্রাচীর, উত্তর-পশ্চিমে ব্রহ্মদেশের সীমানায় সবচেয়ে উঁচু পাহাড় ডোই ইন্থানন প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট উচ্চ। দেশের মাঝখানটাতে বিশাল সমভূমি, তার ভিতর দিয়ে পলিমাটির কোমল প্রলেপ বহন ক'রে মেনাম-চাও-ফায়া (সংক্ষেপে মেনাম্) নদী ও তার উপনদীগুলি প্রবাহিত। বিমানে দেশের মাঝখান দিয়ে উড়ে গেলে মনে হবে বঙ্গদেশের ওপর দিয়ে চলেছি; নদীর উভয় পাশে যতদূর চোখ যায় সবুজ মাঠ শ্যামল গালিচার মত বিছানো। মাঠে যখন ধান পাকে, সবুজ মাঠে পড়ে সোনার রঙের ছোপ্।

সারা দেশটি ভূমির গঠনের দিক দিয়ে একই রূপ নয়। প্রাকৃতিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন রূপ। ভূমি, জলবায়ু ও গাছপালার প্রকৃতি অনুসারে থাইল্যাণ্ডকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তর থাইল্যাণ্ড

পাহাড়ময় ; পার্বত্য নদীগুলি নূপুর করতালের ঝংকার তুলে পাষাণের গা বেয়ে ক্ষিপ্রবেগে নেমে আসে, ঘন বনজঙ্গল প্রাধান্য বিস্তার ক'রে রয়েছে, মানুষ এখানে অপ্রধান। একমাইল উঁচু কতকগুলি চূণাপাহাড় উত্তর-দক্ষিণে সমান্তরালভাবে এগিয়ে এসেছে। উত্তর দিক দিয়ে বিস্তৃত পর্বতমালারই শ্বেত জটাগুচ্ছ যেন। পাহাড়গুলির মধ্যবর্তী উপত্যকা একহাজার মাইলের মত উঁচু। তার ভিতর দিয়ে চারটি নদী প্রবাহিত হয়ে মেনাম্-এ গিয়ে মিশেছে ; পাহাড় অঞ্চলের জলধারা-উপঢৌকন নিয়ে দিচ্ছে দেশের প্রধান নদী মেনাম চাও-ফায়াকে। উত্তর থাই-ল্যাণ্ডের আয়তন প্রায় ৩৫ হাজার বর্গমাইল কিন্তু চাষ আবাদের কাজে লাগানো হয়েছে মোট ভূমির মাত্র শতকরা ৭ ভাগ। ধান ফলে, জলসেচের বন্দোবস্ত যেখানে আছে সেখানে বছরে দুইবার ধান জন্মানো যায়। আখ আর তামাকও উৎপন্ন হয়। প্রধান সম্পদ হল সেগুনকাঠ। বন অঞ্চলে স্বাভাবিক পরিবেশে বলিষ্ঠ বিশাল সেগুন-বনস্পতির রাজ্য। পোষা শ্রমিক-হাতি দিয়ে কাঠ টেনে বের করা হয় নিবিড় বন থেকে তারপর তার রপ্তানির ব্যবস্থা। উত্তর অঞ্চলের প্রধান শহর চিয়েংমাই সেগুনকাঠ রপ্তানির একটি বড় কেন্দ্র। সেগুন রপ্তানি থেকে মোটা রকমের টাকা আসে দেশে।

দক্ষিণ-পূর্ব থাইল্যাণ্ড, অন্য নাম কোরাট মালভূমি, আয়তনে প্রায় ৬৩ হাজার বর্গমাইল। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্রমে ঢালু হয়ে গেছে এই মাঝারি ধরনের উঁচু পাহাড়ময় অঞ্চল। ভূমি বালুকামিশানো, অনুর্বর, মাঝে মাঝে বেলে পাথরের ঢিপি, বৃষ্টিপাত নগণ্য। প্রকৃতি রুক্ষ, মানুষের প্রতি কৃপণ, বনজঙ্গল ও ফসলের প্রতিও। জলের অভাবে ফসল ফলানো কঠিন, নদীনালা থেকে জলসেচ ক'রে সামান্য ধান উৎপন্ন করা হয় আর কিছু পরিমাণ জন্মে তামাক ও তুলা। তুঁতগাছের চাষ ক'রে রেশমকীট পালন করার ব্যবস্থা হয়েছে, রেশম শিল্প তাই এ

অঞ্চলের মেয়েপুরুষের জীবিকার একটি উপায়। এই মালভূমি অঞ্চলে লোকের সংখ্যা কম, তবু গরু, শূয়োর, মোষ ও ঘোড়া পালনের বেশ প্রচলন আছে। কৃষিকাজের চেয়ে পশুপালনই এখানে লাভজনক। প্রকৃতি যেমন, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মানুষ তার জীবিকার পন্থা ঠিক ক'রে নেয়। কোরাট মালভূমি অঞ্চল থেকে গরু শূকর বিদেশে রপ্তানি ক'রে লোকেরা কিছু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ক'রে থাকে।

মধ্য-থাইল্যাণ্ড একটি জলের কোশার মধ্যভাগের মত; তিন দিক উঁচু পাহাড় ও মালভূমি, সেখান থেকে নদী এই নীচু সমতল ভাগের ওপর প্রবাহিত হয়ে পড়ছে দক্ষিণে শ্যাম উপসাগরে। এই মধ্যভাগই থাইল্যাণ্ডের হৃদয়স্বরূপ, লোকের বসতি এখানেই অন্য সব অঞ্চলের চেয়ে বেশি, ধনোৎপাদনের দিক থেকেই এই অঞ্চলই প্রধান। আয়তনে প্রায় ৭০ হাজার বর্গমাইল, প্রায় সবটাই উর্বর পলিমাটি-বিছানো লক্ষ্মীর শস্যভাণ্ডার। নদীতীরবর্তী জমিতে ধান প্রধান ফসল, পূর্ববঙ্গের মত বিছন ছিটিয়ে বোনা হয় জমিতে, বর্ষায় নদীর জল কূল ছাপিয়ে ধানের জমিতে যায়, জলের সঙ্গে ধানের মিতালি। যেখানে বানের জল জমি সরস কোমল করে না সেখানে চাষের জন্য দরকার ইস্পাতের ফলা-ওয়ালা বড় লাঙল কিন্তু মোষের পক্ষে তা টানা সম্ভব নয়। যদিও ইদানিং কিছু কিছু কলের লাঙল চালু হয়েছে তবু অনেক জমি শস্যদা না হয়ে ঝোপজঙ্গলে ঢাকা প'ড়ে রয়েছে। ধান ছাড়া অন্য ফসল হল ডাল, তামাক, তিসি, লঙ্কা প্রভৃতি। সবজি ও ফলের চাষও বেশ লাভজনক।

মধ্য-থাইল্যাণ্ডের প্রধান শহর ব্যাংকক থাইল্যাণ্ডের রাজধানী। থাই ভাষায় এর নাম ক্রাং থেপ্। মেনাম নদীর তীরে সমুদ্র থেকে ১৫ মাইল দেশের ভিতরে সুন্দর ব্যাংকক শহর মনোরম দালান-কোঠা

আর মন্দির নিয়ে বিরাজিত। মেনাম নদী এত বেশি পরিমাণ মাটি নিয়ে আসে যে, নদীর মুখে চরা পড়ে যায়, সমুদ্রগামী বড় জাহাজ নদীতীরে ভিড়তে পারে না; ছোট ছোট ষ্টীমার ও নৌকাতে মাল নামিয়ে দিতে হয় বাহির-সমুদ্র থেকেই।

থাইল্যাণ্ডের সর্বদক্ষিণ অঞ্চল হল সমুদ্রের মধ্যে এগিয়ে যাওয়া উপদ্বীপ অংশ, যার শেষ প্রান্তে মালয় ফেডারেশন। মালয় উপদ্বীপের পাঁচভাগের তিনভাগ থাইল্যাণ্ডের অধিকারে। দেশের মধ্যে লম্বালম্বি-ভাবে শৈলমালা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে এসেছে। বৃষ্টিপাত পশ্চিম অংশে বেশি, কারণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমিবায়ু ভারত মহাসাগর থেকে রাশিরাশি মেঘ নিয়ে আসে এবং যেখানে প্রথম বাধা পায় সেখানেই বর্ষণ হয় অধিক পরিমাণে। তবে পূবে বা পশ্চিমে দুইদিকেই সাগর থাকায় উষ্ণতা খুব বেশি অনুভূত হয় না। এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ধানচাষের উপযোগী কিন্তু মাটি তেমন উপযোগী নয়। উপদ্বীপ অংশকে বলা যায় থাইল্যাণ্ডের খনি-ভাণ্ডার, টিন হল প্রধান খনিজ দ্রব্য।

তিন ঋতু

উত্তরবঙ্গের লোকেরা কোনদিনই সূর্যকে ঠিক মাথার ওপর দেখতে পায় না; তার কারণ এ অঞ্চল ২৩½ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের উত্তরে অবস্থিত এবং গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তরায়ন কর্কটক্রান্তি পর্যন্তই। কিন্তু থাইল্যাণ্ডের লোকেরা বছরে একবার ক'রে সূর্যকে তাদের বাড়িঘর ডিঙিয়ে আরো উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে দেখে। থাইল্যাণ্ড ৬ ডিগ্রি থেকে ২০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত থাইল্যাণ্ডে প্রচণ্ড গরম পড়ার কথা কিন্তু কাছেই সমুদ্র আর দেশের ভিতরে উত্তর সীমানা জুড়ে রয়েছে পাহাড়, তাই জলবায়ু হয়েছে স্নিগ্ধ। তিনটি ঋতু তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে, লোকে বুঝতে পারে কে এসেছে। মে

থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষাকাল, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে মেঘ আসে মৌসুমি বাতাসে ভেসে, বৃষ্টি হয় ঝমাঝম, বড় বড় ফোঁটায়। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব থেকে শুক্‌নো শীতল বাতাস বইতে থাকে। উত্তরের পাহাড়-অঞ্চলে এসময়ে মাঝে মাঝে তুষার পড়ে, প্রায় প্রতি বাড়িতেই আগুণ জ্বালিয়ে ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা আছে। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত হল গরমকাল, দক্ষিণের উপদ্বীপ-অংশ ছাড়া বৃষ্টিপাত কোথাও বিশেষ হয় না, নির্মেঘ আকাশ থেকে সূর্যকিরণ অগ্নিবাণের মত নেমে আসে কিন্তু সূর্যের তেজ কোমল হয় সুশীতল সমুদ্রবায়ুর পরশে।

সারাদেশে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ১০০ ইঞ্চি, উত্তর অংশে এবং দেশের ভিতর পশ্চিম অংশে কম; তাপমাত্রা ৬৫ ডিগ্রি থেকে ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে। পাহাড় ও সমুদ্রের স্নেহের আশ্রয়ে থাইল্যাণ্ডের জলবায়ু হয়েছে সুখকর।

বনজঙ্গল ঘুরে দেখি

থাইল্যাণ্ডের বনভূমির সঙ্গে মালয়ের ও ব্রহ্মদেশের অরণ্যের অনেক মিল আছে। দক্ষিণের উপদ্বীপ-অংশে বৃষ্টিপাত প্রচুর এবং বারোমাসই আছে বর্ষণ। বন নিবিড় ঝোপজঙ্গল, বেত ও নানাজাতের বড় বড় গাছে এমনভাবে ছাওয়া যে সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছে না। মধ্য-থাইল্যাণ্ড ধানের ভাণ্ডার। নদীর করুণাধারায় সিক্ত অঞ্চলে চাষীরা বন-জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে ভূমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করেছে। উত্তর ও পশ্চিম সীমানায় পাহাড়ময় অঞ্চলে রয়েছে মূল্যবান কাঠের সুশ্রী শ্যামল অরণ্য, যেমন বলিষ্ঠ তরুরাজি তেমনি আরণ্যক জীবের নিরাপদ আবাস। উত্তর অঞ্চল হল সেগুনের রাজ্য। পায়ে হেঁটে বনের মধ্যে প্রবেশ করলে জীবন নিয়ে ফেরা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করবে। বাঘ, ভালুক, চিতাবাঘ, এক শিং-গণ্ডার, বুনো মোষ ও বাইসন চরে বেড়ায়

এই বনরাজ্যে। যেতে হবে পোষা হাতির পিঠে চড়ে। বুনোহাতির দল দেখতে পাবেন, একক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেখা মিলবে ঘাসজঙ্গলের ধারে যেখানে হরিণ আসে চরতে কিংবা জলের ধারে যেখানে বুনো শূয়োর নরম মাটি খুঁড়ে মিষ্টি মূলের সন্ধান করে। যেখানেই প্রকৃতি ঘন বনের শ্যামল আঁচল বিছিয়ে দিয়ে নিরাপদ ও খাদ্যপূর্ণ বাসভূমি তৈরি ক'রে দেয় সেখানেই দেখা যাবে নানাজাতের বন্য জীবজন্তু—তৃণভোজী, মাংভোজী, ভূমিচারী, বৃক্ষশাখাবিহারী। উত্তর অঞ্চলের পাহাড়ে বনজঙ্গল ঢাকা ঝরণার পাশে দেখতে পাবেন বিরাট আকারের পাইথন। নদীতে আছে কুমীর, মাছের লোভে ঘোরে সুযোগ পেলে মানুষকেও ছাড়ে না। শ্যামল বনভূমি বন্যপশুর যেমন বাসভূমি তেমনি পাখিরও।

ওরা কাজ করে

সংসারে কাজ করে সবাই, এমন কি পশুপক্ষী পর্যন্ত। খাদ্যসংগ্রহ ক'রে বেঁচে থাকার জন্য জীবমাত্রেরই এই উদ্যম রয়েছে ঃ পাখি কীটপতঙ্গ ফল শস্য খেয়ে বাঁচে, বন্যজীব কেউ তৃণলতা খায় কেউবা অন্য প্রাণী হত্যা ক'রে উদর পূরণ করে। মানুষও তার দেশের পরিবেশের সঙ্গে মিল রেখে জীবিকার পন্থা নির্ধারণ করে। থাইল্যাণ্ড নদীমাতৃক পলিমাটির দেশ, বৃষ্টিপাত হয় প্রয়োজনমত। তাই চাষ-আবাদ হয়েছে লোকদের প্রধান জীবিকা। শতকরা প্রায় ৮৫ জন কৃষিকাজ, মাছধরা ও বনজ-সম্পদের কাজকর্মের ভিতর দিয়ে জীবিকা অর্জন করে।

ধান

শীতের আগ দিয়ে সোনার ধানে মধ্য-থাইল্যাণ্ডের মাঠ ঝলমল করে; যেমন প্রচুর, তেমনি নানারঙের। দেশে ৪০ থেকে ৫০ রকম ধান ফলে, থাইল্যাণ্ডের চাউল পৃথিবীর মধ্যে সেরা—কোনটি মিহি সুতার মত, কোনটির সুগন্ধ রান্নাঘর আমোদিত করে, এমনকি ধানগাছও

সুগন্ধি, মাঠের বাতাস ধানের সৌরভে সুরভিত হয়ে থাকে। জুন থেকে আগষ্ট পর্যন্ত ধান বোনা ও চারা রোপণের সময়, আমাদের দেশের মতই। থাইল্যাণ্ডে একই জমিতে বছরে দুইবার ধান চাষ হয়—একবার আউস, একবার আমন। দেশের প্রধান সম্পদ হল ধান, দেশের মানুষের জীবন রক্ষা হয় তাতেই, বিদেশে রপ্তানি ক'রে টাকা পাওয়া যায় তা থেকেই। দেশের সরকার তাই ধানের জমির কল্যাণ-চিন্তায় উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। নদী থেকে দূরবর্তী জমিতে জল নিয়ে যাওয়া একটি সমস্যা। ভারতে বৃটিশ আমলে ১৯১৫ সনে আমাদের দেশ থেকে একজন সেচ-বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়ে থাইল্যাণ্ড জলসেচ-খাল খনন করেছিল। এছাড়া নদীতে বাঁধ দিয়ে জলসেচনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ১৯৫৮ সনে মেনাম নদীতে বাঁধ নির্মাণ ক'রে সেচ-খাল তৈরি করা হয়েছে; উত্তর-পূর্ব অংশে কম বৃষ্টির অঞ্চলে জমিতে জল পৌঁছিয়ে দেওয়া একটি বড় সমস্যা হয়ে রয়েছে এখনো।

বছরে কি পরিমাণ ধান ফলে? ১৯৫৬ সনে ৮১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন চাউল পাওয়া গিয়াছিল। বার্ষিক উৎপাদন এই রকমই। যারা মাঠে ফসল ফলায় তাদের কাজকর্ম দেখতে গেলে দেখতে পাবেন বর্ষার আগে মাঠে ধান ছড়ানোর জন্য জমি তৈরি করতে তারা ব্যস্ত। বর্ষার আগ দিয়েই আউস ধান ঘরে তুলতে হবে; চাষের সঙ্গী হল লাঙল-টানা মোষ। ইদানিং কোন কোন অঞ্চলে কলের লাঙল চালু হয়েছে। বর্ষার মেঘ আকাশ ছেয়ে আসতে সুরু করে, মাঝে মাঝে দেবতার কমণ্ডলু থেকে জলসিঞ্চনের মত স্নিগ্ধ বারিধারা নামে তৃষিত ভূমির বুকে; চাষী তাড়াতাড়ি পাকাধান কেটে আমনের জন্য জমি তৈরি করতে কাজে লেগে যায়। এবার বেতের টোপর মাথায় দিয়ে জলকাদার মধ্যে মোষের কাঁধে লাঙল দিয়ে টানানো। নরম জমিতে ধানের চারা রোপণ করার সময় মেয়েপুরুষ সবাই মাঠে নেমে

পড়ে, বৃষ্টিধারায় গা ভিজে যায় কিন্তু তাতে অস্বস্তি নাই আছে বরং পাকা ফসলের স্বপ্নমাখা আশ্বাস।

মাঠে যখন সবুজ ধান জলমাটি আলোবাতাসের দাক্ষিণ্যে সতেজ হয়ে উঠতে থাকে, তখন চাষীর অলস স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটানোর অবসর। মাঝে মাঝে জমির আগাছা তুলে দেওয়া আর বাড়িতে বসে কৃষির যন্ত্র-পাতির যত্ন নেওয়া। এই সময়টাতে বেত বাঁশের কাজ, গোলাঘর তৈরির কাজ, তাঁতে কাপড় বোনার কাজ, রেশমের গুটি থেকে সূতা তৈরি কাজে চাষীদের সময় কাটে। এক সময়ে রেশমকীট পালন ও রেশমসূতা থেকে কাপড় বোনার বেশ প্রচলন ছিল, মাঝে এ ব্যাপারে শিথিলতা আসে। সরকার আবার রেশম উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নাখোন রাট্চাশিমা-তে রেশমীসূতা কাটার কারখানা স্থাপন করেছে। ধানের পর অন্য প্রধান ফসল হল চীনাবাদাম ও ভুট্টা।

বন থেকে কী মেলে?

সমগ্র দেশে যে আয়তন তার শতকরা ৬০ ভাগ জুড়ে বন। এ বন শুধু আগাছা ঝোপজঙ্গল নয়, মূল্যবান কাঠের বিশাল অরণ্য। ১৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখার উত্তরে পাহাড়ময় অঞ্চলে সেগুনের রাজ্য। এমন সুন্দর কাঠ পৃথিবীতে বিরল, পৃথিবীর মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ মেলে থাইল্যাণ্ডে, তবে এই কাঠের ব্যবসা প্রায় সবই বৃটিশ কোম্পানী-গুলির একচেটিয়া। সরকারের কাছ থেকে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বনগুলি তারা লীজ্ নেয়, সময় উত্তীর্ণ হলে আবার নূতন ক'রে সময় বাড়িয়ে নেয়। যে কাঠ কাটা হয় তার প্রতিটি গাছের জন্য সরকারকে রয়্যালটি দিতে হয়; গাছ কাটারও বাধ্যবাধকতা আছে; মোট বনভূমির অর্ধেক পরিমাণ স্থানে নূতন বন রচনার উদ্দেশ্যে ১৫ বৎসর গাছ কাটা নিষেধ। ঐ সময় যত্ন ক'রে নূতন চারাগাছ লাগানো হয়, তাদের তদারক ক'রে সুস্থ সবল হয়ে উঠতে সহায়তা করা হয়। এই ১৫ বৎসর বাকি

অর্ধেক বনভূমি থেকে পাকা বলিষ্ঠ সেগুন কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা। তারপর নূতন বনে কাঠ কাটার মত অবস্থা হলে পুরানো বন পুড়িয়ে ছাই মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে স্থুরু হয় নূতন অরণ্যের পত্তন।

সেগুনকাঠ একরকম অক্ষয়, জলে পচে না, লোণা ধরে না, উই এর ক্ষতি করতে পারে না। ইউরোপের দেশগুলিতে নৌকা ও জাহাজ তৈরির কাজে সেগুনের খুব চাহিদা; এশিয়ায় এর চাহিদা আসবাব তৈরির জন্য। উত্তরের পাহাড় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বার্ষিক গড়ে ৫০ ইঞ্চি। এইরূপ বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ময় ঢালু জমি সেগুনের বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। নিবিড় বনে গাড়ি নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; এদেশের পোষা হাতিগুলিই করে শ্রমিকের কাজ ব্রহ্মদেশের শ্রমিক হাতির মত। বনের ভিতর থেকে দড়ি বেঁধে টেনে বের করে আনে, তারপর নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে আসা হয় কাঠগুদামে।

রবার

স্থশ্রী রবার গাছের দুধের মত আঠা থেকে তৈরি হয় এই স্থিতিস্থাপক পদার্থ রবার নামে যার পরিচয়। পৃথিবীর মধ্যে শুধু এমন স্থানেই রবারগাছ আপন মহিমায় বেড়ে ওঠে যেখানে বারোমাসই প্রচুর বৃষ্টিপাত। মালয় উপদ্বীপ রবারগাছের অনুকূল ক্ষেত্র। থাইল্যাণ্ডের সর্ব দক্ষিণ অংশ মালয় উপদ্বীপের অর্ধেকেরও বেশি অঞ্চল জুড়ে রয়েছে। এটি হয়েছে দেশের সম্পদের ভাণ্ডার—বনে রয়েছে রবার-বাগিচা, মাটির নীচে রয়েছে টিনের খনি, এ দুটিরই চাহিদা সারা পৃথিবীতে। ১৯৫০ সনেথাইল্যাণ্ড থেকে ১,১২,০০০ টন রবার বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছিল।

রবার কি কাজে লাগে? সাধারণত মনে হতে পারে টায়ার, টিউব, ফুটবলের ব্লাডার, রবার ক্লথ এবং এইরকম কিছু জিনিস ছাড়া রবার আর কী কাজে লাগতে পারে? বর্তমানের বিজ্ঞান আর

কলকারখানার যুগে রবার কত রকম ভাবে যে মানুষের কাজে লাগছে তার ইয়ত্তা নাই। আজকালকার মানুষের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শিল্পদ্রব্যের মধ্যে রবার থেকে তৈরি জিনিসও রয়েছে। রবার থেকে এমন সব জিনিস তৈরি হচ্ছে যা আগে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। কয়েকটি নমুনা দিই।

বৃটেনে প্রতি বছর প্রায় আড়াই লক্ষ টন স্বাভাবিক রবার বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়, রসায়নিক উপায়ে-তৈরি নকল (সিন্‌থেটিক) রবার আসে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টন। ছোটদের খেলার মাঠ রবার দিয়ে ঢেকে দিয়ে এমন আরামদায়ক করা হয়েছে যে, আছাড় খেলেও তাদের কোন আঘাত লাগে না। খেলার মাঠের ওপর আধ ইঞ্চি রবার ঢেলে দিয়ে রোলার দিয়ে চেপে বসিয়ে দেওয়া হয়; এতেই তৈরি হয়ে গেল কার্পেটের মাঠ।

রবার দিয়ে শুধু আরামে বসার আসনই হয় না, মোটরগাড়ির গোটা কাঠামোটাই রবারের বালিশের ওপর বসানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এর ফলে আরোহী গাড়ী চলার সময় ঝাঁকানি মোটেই টের পায় না, তার মনে হয় মেঘের ওপর সওয়ার হয়ে চলেছে! পৃথিবীর ৩০টি দেশে মোটর-আরোহীরা রবার-বিছানো পথে গাড়ি চলায়। পথ পাকা করার মসলার সঙ্গে রবার মিশিয়ে উন্নত ধরণের রাস্তা তৈরির চেষ্টা চলেছে, অনেকখানি সাফল্যও পাওয়া গেছে।

রবার-ফেণা দিয়ে সুখস্পর্শ কোমল আসন, রবার দিয়ে ঘরের দেওয়াল, মেঝের কার্পেট, ক্রিকেটখেলার পীচ্ তৈরি হচ্ছে। গবেষণাগারে রসায়ন্-বিজ্ঞানী বিভিন্ন বস্তুর উপাদান নির্ণয় ক'রে, বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে নূতন নূতন বস্তু তৈরি করার কৌশল আবিষ্কার করছেন। এই নবসৃষ্টির শিল্পখেলায় রবার হয়েছে একটি প্রধান উপাদান।

টিনের খনি

পৃথিবীতে টিন উৎপাদনে প্রথম চারিটি দেশ হল মালয়, ইন্দোনেশিয়া, বলিভিয়া ও বেলজিয়ান কঙ্গো। এদের পরই থাইল্যাণ্ডের স্থান। ১৯৫০ সনে খনি-থেকে-তোলা টিন-আকরের মোট পরিমাণ ছিল ১০,৩৬৪ টন। মালয়ে যেভাবে টিন-আকর সংগ্রহ করা হয়, এখানেও সেই একই প্রক্রিয়া—ড্রেজার ও হাইড্রলিক পাম্প দিয়ে কাজ। মালয় উপদ্বীপের উত্তরের অংশ থাইল্যাণ্ডের, দক্ষিণ অংশ মালয় ফেডারেশনের। ভূমির গঠন, প্রকৃতি ও জলবায়ু একই প্রকার। মাটির নীচ দিয়ে যে খনিস্তর বিরাজিত তাও একই রূপ। ভূমির ওপর সীমানা চিহ্ন দিয়ে দুই দেশ পৃথক করা হলেও ভূমির অভ্যন্তরের সম্পদ পৃথক রকমের হয়ে যায় নি।

টিন ছাড়া আরো কিছু খনিজ এদেশে আছে যদিও তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। আছে উলফ্রাম, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যান্টিমনি, লাল ও সবুজ রঙের মূল্যবান পাথর, চুনি, মরকত প্রভৃতি।

দেশের মানুষ

পৃথিবীতে এমন কোন মানবগোষ্ঠি আছে কিনা সন্দেহ যার সঙ্গে অন্য কোন মানবগোষ্ঠির মিশ্রণ ঘটেনি, যার রক্ত সেই আদিমতম যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত শুধু একই প্রবাহ বহন ক'রে চলেছে। থাইল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যেও এমনি মিশ্রণ ঘটেছে চীনাদের, দেশের আদিবাসী মন ও লওয়াদের, ক্যাম্বোডিয়ার খের ও ভারত থেকে আগত বাসিন্দাদের। থাইরা মাঝারি ধরণের উঁচু, গায়ের রঙ জলপাই-এর মত শ্যামবর্ণ, চীনাদের চেয়ে ঈষৎ ময়লা, মালয়ীদের চেয়ে ফর্সা; চোখ বড় এবং ভ্রূর বহিঃপ্রান্তের দিকে কাৎভাবে টানা, চওড়া খাটো নাক, পুরু ঠোঁট, ছোট চিবুক, চোয়াল ও গণ্ডের হাড় বলিষ্ঠ। এদের মাথার চুল কালো, মোটা এবং প্রায়ই ছোট-ক'রে

কাটা। লোকেদের মধ্যে পান খাওয়ার প্রচলন থাকায় অধিকাংশের দাঁত কালো। সমাজে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বহুবিবাহের রীতি আছে, প্রথমা পত্নী বাড়ির গৃহিণী।

মোরা চাষ করি আনন্দে

উত্তরে পাহাড় আর দক্ষিণে সাগর দিয়ে ঘেরা দেশটির মাঝখানে কোমল পলিমাটিবাহী নদী। সমতল ভূমির ওপর বর্ষার জল প্রতি বছর উর্বর মৃত্তিকার স্তর বিছিয়ে দেয়, জমি ধান ও কলাই চাষের একান্ত উপযোগী। চাষীরা মাঠে ধান ফলায় প্রচুর, ভাত তাদের প্রধান খাদ্য। নিজেদের দেশের চাহিদা পূরণ ক'রে বিদেশে চাউল রপ্তানি করা হয় বছরে গড়ে প্রায় ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ঘরে খাবার আছে, অধিবাসীরা তাই খোশমেজাজ। আর নদী ও সাগরে আছে প্রচুর মাছ, জাল দিয়ে, বাঁশের খাঁচার মত যন্ত্র দিয়ে মাছ ধরে যে কোন লোক তার প্রয়োজন মেটাতে পারে। শ্যাম উপসাগরে ম্যাকেরেল মাছ আছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

নদী ও সাগর-থেকে-ধরা মাছ শুধু যে সারা বছরের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাই নয়, বিদেশে রপ্তানিও হয়। ১৯৫৬ সনে ধরা পড়েছিল ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৯ শত টন। চাউলের পরই মূল্যবান রপ্তানি দ্রব্য হিসাবে মাছের স্থান। গভর্ণমেণ্ট সাগর থেকে মাছ ধরার ব্যাপারে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন।

গৃহপালিত পশু

থাইল্যাণ্ড সমভূমি ও পাহাড়ের দেশ। সমতল অঞ্চলে জমিতে চাষ ও মালবহনের কাজে লাগে গরু ও মোষ, কিন্তু পাহাড়ময় অংশে ঘোড়াই বেশি উপযোগী। উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পশুপালনের প্রচলন আছে; চাষ-আবাদের উপযোগী ক্ষেত্র না থাকায় পাহাড়ময় প্রদেশে পশুপালনই লোকেদের জীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোরাট

মালভূমিতে অশ্বপালন একটি লাভজনক কাজ। এদেশ থেকে শূকর, মোষ ও ঘোড়া বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। ১৯৫৫ সনে দেশে কি পরিমাণ গৃহপালিত পশু ছিল এখানে তার হিসাব দেওয়া হল।

ঘোড়া	১,৭৮,০০০
গরু	৫৮,৬২,০০০
শূকর	২৮,৫৯,০০০
মহিষ	৫৯,৬০,০০০

পরিবহন

থাইল্যাণ্ডে যোগাযোগ ও পরিবহনের একটি বড় এবং সহজ উপায় হল জলপথ। দেশের মধ্যভাগের মধ্য দিয়ে অনেকগুলি নদী, উপনদী বারোমাস প্রবাহিত। উত্তর থেকে দক্ষিণে এদের গতি। পূর্ব-পশ্চিমে খাল কেটে জলপথের জাল বুনে দেওয়া হয়েছে সারা দেশের মধ্যে; এর ফলে দেশের দূরবর্তী অঞ্চলও জলপথে রাজধানী ব্যাংককের সঙ্গে সংযুক্ত। সারা দেশ থেকে ধান, কাঠ ও অন্যান্য ব্যবসার সামগ্রী নদীপথে দক্ষিণের বন্দরে আনতে কোন অসুবিধা নাই। দেখা যায় মালবোঝাই বড় বড় নৌকা কখন পাল খাটিয়ে, কখনো স্রোতের টানে গন্তব্য স্থানের দিকে চলেছে। নৌকার মাঝিমাল্লার কাজ করে অনেকে, নৌকাই তাদের ঘরসংসার, নদীই তাদের জীবনের সাথী। নৌকাযোগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে থাইল্যাণ্ডের অনেক মিল আছে।

থাইল্যাণ্ডের শাসকগণ কেবল দেশের স্বাভাবিক জলপথের ওপরই নির্ভর ক'রে থাকেন নি। মোটর চলাচলের পাকা সড়ক ও রেলপথ নির্মাণে এঁরা উৎসাহ দেখিয়েছেন; ১৯৫৪ সনে দেশে পাকা রাস্তা ছিল ৪,৭০০ মাইল; যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য নিয়ে আরো প্রায় ৯ হাজার মাইল তৈরি করার কাজে গভর্ণমেণ্ট

উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯৫৫ সনে দেশে মিটারগেজ রেলপথ ছিল ২ হাজার মাইল। এশিয়ার মধ্যে থাইল্যাণ্ডেই প্রথম ডিজেল ইঞ্জিন রেলপথে ব্যবহার করা হয়।

শিল্প

থাইল্যাণ্ড প্রধানত ধান ও কাঠের দেশ, যন্ত্রশিল্পের উন্নতি এখানে ঘটেনি। বর্তমান যুগের বিরাট কলকারখানা গড়ে তুলতে যে পরিমাণ লোহা, কয়লা প্রভৃতি মৌলিক উপাদান দেশে থাকা দরকার তা নাই, খনিজ সম্পদের জন্য অনুসন্ধান কার্যত ব্যাপকভাবে চালানো হয়নি। কৃষির দ্রব্য নিয়ে দেশবাসীর কারবার। ব্যাংকক চাউল রপ্তানির সবচেয়ে বড় বন্দর; মেনাম নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত এই সুন্দর শহরটি সদাই কর্মকোলাহলমুখর। নদীর তীরে বহুদূর পর্যন্ত সারি সারি চাউলের কল; কলগুলি প্রায় সবই চীনাদের, কুলীরাও চীনা। কল-মালিকেরা প্রতি বছর অনেক হাজার ক'রে চীনা-কুলী চাউলকলে কাজের জন্য দক্ষিণ চীন থেকে নিয়ে আসে।

দেশে যে কাঁচামাল পাওয়া যায় তা থেকে নানা জিনিস তৈরির জন্য ছোটখাট কারখানা আছে, যেমন দেশলাই তৈরির কারখানা, সিগারেট তৈরির কারখানা, সিমেন্টের কারখানা, কাঠের আসবাবপত্র তৈরির ছোটবড় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কিন্তু বর্তমান যন্ত্রযুগের চাহিদা মেটানোর জন্য যেরূপ বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজন, তা গ'ড়ে ওঠেনি।

বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য

বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের মূল কথা হল দেশে যে জিনিসের উৎপাদন প্রচুর এবং বিদেশেও চাহিদা আছে তা বিদেশে বিক্রি করা এবং বিদেশ থেকে নিজেদের চাহিদামত জিনিস কেনা। এই বেচাকেনার ব্যাপারে দেশ যে পরিমাণ মূল্যের জিনিস বিদেশে রপ্তানি করছে তার চেয়ে বেশি কি কম মূল্যের দ্রব্য আমদানি করছে তারই ওপর নির্ভর করে সর্বসাকুল্যে

দেশের আর্থিক লাভ হচ্ছে, না ক্ষতি হচ্ছে। থাইল্যাণ্ডের রপ্তানি দ্রব্য কি? আমদানিই বা কি?

রপ্তানির প্রধান জিনিস হল চাউল, সেগুনকাঠ, টিন ও রবার। চাউল ও সেগুনকাঠ বিদেশে যায় ব্যাংকক বন্দর থেকে, টিন যায় ফুকেট বন্দর থেকে আর রবার রপ্তানির বন্দর হল শঙ্খলা। রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে তিনটিই কৃষি ও বনজাত; অপরটি (টিন) খনিজ কাঁচামাল, তাকে কারখানায় নূতন নূতন শিল্পদ্রব্যে বা ব্যবহারযোগ্য টিনে পরিণত করার ব্যবস্থা দেশে নাই। কী পরিমাণ জিনিস রপ্তানি করা হয়েছিল? ১৯৫৬ সনের হিসাব:

চাউল	১২,৬৪,৯৮৬ মেট্রিক টন
টিন	১৭,০০০ ,,
রবার	১,৩৫,০০০ ,,

বিদেশ থেকে আমদানি দ্রব্য হল সূতিবস্ত্র, যন্ত্রপাতি, ঔষধ, চা, চিনি, কাগজ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, সাইকেল, সেলাইকল, মোটরগাড়ি, পেট্রোল প্রভৃতি। আমদানি রপ্তানির ফর্দ দেখে বোঝা যাবে যন্ত্রযুগের উপযোগী জিনিসপত্রের জন্য থাইল্যাণ্ডকে বিদেশের বাজারে খরিদ্দার হতে হয়। বর্তমান সভ্যতায় মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্যের বৈচিত্র্য যেমন বাড়ছে এবং এদের উৎপাদনে উন্নতবিজ্ঞান ও বৃহৎ যন্ত্রশিল্প যেমন একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠছে তাতে শুধু কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে উপায় নাই। থাইল্যাণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্যের খতিয়ানে লাভলোকসানের হিসাব কিরূপ দাঁড়ায় দেখা যাক্।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এবং পরও কিছুদিন পর্যন্ত থাইল্যাণ্ডের আমদানির চেয়ে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ছিল বেশি, কাজেই দেশের আর্থিক অবস্থা চলেছিল উন্নতির দিকে। কিন্তু ১৯৫৫ সন থেকে

বাণিজ্যে লাভের চেয়ে লোকসানের অংশ ভারি হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৫৫ সনে আমদানি দ্রব্যের মোট মূল্য ছিল ৭২৮ কোটি ৮৭ লক্ষ বাট্ এবং রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য বাবদ পাওয়া গিয়েছিল ৭১২ কোটি ৫ লক্ষ বাট্; ১৯৫৬ সনে লোকসানের পরিমাণ আরো বেশি: আমদানি ৭৫৬ কোটি ২১ লক্ষ বাটের দ্রব্য; রপ্তানি দ্রব্যের মোট মূল্য ৬৯২ কোটি ৩২ লক্ষ বাট্।

থাইল্যাণ্ডে স্বর্ণ-মুদ্রামান প্রচলিত ছিল; মুদ্রা বাট্ বা টিকেল-এর মূল্য ধরা হত ১১ বাটে ১ স্টার্লিং পাউণ্ড। ১৯৩২ সনে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে রূপার বাট্ প্রবর্তন করা হয়। এর বর্তমান মূল্য: ২০ বাট্= ১ ডলার অর্থাৎ ভারতীয় ৫ টাকা।

অতীত ও বর্তমান

থাইল্যাণ্ডের অতীত যুগের ইতিহাস তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সাথে যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনীতে ভরা। মঙ্গোল সম্রাট কুবলাই খাঁর দাপটে দক্ষিণ-পশ্চিম চীন থেকে লাও-থাই গোষ্ঠির লোকেরা থাইল্যাণ্ডে প্রবেশ করে। সে ১২৫০ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন থেকে দেশের মধ্যে চলে মানুষের অভিযান। কালক্রমে শ্যামদেশের লোকেদের সঙ্গে মিশে তারা এদেশেরই অধিবাসীতে পরিণত হয়। থাইল্যাণ্ডের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, ভারত ও ইউরোপীয় শক্তির অধিকারে এলেও এদেশ বরাবরই স্বাধীনতা রক্ষা ক'রে এসেছে; বিদেশীরা বাণিজ্যের অধিকারলাভ ক'রে কুঠি স্থাপন করেছিল কিন্তু দেশের শাসনক্ষমতা কেড়ে নিতে পারেনি। থাইল্যাণ্ডের রাজবংশ ইউরোপের কোন রাষ্ট্রকে এদেশে ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ দেয়নি।

দেশের রাজা ছিলেন শাসন-ব্যাপারে নিরঙ্কুশ; তাঁর ইচ্ছামত তৈরি হত আইন-কানুন, প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করত তাঁর ইচ্ছার ওপর। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগরিক ও কতক

সৈন্যদল মিলিত হয়ে বিদ্রোহ ক'রে রাজার ক্ষমতা কিছুটা খর্ব করে এবং রাজাকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান যখন মালয় আক্রমণ করার জন্য থাইল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে সৈন্য নিয়ে যাওয়ার পথ দাবি করে তখন জাপানী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে থাই-সৈন্যের ৫ ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধের পর থাইল্যাণ্ড জাপ-সৈন্যকে দেশের মধ্য দিয়ে যেতে অনুমতি দেয় কিন্তু জাপানীরা সমগ্র থাইল্যাণ্ড অধিকার ক'রে বসে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জাপান পরাস্ত হয়, থাইল্যাণ্ড ফিরে পায় তার স্বাধীনতা।

দেশরক্ষা

থাইল্যাণ্ডে সামরিক ও বে-সামরিক বিভাগের মধ্যে প্রীতি ও সহযোগিতার অভাব যখনই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখনই দেখা দিয়েছে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট। সামরিক প্রভাব দেশের কর্তৃত্বকে অনেকখানি আয়ত্তের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেছে। এই প্রভাব বৃদ্ধি করার অনুকূলে সুরু হয় 'যুবজন' আন্দোলন ; এর উদ্দেশ্য স্কুলের ছাত্রদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ১৯৩৭ সনে আইন ক'রে দেশে ১৮ থেকে ৩০ বৎসর বয়সের সকল পুরুষের সামরিক বাহিনীতে কাজ আবশ্যিক করা হয়।

থাইল্যাণ্ডে নৌবাহিনী গ'ড়ে তোলার সুবিধা আছে ; রাজারা এদিকে নজরও দিয়েছিলেন। ১৯০৬ সন থেকে নৌবাহিনী পরিচালনার পুরাপুরি দায়িত্ব গ্রহণ করে থাইরা ; জাপান ও ইটালির নিকট থেকে আধুনিক যুদ্ধজাহাজ কিনে নৌবাহিনী শক্তিশালী করা হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই এদেশে বিমান-বাহিনীর সূত্রপাত হয়েছিল। রাজা ষষ্ঠ রাম তাঁর নির্বাচিত প্রজাদের ফ্রান্সে পাঠিয়ে বিমান-চালনা ও যন্ত্রবিদের শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে থাই-বিমানচালকগণ জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষ হয়ে পশ্চিম সীমান্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল।

কিছুদিন যাবৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অশান্ত আলোড়ন-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মে কোন স্থান বায়ুচাপহীন অবস্থায় থাকতে পারে না, চাপ কমে গেলেই বুঝতে হবে সেখানে চারিদিকের বাতাস ভিড় ক'রে ছুটে আসবে, আরম্ভ হবে ঝটিকার মাতামাতি। তেমনি, এই অঞ্চলে যে বিদেশী রাষ্ট্রগোষ্ঠি এতদিন প্রাধান্য নিয়ে বিরাজিত ছিল, তাদের অপসারণের ফলে রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। উত্তর অঞ্চল জুড়ে কমিউনিস্ট চীনের অবস্থান এবং যে কোন কৌশলে তার অনুপ্রবেশের নীতি এ অঞ্চলের এক ক্রমবর্ধমান সমস্যা। থাইল্যাণ্ড তার নিজশক্তির সীমা সম্বন্ধে সচেতন; আত্মরক্ষার জন্যই সে আমেরিকার সঙ্গে মিতালি ক'রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া রক্ষামূলক ব্যবস্থায় যোগদান করেছে, ভারত বা ব্রহ্মদেশের মত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র-নীতি গ্রহণ করেনি। বৈদেশিক নীতি ভারতের আর থাইল্যাণ্ডের ঠিক একরূপ না হলেও থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের প্রীতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক বিদ্যমান।

ধর্ম ও উৎসব

থাইল্যাণ্ড বৌদ্ধধর্মের দেশ; থাই ও লাওরা প্রায় সবাই বৌদ্ধ, কেবল মালয় উপদ্বীপ অংশের মালয়ীরা মুসলমান। ১৯৪৭ সনের আদম-শুমারির হিসাবে দেশের অধিবাসীর শতকরা ৮৯ জন বৌদ্ধ, শতকরা ৪ জন মুসলমান। মোট অধিবাসীর শতকরা প্রায় ৩ ভাগ চীনা। থাইদের বৌদ্ধধর্ম-আচরণে ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের বৌদ্ধদের প্রভাব পড়েছে; গ্রামাঞ্চলের বৌদ্ধদের মধ্যে ভূতপ্রেত অপদেবতা পূজার প্রচলন আছে, যেমন আছে পাহাড় অঞ্চলের বৌদ্ধদের মধ্যে। বৌদ্ধধর্ম এদেশে রাজার ধর্ম; এর অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে প্রজাদের মধ্যে একতাবোধ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। ধর্মের নিয়ম অনুসারে প্রতি বৌদ্ধ পুরুষকে অন্ততঃ দুই মাসকাল মঠে শ্রমণের জীবন যাপন করতে

হয়। ব্রহ্মদেশেও এ রীতি প্রচলিত আছে। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে আইন ক'রে বৌদ্ধধর্মকে রাজ্যের রাজধর্ম (state religion) ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বৌদ্ধভিক্ষুরা এবং বৌদ্ধ জনসাধারণ অবশ্য খুশি কিন্তু সকলেরই ধর্ম শিক্ষা দেবার অধিকার দিয়ে যে আইন প্রবর্তন করা হয়েছে বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুরা তাতে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। থাইল্যাণ্ডে শিক্ষাদানের ব্যাপারে মঠের পরিচালকগণ হস্তক্ষেপ করতে আসেন না, শিক্ষার নীতি নির্ধারণ ও বিস্তার দেশের সরকারের দায়িত্ব।

বৌদ্ধমন্দিরগুলির স্থাপত্য কতকটা ব্রহ্মদেশের মতই, মন্দিরের ওপরের অংশ একটি বিরাট ঘণ্টার মত দেখায়; চূড়া ক্রমে সরু হয়ে থাকে থাকে উঠে গেছে নীল আকাশের দিকে। বিরাট আকারের বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের দিকে থাইদের বিশেষ ঝোঁক। তাদের মন্দিরের শীর্ষ গগন স্পর্শ করে, তাদের অবাধ্য দেবতা বিশাল এবং মহান এই ধারণার বাস্তব রূপ তারা যেন দেখতে চায়। মন্দিরগুলি মনোরম পুষ্পোদ্যানে ও বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত। ধর্মকে অবলম্বন করেই অধিবাসীদের প্রধান উৎসবগুলি; নৃত্য ও সংগীত উৎসবের অঙ্গ। কিশোরী মেয়েরা নাচের সময় মাথায় পরে মন্দিরের চূড়ার মত মুকুট, কাঁধে লাগায় পদ্মের পাপড়ির মত দুইটি ডানা, পরণে পদ্মদলের মত পরিচ্ছদ, পায়ে নূপুর, হাতের আঙুলে লাগায় আল্‌গা নখ তাতে নৃত্যের ভঙ্গির সঙ্গে আঙুলগুলিকে বিভিন্ন মুদ্রায় লীলায়িত করা যায়। নৃত্যের মধ্যে একটি শুচিসুন্দর প্রশান্ত ভাব ফুটে ওঠে।

ভাষা ও সাহিত্য

আমাদের ভাষায় প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ নির্দিষ্টরূপ কিন্তু থাই-ভাষায় একই শব্দ ভিন্নরূপ উচ্চারণের ফলে ভিন্নরূপ অর্থ প্রকাশ করে। তাই এ ভাষাকে বলা যায় সুর-ভিত্তিক। এতে আছে ৪৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ ও ৩২টি স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণগুলি পৃথক বর্ণ নয়, ব্যঞ্জনবর্ণের আগে পাছে,

উপরে নীচে চিহ্নের মত ব'সে উচ্চারণের নির্দেশ করে। সাধারণত ৫টি স্বর ব্যবহৃত হয়—একটানা, নীচ থেকে উচ্চগ্রামে, উচ্চগ্রাম থেকে নীচে, গম্ভীর এবং খুব চড়া। স্বরবর্ণচিহ্নগুলি স্বরলিপির কাজ করে, এর ধ্বনির পার্থক্যে শব্দের অর্থ হয় পৃথক রকম। যেমন, 'খাও শব্দটি বিভিন্ন স্বরে উচ্চারিত হলে এর মানে হবে 'তাহারা', 'খারাপভাবে', 'চাউল,' 'সাদা', 'বৃদ্ধ' অথবা 'খবর'।

থাই-ভাষার লিপি গৌণভাবে দক্ষিণ ভারত থেকে নেওয়া হয়েছে। ক্যাম্বোডিয়ার লিপি ব্যবহার করা হয় থাই-ভাষায়, ক্যাম্বোডিয়ার লিপি আবার দক্ষিণ ভারতের ষষ্ঠ হতে অষ্টম শতাব্দীর শিলালিপি থেকে গৃহীত। ভারতের সমৃদ্ধির যুগে যখন তার বণিকেরা সাগর পাড়ি দিয়ে দূরদেশান্তরে গমন করেছিল তখন সে কেবল বিদেশ থেকে বাণিজ্যলভ্য ধনসম্পদই আহরণ করেনি, দূরদূরান্তরে তার সভ্যতা-সংস্কৃতির সৌরভ ও বীজরেণু ছড়িয়ে দিয়েছিল। থাইল্যাণ্ডের সাহিত্যে রয়েছে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ক্লন্, কাপ্, ক্লং

থাই-ভাষা সুরবাহন। সুরের ওপর ভর করে চলে ভাষা, সুরের পৃথক ঝঙ্কার অনুসারে শব্দের অর্থ হয় পৃথক। থাই-ভাষা তাই গীতিকবিতার পক্ষে খুব উপযোগী। থাই কবিদের কাব্যরস উৎসারিত হয়ে উঠেছে এই সংগীতময় ভাষায়। তিনটি ছন্দ খুব জনপ্রিয়—ক্লন্, কাপ্ ও ক্লং। এর মধ্যে আবার ক্লং ও কাপ্ মিলিয়ে রচিত হয় দীর্ঘ প্রেমগাথা, নাম 'নিরাট' কবিতা। প্রেম-কবিতার কতক ছোট ৮ লাইনের কবিতা, নাম ক্লন্‌পেট টন্; অনুপম ভাষা ও শ্রুতিমধুর সুরযুক্ত এই কবিতাগুলি থাই সাহিত্যে বিশেষ আদরণীয়। রামায়ণের কাহিনী এদেশের জনমানসে স্থায়ী আসন লাভ করেছে; এদেশে রামায়ণের নাম হয়েছে 'রামাকিয়েন'।

রাজার ভাষা

ইংলণ্ডের শাসনক্ষমতা পার্লামেণ্টের অর্থাৎ জনসাধারণের হাতে। তবু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সর্বোচ্চ প্রতীক হিসাবে রাজা বা রাণী জনসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধার আসনে বিরাজিত। থাইল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে তাদের ভাষায়। সাধারণ লোক যে ভাষা ব্যবহার করে রাজার জন্য সে আটপৌরে ভাষা হলে চলবে কেন! রাজার জন্য কতক শব্দ নির্দিষ্ট আছে যেগুলি গুরুগম্ভীর, সুন্দর ভাবের প্রকাশক, সুরের ওঠা-নামার জন্য যার অর্থের ব্যতিক্রম ঘটেনা। এশব্দগুলি শুধু রাজাই ব্যবহার করবেন; তেমনি রাজার সম্বন্ধে কোন কিছু বলতে হলেও সাধারণ শব্দ ব্যবহার করা চলবে না, রাজার যোগ্য মর্যাদাবোধক নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে হবে; যেমন রাজা নাইছেন, খাচ্ছেন, ঘুমাচ্ছেন—এ ধরণের কথা সাধারণের পক্ষে প্রযোজ্য, রাজার সম্বন্ধে বলতে হলে বলতে হবে—স্নান ও অঙ্গবাসন করছেন, ভোগ গ্রহণ করছেন, নিদ্রামগ্ন আছেন ইত্যাদি ধরণের শব্দ। ভাষাতেও রয়েছে রাজার মালিকানা; অবশ্য জনগণ তা অনুরাগের সঙ্গেই মেনে চলে।

পরিক্রমা

ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি পরিক্রমা করে এলাম। কী দেখতে পেয়েছি? যে ভূমিগঠন, যেরূপ জলবায়ু, যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দেশগুলির অবস্থান তা হল স্থায়ী পটভূমি; তারই পরিপ্রেক্ষিতে যুগে যুগে দেশের ইতিহাস রচিত হয়ে এসেছে, মানুষের মনের আলোড়ন, ভাবের ও চিন্তার আলোড়ন এক এক সমাজের সামনে নূতন আলোকপাত করেছে, নূতন পথের তোরণ খুলে দিয়েছে। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা অতিক্রম ক'রে সব রাষ্ট্রই নূতন যুগের নব দিগন্তের অরুণালোক দেখতে পেয়েছে। এই আলোক অনুসরণ ক'রে চলার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বৈচিত্র্য। ভবিষ্যৎ ইতিহাস বর্তমান যুগে রচিত হয়ে চলেছে। ব্যাপক পটভূমিতে, বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের এই পদক্ষেপের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে।

নূতন সমস্যা, নূতন সমাধান

বিখ্যাত ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাক্টন ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটি অতিমূল্যবান কথা বলেছিলেন; কোন জাতির ইতিহাস এমন কতকগুলি শক্তিপ্রণোদিত কর্মের ওপর নির্ভর করে যে শক্তিগুলি সে জাতির ভিতর থেকে উদ্ভূত নয়, বৃহত্তর কারণ থেকে তা জাত। সহজ করে বলা যায়, কোন দেশ বা জাতি অন্যের সংশ্রব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের জাতীয় ভাব ও প্রেরণা অনুযায়ী কাজ করতে পারেনা; অপরের সংস্পর্শে তাকে আসতেই হবে, নিজের সমস্যা সমাধানের নূতন পন্থা তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। কী ধরণের সমাধান সে উদ্ভাবন করবে তারই ওপর নির্ভর করবে তার ভবিষ্যৎ ইতিহাস।

বিশ্বের চিন্তানায়ক-ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়নবী লর্ড অ্যাক্টনের উক্তিটিকে সমর্থন করে তার অপূর্ব গ্রন্থ 'এ স্টাডি অব হিস্ট্রী'-তে যে আলোচনা করেছেন তা মনীষার আলোকে যেমন দীপ্ত, গভীর সত্যের বিশ্লেষণ হিসাবে তেমনি মনোজ্ঞ। তিনি বলেছেন, প্রতি মানব-সমাজ এগিয়ে চলার পথে কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়; এই সমস্যাগুলি হল তার বুদ্ধি নিষ্ঠা ও শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পথ অবলম্বনের ফলে সমাজের রূপ এবং আদর্শ পৃথক ধরণের হয়ে পড়ে। নজীর স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস। এক সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি গ্রীক নগররাষ্ট্র-গুলির প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। করিন্থ এবং চ্যালকিস্ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অন্যদেশের কিছু অঞ্চল অধিকার ক'রে সেখানে দেশের অতিরিক্ত লোক পাঠিয়ে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল; স্পার্টা উপনিবেশ স্থাপনের পরিবর্তে তার পার্শ্ববর্তী রাজ্য জয় ক'রে বৃহত্তর স্পার্টা গড়ে তুলতে চেয়েছিল, এথেন্স এই সমস্যার সমাধান করেছিল সম্পূর্ণ এক নূতন পদ্ধতিতে: তার কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, বাণিজ্য প্রসারের দিকে উদ্যম নিয়োজিত হয়েছিল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ভিত্তি শক্ত বনিয়াদের ওপর স্থাপন করে গণরাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা হয়েছিল। দেখা যায়, একই সমস্যা সমাধানের ভিন্ন ভিন্ন পথ গ্রহণ করে এই রাষ্ট্রগুলি নিজেদের ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। স্পার্টা সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে কিছুকাল অন্য রাষ্ট্রগুলি শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু তার দুর্বুদ্ধির পরিণতি ঘটেছিল তার বিলোপে। এথেনিয়ান রাজনীতিগণ দূরদর্শিতাবলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপ্লব এনেছিল তা সামাজিক বিপ্লব রোধ করে দেশের উন্নতির পথ করেছিল প্রশস্ত।

এশিয়ার নূতন সমস্যা

এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বহুদিন ইউরোপের কতক রাষ্ট্রের অধীনে অবহেলিত এবং শোষিত হয়েছে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি যখন জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছিল তখন এখানে অগ্রগতি ছিল রুদ্ধ। নূতন যুগে এরা জেগে উঠেছে, পৃথিবীর এগিয়ে-যাওয়া রাষ্ট্রগুলির সমপর্যায়ে উপনীত হবার উদ্যম দেখা দিয়েছে জনগণের মধ্যে। এশিয়ার দুইটি সমস্যা প্রধান—সমাজতন্ত্রবাদ ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি; কিংবা বলা চলে সমস্যা একটিই—সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এর সহায়ক কার্যক্রম মাত্র। নবজাগ্রত এশিয়ার মানুষ এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি?

প্রাচীন গ্রীসের স্পার্টা যেমন আত্মপ্রসার নীতি গ্রহণ ক'রে দেশজয়ের পথে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল, কমিউনিস্ট চীন সেইরূপ প্রসার-নীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তার লোকসংখ্যা ক্রমবর্ধমান, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার উদ্যম নিয়োজিত, নিজের সুবিধামত মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে নূতন অঞ্চল অধিকার করার কূটচক্রান্তে তার দ্বিধা নাই। ভারতের যশস্বী ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার চীন কর্তৃক ভারতের কিছু অঞ্চল বে-আইনীভাবে দখল করার কিছু আগে একটি প্রবন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, চীন তার বিপুল জনসংখ্যার চাপে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অঞ্চলের দিকে হাত বাড়াবে। দূরদর্শী ঐতিহাসিকের এই উক্তি এত শীঘ্র সত্য ব'লে প্রমাণিত হবে তা তখন কেউ ভাবতে পারেনি; তখন চীন ছিল ভারতের পঞ্চশীলের সমর্থক, শান্তিপ্রিয়, বন্ধুরাষ্ট্র বলে ভারতবাসীর কাছে প্রিয়। তার সে বন্ধুত্বের মুখোশ খসে পড়েছে। সে এখন শুধু ভারতের নয়, চীনদেশ-সংলগ্ন অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের

কাছেই এক সমস্যা। তার মতিগতি দেখে মনে হয়, কিছুদিনের মধ্যেই মধ্য এশিয়ার অঞ্চল নিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তার বোঝাপড়ার সময় আসবে; এখন চলেছে তার সামরিক উদ্যোগ পর্ব।

ভারত শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র, গণতন্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন এবং রক্তপাতবিহীন বিপ্লবের ভিতর দিয়ে জীবন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এর সংকল্প। পররাষ্ট্র নীতিতে ভারত অন্য সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পক্ষপাতী, বিজ্ঞানের উন্নতির ভিতর দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সে প্রয়াসী। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হবে ভারতের নীতি ও কার্যকলাপের মধ্যে যেন এথেন্সের ভাবাদর্শের ছাপ পড়েছে। বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ এবং চীনের চ্যালেঞ্জ-এর সমাধান ভারত কীভাবে করবে তারই ওপর নির্ভর করছে শুধু ভারতের ভবিষ্যৎ নয়, এশিয়ার ভবিষ্যৎ ইতিহাস।

হিমালয় বহ্নিমান

অস্তি উত্তরস্যাং দিশি হিমালয়ো নাম নাগাধিরাজঃ। উত্তরে নাগাধিরাজ হিমালয়। ভূপৃষ্ঠে ভারতের অবস্থানের এই হল পর্বত-চিহ্ন! দেড়হাজার মাইল দীর্ঘ তুষারমৌলী হিমগিরি উন্নত মহিমায় ভারতের উত্তরসীমান্তে বিরাজিত। নদনদীর উৎসস্থান, সাধুসন্তের তপস্যার নিকেতন, ভারতবাসীর পুণ্যতীর্থ দেবতাত্মা হিমালয় ভারতবর্ষের জনকস্বরূপ। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে রাশি রাশি মেঘবাষ্প আকাশপথে

ভেসে যায় দেশের ওপর দিয়ে; হিমালয় তা ফিরিয়ে দেয় নদীর করুণাধারারূপে। তাতেই তো দেশ পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী। উত্তরের মৃত্যুশীতল বায়ুপ্রবাহ গর্জন ক'রে ছুটে আসে, যার স্পর্শ পেলে ভারতের স্রোতস্বিনীর কলকলপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যেত বরফের জমাট স্তূপে; কিন্তু হিমালয় পাষাণদেহ দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখে স্নেহশীল পিতা যেমন ঝড়ঝঞ্ঝার দাপট থেকে বুক দিয়ে রক্ষা করে তার কন্যাকে। ভারতের সঙ্গে হিমালয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, ভৌগোলিক তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক তথ্য-দিয়ে দৃঢ়বদ্ধ, আধ্যাত্মিক চিন্তার পুণ্যকিরণে উদ্ভাসিত, পুরাণসাহিত্যের ভাবরসে আপ্লুত। হিমালয়ের মহিমময় দ্যুতি প্রতি ভারতবাসীর মনে।

মিত্রতার ধূম্রজাল

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়ায় অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল। এর মধ্যে প্রধান হল ভারতের দেশবিভাগ ও স্বাধীনতালাভ, চীনে কমিউনিস্টদের প্রাধান্যলাভ। স্বাধীন গণতন্ত্রী ভারতসরকার উদার মুক্ত মন নিয়ে চীনের কমিউনিস্ট সরকারকে স্বীকার ক'রে নিয়ে মিত্রতার হস্ত প্রসারিত করলেন। কমিউনিস্ট চীন উৎফুল্ল। ভারত চীনের সঙ্গে মিলিতভাবে বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠান করল, চীনকে বিশ্বসভায় আসন দেবার চেষ্টা করতে লাগল। চীনের প্রধান মন্ত্রী চা ও এন লাই ভারত পরিভ্রমণ করলেন, ভারতীয়দের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দধ্বনি তাঁকে অভিনন্দিত করল; সহস্রকণ্ঠে উচ্চারিত হল হিন্দী চীনি ভাই-ভাই। ভারতের পক্ষ থেকে এই অভ্যর্থনায় আন্তরিকতা ছিল প্রীতি ও শুভেচ্ছা-মিশ্রিত কিন্তু চীনের তরফ থেকে প্রীতির ধূম্রজাল বিস্তার করা হয়েছিল, এর অন্তরালে তারা ভারতের সীমান্তের দিকে চুপি চুপি এগিয়ে আসার কাজে ছিল লিপ্ত। কিভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলেছিল পরবর্তীকালের ঘটনা থেকে তা বোঝা যাবে।

মিষ্টিকথার ফাঁদ

চাও এন লাই-এর ভারতভ্রমণের পর প্রধানমন্ত্রী নেহরু গেলেন চীনদেশে। বিপুল সমারোহ করে অভ্যর্থনা জানানো হল। পিকিং এর হলুদরঙের টালির-ছাদ-দেওয়া ভবনশীর্ষে লালপতাকা উড়ল অগণিত, লক্ষ লোকের কণ্ঠে নেহরু-সম্বর্ধনার জয়ধ্বনি। কিন্তু এসকলি ছলনা। চাও. এন. লাই এর সঙ্গে আলোচনার সময় নেহরু কমিউনিস্ট চীনের ভুল মানচিত্রের প্রতি চীনা প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কমিউনিস্ট চীনের প্রকাশিত মানচিত্রগুলিতে হিমালয় বরাবর ভারতসীমান্তে অনেকখানি স্থান চীনের এলাকা বলে দেখানো হয়েছে; নেপাল, ভুটান, ও সিকিম রাজ্যের কিছু কিছু অঞ্চলও চীনের রাজ্যভুক্ত—এরূপ ইঙ্গিত রয়েছে মানচিত্রে। নেহরুর প্রশ্নের উত্তরে চাও এন লাই-এর কোমলকণ্ঠে আশ্বাস: ও কিছু নয়; মানচিত্রগুলি চীনের মুক্তিলাভের পূর্বে প্রকাশিত, এগুলি ছাপা হয়েছিল চিয়াং কাইশেকের আমলে। কমিউনিস্ট চীন নূতন করে মানচিত্র ছাপানোর বা পরিবর্তন করার সময়ই পায়নি। ও সব ঠিক হয়ে যাবে।

নেহরু 'বন্ধুর' কথা বিশ্বাস করলেন। চীনের সঙ্গে ভারতের চিরাচরিত বন্ধুত্বের কথা তিনি পিকিং-এ সম্বর্ধনার উত্তরে বলেছিলেন। উদার আদর্শবাদী ভারতনায়ক ইতিহাসের অতীত মন্থনকরা অমৃতবাণী শুনিয়েছিলেন সেদিন; দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস আমাদের দুই দেশের মধ্যে বিরোধের ঘটনা নাই, কেবল আছে মৈত্রী, বানিজ্যিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক লেনদেনের, ভাববিনিময়ের কাহিনী।

বিধাতাপুরুষ অলক্ষে স্মিতহাসি হেসেছিলেন; যখন ঐ বিরোধ-হীনতার কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল তার আগেই বিরোধের অঙ্কুর ইচ্ছাকৃত মানচিত্রের পাতায় গজিয়ে উঠেছিল। ভারতীয় অঞ্চলকে চীনা অঞ্চল ব'লে দেখানো মানচিত্র কমিউনিস্ট চীনেরই অভিসন্ধিমূলক

কাজ, রীতিমত পরিকল্পিত। ধূমরেখা দেখেও আমরা অনুমান করিনি যে পর্বত বহ্নিমান। একটি জাতি অন্য একটি জাতিকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু আজ ভারতের বিশ্বাস বিলীন হয়ে গেছে।

চীনের স্বরূপ প্রকাশ

চীন যে ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নয়, মিষ্টি কথায় ভারতকে ভুলিয়ে রেখে গোপনে তার সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসছিল, তার পরিচয় পাওয়া গেল। তিব্বত দখল করে সে দুর্গম পাহাড় অঞ্চলের ভিতর দিয়ে মোটর চলাচলের উপযোগী পথ তৈরি করেছে গোপনে। বন্ধুর শুভেচ্ছার ওপর নির্ভর করে ভারত হিমালয়-সীমান্ত রেখেছিল প্রায় অরক্ষিত। সেই সুযোগে ভারতের লাডাক অঞ্চলের ১২ হাজার বর্গমাইল স্থান দখল ক'রে নিয়ে বসেছে। শুধু তাই নয়, উত্তরপূর্ব সীমান্তে নেফা অঞ্চলের প্রায় ৩৩ হাজার বর্গমাইল জায়গার ওপর তাদের দাবি ; সিকিম ও ভুটানের বৈদেশিক ব্যাপারে ভারতের যে যে কর্তৃত্ব বহুদিনের সন্ধিদ্বারা স্বীকৃত, চীন তাও মানতে রাজি নয়। ভারতেরই এলাকার মধ্যে ভারতের সীমান্ত প্রহরীদের ওপর অতর্কিতে গুলীবর্ষণ করে হত্যা করে কমিউনিস্ট চীন যে রক্তরঞ্জিত ইতিহাস অধ্যায়ের সূচনা করেছে তার শেষ পরিণতি কি হবে তা এখন ভবিষ্যতের অন্ধকারে কিন্তু ইতিমধ্যে শান্ত সমাহিত শুভ্রতুষারমণ্ডিত নিথর হিমালয় সজীব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী যে পর্ব্বতশ্রেণী ছিল অরক্ষিত এবং যার ওপরে থেকে শত্রুর আগমনের কোন আশংকাই ভারতবাসীর মনে জাগেনি আজ সেখানে জেট-প্রহরী বিমানের গর্জন পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ; তিব্বত অধিকার ক'রে চীন হিমালয় পর্যন্ত বাহু প্রসার করেছে, তিব্বতের মধ্যে আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত হাজার হাজার সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে, পিকিং থেকে তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত ১৫ শত

মাইল দীর্ঘ ব্রডগেজ রেলপথের নির্মাণকাজ চলেছে, ডজনখানেক জেটবিমানের উপযোগী বিমানক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে, দুর্গম পাহাড়পর্বত অতিক্রম ক'রে মোটর চলাচলের উপযোগী পথ নির্মিত হয়েছে এবং এখনো নির্মাণকার্য চলেছে পূর্ণোদ্যমে। সম্প্রতি নেপালের সঙ্গে চুক্তি ক'রে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত যে সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে তা সম্পন্ন হলে হিমালয় পার হয়ে দক্ষিণদিক পর্যন্ত সে হাত বাড়ানোর সুযোগ পাবে। চীনের সমর্থক কমিউনিস্ট পার্টির যে অংশ স্বদেশের চেয়ে বিদেশের স্বার্থকেই বড় ক'রে দেখে তাদের কার্যকলাপের ভিতর দিয়ে চীন এদেশের জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি প্রচার এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজে যে উৎসাহ দেবে তা এক রকম অবধারিত। এ বিষয়ে জনগণের অবহিত থাকা দরকার।

রাজনীতির দাবার চাল

কমিউনিস্ট চীনের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তার বন্ধুত্বের মুখোশও খসে পড়েছে। এখন সে ভারতের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এই রাজনীতির দাবাখেলায় তার চাল কেমন ভাবে পরিকল্পিত তার আভাষ দেওয়া যায়। প্রথমত, তিব্বত ভূমি সৈন্য চলাচলের ও অবস্থানের ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত হবে। তার আয়োজন চলেছে। দ্বিতীয়, হিমালয়ের ওপারের সীমান্ত থেকে ভারতের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে নাশকতামূলক কাজ চলানোর চেষ্টা করবে; সিকিম ও ভুটানকে উস্কানি দিয়ে, লোভ দেখিয়ে বা ভয় দেখিয়ে ভারতের প্রতি বিরূপ ক'রে তোলার চেষ্টা করবে; ভারতের 'তাবেদারি' থেকে জনগণকে 'মুক্ত' করার গোপন প্রতিশ্রুতিও হয়ত দেবে কিন্তু আসল উদ্দেশ্য তাদের কল্যাণ নয়, নিজের রাজ্যবিস্তার। তৃতীয়, ভারতকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহানুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবে। ব্রহ্মদেশের সঙ্গে সীমান্ত *বিরোধ মীমাংসা ক'রে চীন এই ভাবটিই প্রচার করতে চেয়েছে যে,*

সীমানা সংক্রান্ত গোলযোগ ন্যায়সঙ্গত হলে সে মিটিয়ে নিতে অনিচ্ছুক নয় কিন্তু ভারতের সঙ্গে বিরোধে ভারতই যেন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করছে। চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত নির্ধারণে চীন ম্যাকমেহন লাইনের অংশটুকু স্বীকার করে নিয়েছে কিন্তু চীন-ভারত সীমানার ক্ষেত্রে সে তা মানতে গররাজি। অথচ উভয় দেশের নথি দলিলপত্র ইত্যাদি তথ্য নিয়ে দুই দেশের প্রতিনিধিরা যে আলোচনা করেছেন, তাতে ভারতের যুক্তি ও প্রমাণ খণ্ডন করার মত কোন তথ্য চীন উপস্থাপিত করতে পারেনি। তবু জেদ কমেনি। চতুর্থ, ভারতের অসুবিধা অস্বস্তিকর অবস্থার সুযোগ নিতে চেষ্টা করছে নয়াচীন। পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে একটি কথা প্রচালিত আছে: 'চাচার বাড়ীতে আগুন লেগেছে, এই সলোকে (আলোকে) ভাত খেয়ে নে।' প্রতিবেশী রাষ্ট্র যখন রাজনৈতিক সমস্যায় বিব্রত, অনিষ্টকামী রাষ্ট্র তার সুযোগ নেবে। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের মনকষাকষির সুযোগে চীন তার সঙ্গে সীমানাসংক্রান্ত বিরোধ রফা করতে চায়; এর দ্বারা প্রকারান্তরে কাশ্মীরের ভারত-এলাকায় পাকিস্তানের মালিকানা স্বীকার ক'রে নিয়ে সে পাকিস্তানকে তুষ্ট করার কূটকৌশল বিস্তার করেছে। ভারতের অগ্রগতি তার অভিপ্রেত নয়।

চীনের আত্মবিস্তারের মানসিক ভিত্তি

জাতিহিসাবে চীনাদের মানসিক গঠনে বৈশিষ্ট্য আছে। তারা দাম্ভিক, নিজেদের সবকিছুই তাদের কাছে শ্রেষ্ঠ, তাদের ধারণা—এককালে তারা সভ্যতায়, সাম্রাজ্যের আয়তনে ছিল পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠজাতি; আবার তেমনি হতে হবে। চীনের দীর্ঘকালের ইতিহাসে অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। যখনি সে শক্তিশালী হয়েছে, আশেপাশের রাজ্যগুলির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে, যখনি দুর্বল হয়েছে, আবার সংকচিত হয়ে গেছে। কিন্তু ইদানীংকালের

চীনাদেরও মনোভাব পরিবর্তিত হয়নি। চল্লিশ বছরেরও বেশি আগে সান্-ইয়াৎ-সেন চীনের প্রাচীনযুগের অঞ্চল পুনরধিকার করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন আমরা চীন-জাপান যুদ্ধের পর কোরিয়া ও ফরমোজা জাপানকে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম, আনাম দিয়েছিলাম ফ্রান্সকে, ব্রহ্মদেশ দিতে হয়েছিল বৃটনকে। এছাড়া রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জ, শ্যাম, বোর্ণিও, সারাওয়াক, জাভা, সিংহল, নেপাল এবং ভুটান এক সময়ে চীনের করদরাজ্য ছিল। চিয়াং কাইশেক এইসব অঞ্চল সম্পর্কে চীনের দাবি ঘোষণা করেছিলেন ; এবার মাও-সে-তুং সেই পুরাণো দাবি জীয়িয়ে তুলেছেন। ইতিমধ্যে ইয়াং-সিকিয়াং দিয়ে কত জল বয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে, ইতিহাসের চাকার আবর্তনে পৃথিবীর মানবজাতির কত ভাগ্যপরিবর্তন ঘটে গেছে, নবজাগ্রত এশিয়ায় নূতন মানুষ নূতন যুগের আলোকে বলিষ্ঠ জীবনরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে ; তবু চীনারা এশিয়া মহাদেশকে সুদূর অতীতে তাদের গৌরবের যুগে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার কামনা পোষণ করে। এই মনোভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে অল্পকিছু দিন আগে বিশ্ববিখ্যাত লেখিকা পার্ল বাক বলেছেন—এইরূপ ভাব যদি গ্রাহ্য হয় তবে ইংরেজরাও আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ দাবি করতে পারে।

সামরিক দিক

ভারতের হিমালয় সীমান্ত দিয়ে চীনের সঙ্গে বিরোধ ঐতিহাসিক পর্যায়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। শীঘ্র যে এর নিষ্পত্তি হবে এমন সম্ভাবনা কম। চীন সামরিক শক্তি গড়ে তুলেছে, আণবিক বোমা তৈরিতে সে রত আছে এই ধরণের খবর একেবারে অবিশ্বাস্য নয় ; এশিয়ায় সে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী। ভারত সামরিক বিজয়ের দ্বারা দেশ অধিকার করতে চায় না, সে শান্তি ও মৈত্রীর সমর্থক, গণতন্ত্রের আদর্শে মানবকল্যাণে ব্রতী। শান্তির পথে সমৃদ্ধি অর্জনের কাজে সে

সফল হলে এশিয়ার অনেক দেশই তার আদর্শের অনুগামী হবে। চীনের কাছে তা অসহনীয়। ভাব ও আদর্শের দিক থেকে ভারত ও চীনের বিরোধ যেন দেবাসুরের বিরোধ।

ভারত উত্তর সীমান্তের প্রতি এখন সজাগ হয়েছে। স্থানীয় পুলিস ও আসাম রাইফেল্‌স বাহিনীর হাত থেকে সীমান্ত রক্ষার ভার ন্যস্ত করা হয়েছে সৈন্যবাহিনীর ওপর। ভারতের সৈন্য সংখ্যা ৫ লক্ষের মত; চীনের সৈন্য এর প্রায় পাঁচগুণ। কিন্তু ভারতীয় জোয়ানগণ দক্ষতা, সাহস ও শৃঙ্খলার জন্য সুবিদিত। ভারতের মোট রাজস্বের প্রায় একতৃতীয়াংশ ব্যয় করা হচ্ছে দেশরক্ষার খাতে; শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী সুপারসনিক জেটবিমান ভারত নিজের কারখানাতেই নির্মাণ করেছে, হিমালয়ের সানুদেশ পর্যন্ত নূতন রেলপথ স্থাপন করেছে, আঞ্চলিক বাহিনীতে (টেরিটোরিয়্যাল আর্মিতে) আরো ৫ লক্ষ নওজোয়ান ভর্তি করার ও জাতীয় সমরশিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো আড়াই লক্ষ বেশি করার পরিকল্পনা আছে। হিমালয় ভারতের পক্ষে জীবন-মরণ সমস্যা, চীনের পক্ষে বিলাস। এই নিথর পর্বতমালাকে কেন্দ্র করে যে বিরোধ ধূমায়িত হয়েছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ, কারণ এখানে যে রাজনৈতিক সংঘাত দানা বেঁধে উঠেছে তা এক সময়ে সামরিক সংঘাতে পরিণত হতে পারে। যদি কখনো সেরূপ ঘটে তবে সে ঘটনা এশিয়ার পক্ষে হবে যুগান্তকারী।

চীনা আক্রমণ

[পূর্বের অধ্যায়গুলি ছাপা হবার পর ভারত ভূমিতে চীনের আক্রমণ সুরু হয়। এ সম্পর্কে তাই এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

আমরা যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই কার্যে পরিণত হয়েছে। চীনারা লাডাক ও নেফা-সীমান্ত বরাবর এক সঙ্গে আক্রমণ করে ভারতের কয়েকটি অগ্রবর্তী ঘাটি দখল ক'রে নিয়েছে। প্রকাশ,

চীনারা মর্টার, অটোমেটিক রাইফেল, পাহাড়ী কামান এবং লাডাকে ট্যাঙ্ক পর্যন্ত ব্যবহার করেছে ; শুধু নেফাতেই তারা তিন ডিভিসন অর্থাৎ ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়োগ ক'রে যতশীঘ্র সম্ভব ম্যাকমেহন লাইনের দক্ষিণে এগিয়ে আসতে চেয়েছে। পূর্ব পরিকল্পিত সামরিক প্রস্তুতির ফলে চীনারা অভিযানের প্রথম দিকে কিছুটা সাফল্য লাভ করে এবং নেফায় ম্যাকমেহন রেখার মাইল বারো দক্ষিণে তাওয়াং মঠ-শহরটি অধিকার ক'রে নেয়। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যের বীরত্বের সম্মুখে তাদের থমকে দাঁড়াতে হয়েছে।

রোষদীপ্ত ভারত

নয়াচীনের বিশ্বাসঘাতকতার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে ভারত প্রথমে ক্ষুব্ধ এবং পরে দীপ্তরোষে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে। নেহেরুর আহ্বানে সমগ্র ভারত আজ শত্রুকে পবিত্র মাতৃভূমি থেকে বিতাড়নের জন্য সংকল্পবদ্ধ। কেন্দ্রীয় সরকার দেশে সঙ্কটকালীন অবস্থা ঘোষণা ক'রে অবস্থার গুরুত্ব ও সরকারের কঠোর মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। একদিকে সমগ্র দেশের সমর্থনপুষ্ট জাগ্রত গণতান্ত্রিক আদর্শে-বিশ্বাসী জাতি, অন্য দিকে পররাজ্যলোলুপ একনায়কতন্ত্রী কমিউনিস্ট চীন। এই ঐতিহাসিক সংঘর্ষ এশিয়ার জনগণের জীবনে যে বিপুল পরিবর্তন আনবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচিত হতে চলেছে।

—শেষ—